বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন পর্ব

(সূচনা হইতে ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত)

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. আর. এস.

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক
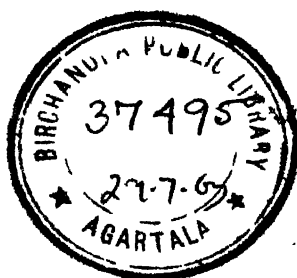
এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

বিক্রয়-বিপণি—৫৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক—শ্রীসুব্রত গুপ্ত এম. এ.
এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
৫২এ, কলাবাগান লেন, কলিকাতা-৩৭

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৬২
মূল্য—আট টাকা মাত্র

গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'নাভানা' প্রেসে এবং অবশিষ্টাংশ 'নবীন সরস্বতী'
প্রেসে মুদ্রিত। মুদ্রাকর—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান ১৭, ভীমঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাদাম্বুজেষু—

ত্বৎপ্রজ্ঞারসপুষ্টস্য দীনশিষ্যতরোরয়ম্‌।
আকন্দকুসুমগ্রন্থো দীয়তে গুরুদক্ষিণা॥

"সাহিত্যের ইতিহাস হলো মানুষের মনের ইতিহাস। মাটির ইতিহাসের সঙ্গে তার আগাগোড়া তফাৎ। প্রত্নবিদ্যার চলতি মাপকাঠি এখানে অচল। এ জন্যে চাই নতুন দৃষ্টি।"

—রবীন্দ্রনাথ

স্বীকৃতি :

এই গ্রন্থ প্রণয়নে লেখককে উৎসাহ দিয়াছেন—

ডঃ শ্রীবিমল কান্তি সমদ্দার
শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী
শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায়
ও
শ্রীনির্মাল্য আচার্য

গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়াছেন ও শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল

গ্রন্থকারের নিবেদন

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'ই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল এই গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস মাত্রই পরিবর্তনশীল। নূতন নূতন আবিষ্কারে জ্ঞানের অগ্রগতি ও ইতিহাসের রূপ পরিবর্তন অনিবার্য। দীনেশচন্দ্রের পরবর্তী পণ্ডিতগণের গবেষণায় বঙ্গসাহিত্যে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে আধুনিক তথ্য-ভিত্তিক নূতন ইতিহাসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেইজন্য কিছুদিন হইতে আধুনিক তথ্য-সম্মত সাহিত্য-ইতিহাস রচনার চেষ্টা চলিতেছে এবং কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের গ্রন্থ সর্বাগ্রগণ্য। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের বস্তুতান্ত্বিক ভিত্তি গঠনে এই গ্রন্থের দান অতুলনীয়। এ-যাবৎ আবিষ্কৃত পুথিগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা, রচনাকাল ও বয়সের পারম্পর্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করিয়া এই গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু সুকুমার বাবুর গ্রন্থে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনামাত্র হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থ-পরিচয়ের মাধ্যমে জাতির রসবোধ, মনীষা ও মনোজীবনের অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় না থাকিলে কোন ইতিহাসকেই যথার্থ সাহিত্যের ইতিহাস বলা চলে না। কিন্তু এই আদর্শে বঙ্গসাহিত্যের কোনো ইতিহাস এ-যাবৎ রচিত হয় নাই। সেই অভাব সামগ্রিকভাবে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দূর করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থ পরিকল্পিত ও প্রকাশিত হইল। গতানুগতিক গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ভারগ্রস্ত করায় অভিপ্রায় বর্তমান লেখকের নাই।

প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে প্রকাশিত বাঙ্গালী জাতির রসবোধ ও মনন-শক্তির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জাতীয় প্রতিভার ক্রম-বিকাশ নির্দেশ—এই দুই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান গ্রন্থ রচিত হইল। বঙ্গসাহিত্যের সূচনা হইতে ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন পর্বের আলোচনায় সীমা। ইহাতে সাহিত্যের অন্তরঙ্গ আলোচনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইল, অন্যাংশ সন্নিবেশিত হইল প্রতি অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-রূপ 'নেপথ্য-বার্তা'য়। পাঠকদিগকে

গ্রন্থগুলির কাহিনী শুনাইবার পাত্ররূপে না দেখিয়া তাঁহাদিগের বিদ্যাবত্তা ও রসজ্ঞতা স্বীকার করাও বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম নীতি।

সাহিত্যের ইতিহাসে পটভূমি আলোচনার একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সীমা আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমানে পটভূমিকা তাহার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। প্রচলিত সাহিত্য-ইতিহাসগুলিতে সাহিত্যিক আলোচনার পরিবর্তে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আলোচনাই প্রাধান্য পাইতেছে। এইরূপ আলোচনার ফলেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে রস-বিচার ক্রমশঃ উপেক্ষিত হইয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা জাতীয় জীবনের অবক্ষয়েরই লক্ষণ। সবিনয়ে স্বীকার করা কর্তব্য যে সাহিত্যের ইতিহাসে মূল সাহিত্যকে বুঝিবার জন্যই পটভূমিকা জ্ঞাতব্য, পটভূমি জানিবার প্রয়োজনে সাহিত্য পাঠ্য নহে। সেইজন্য বর্তমান গ্রন্থে সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হইল। তাই বলিয়া ইহাতে যে সাহিত্যকে পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন করিয়া কৃত্রিমভাবে দেখা হইয়াছে তাহা নহে, বরং যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা হইয়াছে, তবে ইহাতে পটভূমিকা সাহিত্যের সম্মুখে নহে, পশ্চাতেই স্থান পাইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থ 'সাহিত্যে'রই ইতিহাস, গ্রন্থ-বার্তা নহে, গ্রন্থমাত্রেরই আলোচনা ইহাতে পাওয়া যাইবে না। অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলাভাষারও অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থ দুর্বল ও অপরিণত। সাহিত্য-ইতিহাসের মুখ্য আলোচনায় ইহাদের স্থান দখলের যৌক্তিকতা নাই। তবে সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে ইহাদের দান অবশ্য স্বীকার্য। সংখ্যার বিপুলতায় ইহারা যুগে যুগে সাহিত্য-সভার শোভা ও গৌরব বর্ধন করিয়াছে, অনাগত প্রতিভাবানের প্রতীক্ষায় আসর জাগাইয়া রাখিয়াছে, শ্রোতৃমণ্ডলীর উৎসাহ স্তিমিত হইতে দেয় নাই। কিন্তু ইহাদের দান এইটুকুর বেশী নহে।

উপস্থিত গ্রন্থ নামে বঙ্গসাহিত্যের 'প্রাচীন পর্ব' কিন্তু ইহার আলোচনা অষ্টাদশ শতকের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, 'আধুনিক' ঊনবিংশ শতকের কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার কারণ, এই গ্রন্থে কালের প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ নহে। সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ প্রবণতার বিকাশ ও পরিণতি দেখানোই এই গ্রন্থের লক্ষ্য, সাল তারিখ তাহার সহযোগী মাত্র। ঊনবিংশ শতকে বঙ্গসাহিত্যে

ইংরেজ-প্রভাবিত নব্য রীতি দেখা দিলেও তাহার পাশাপাশি প্রাচীন রীতিও কিছুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ঊনবিংশ শতকের কিছু অংশ গ্রহণ না করিলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হয় না।

বঙ্গসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, যুগবিভাগ, শাখাভেদ, 'রেনেশাঁস' প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থে নূতন মত উপস্থাপিত হইল। সেইজন্য প্রচলিত গতানুগতিক মতবাদের অযৌক্তিকতা-প্রদর্শন হইয়াছে অপরিহার্য। তবে এই সমালোচনা মতেরই বিরুদ্ধে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে নহে। যাঁহাদিগের মতের সমালোচনা করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি, কেহ লেখকের শিক্ষক, কেহ বা শিক্ষকস্থানীয়। ইঁহারা ব্যক্তিগতভাবে লেখকের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রচারিত অনৈতিহাসিক তথ্য ও অযৌক্তিক তত্ত্বের প্রতিবাদ না করিয়া কূটনৈতিক সন্ধিস্থাপন মোটেই শ্রদ্ধা বা সৌজন্য নহে, দুর্বল ও রুগ্‌ণ তোষণ নীতিরই পরিচায়ক। ইহা সত্যকে অপমানিতই করে। তাছাড়া সত্যের মহিমা চিরদিনই ব্যক্তি-মর্যাদার ঊর্ধ্বে। সেইজন্য বর্তমান গ্রন্থে অযৌক্তিক মতবাদগুলিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করা হইল। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সত্যভাষণ, স্তাবকতাও নহে, বিদূষণও নহে। সারস্বত সাধনায় অগ্রগমনের পথে পূর্বসূরিগণের জ্ঞানবর্তিকা আরও কিছুদূর বহন করিয়া আগামী কালের পথিকের হস্তে সমর্পণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল। এই চেষ্টা কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহা বিচারের ভার পাঠকের উপরে।

বর্তমান গ্রন্থের দুর্বলতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ সচেতন। লেখক প্রত্ন-তাত্ত্বিক নহে, প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কারের কোন গৌরবই লেখকের নাই। তাছাড়া তথ্যাবলীর অধিকাংশই পূর্বসূরি-পরম্পরা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহীত। গ্রন্থের আদর্শ বড় হইলেও গ্রন্থকারের শক্তি অত্যল্প—সে-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক পর্ব যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

৮২এ, নবীনকৃষ্ণ ঘোষাল রোড
কলিকাতা-৪২
২৩ আগষ্ট ১৯৬২

তারাপদ ভট্টাচার্য

কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ :—

খ্রীষ্টাব্দ	১১৯৯	বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের সূচনা
”	১৪৮৬	শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব
”	১৪৯৩-১৫১৯	হোসেন শাহের রাজত্ব
”	১৫৩৩	শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব
”	১৭৫৭	ইংরেজ রাজত্বের সূচনা
”	১৭৭৮	ছাপা বাংলা হরফের প্রথম ব্যবহার
”	১৮০০	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা ও গদ্য-রচনার সূত্রপাত

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, যুগ-বিভাগ ও শাখা-ভেদ

আর্যভাষা-গোত্রীয় 'মাগধী' প্রাকৃত হইতে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গভাষার জন্ম, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহার সাহিত্যের প্রথম বিকাশ। বঙ্গসাহিত্যের আবির্ভাব কালেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে, পূর্বগামী সাহিত্যের অনুকারী হইয়া ইহা আবির্ভূত হয় নাই। অবশ্য সাহিত্য-সম্পদের দিক দিয়া মাগধী প্রাকৃত সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাহার অনুকরণের প্রশ্ন উঠে না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিক ঐশ্বর্য অতুলনীয়, তাহার নিকট হইতে বাংলা সাহিত্য সাহিত্যিক উত্তরাধিকার লাভ করিবে ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে। তথাপি ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ অস্বীকার করিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব ও চিন্তার বিভিন্ন শাখা—দর্শনশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য, নাটক, গদ্যকাব্য প্রভৃতির নির্দিষ্ট পথে বাংলার সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয় নাই, বরং বঙ্গসাহিত্য নিজেই নিজের পথ আবিষ্কার করিয়া যাত্রা করিয়াছে। ধামালী, পাঁচালী, পদাবলী প্রভৃতি নূতন নূতন রচনাভঙ্গীর প্রবর্তন বাঙ্গালীর সাহিত্যিক সৃষ্টি-শক্তির পরিচায়ক। নূতন পন্থা অবশ্য প্রাচীন সম্পদ গ্রহণে কবির অক্ষমতার ফলেও হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু পথ-পরিবর্তনের কারণ কবি-শক্তির অক্ষমতা নহে, প্রকৃত কারণ যুগ-বিপর্যয়-জাত সাহিত্যের শ্রোতৃ-পরিবর্তন। সংস্কৃত সাহিত্য ছিল যুগে যুগে রাজসভার সাহিত্য, সুরসিক ও বিদগ্ধ সভাসদেরাই ছিল তাহার শ্রোতা, কাজেই সাহিত্যের দৃষ্টি ছিল গোষ্ঠী-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রীয় যুগ পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যেরও দশা-বিপর্যয় ঘটে, বঙ্গসাহিত্য রাজধানী ত্যাগ করিয়া পল্লী-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়; সুশিক্ষিত নাগরিক মণ্ডলীর পরিবর্তে অশিক্ষিত গ্রাম্য গোষ্ঠী অথবা বারোয়ারি জনতা তাহার শ্রোতার আসন অধিকার করে। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে অভিজাত ও ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতের শাখা রূপে নহে, নবজাত আদিম পল্লী-সাহিত্য রূপেই দেখিতে হইবে।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গসাহিত্যের আবির্ভাব অকারণ ও

অপ্রত্যাশিত ঘটনা নহে, যুগের প্রয়োজনেই ইহার বিকাশ। এই প্রয়োজন কেবল নূতন শ্রোতৃমণ্ডলীর রসবোধের পরিবর্তনের জন্য নহে, তদানীন্তন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত কৃত্রিমতার জন্যও বটে। সংস্কৃত কবিদিগের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই ছিল ক্ষয়ের বীজ। বস্তুকে গৌণ করিয়া তাহার রূপকেই বড় করিয়া দেখা, জীবনকে অপ্রধান করিয়া আঙ্গিক বা প্রকাশভঙ্গীকে প্রাধান্য দেওয়া—অর্থাৎ শিল্পবিলাসই ছিল সংস্কৃত যুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কালিদাসাদির কাব্যে এই শিল্পবিলাস প্রাধান্য পাইলেও তাহা জগৎ ও জীবনকে একেবারে অস্বীকার করে নাই; কিন্তু হিন্দু রাজত্বের শেষের দিকে কাব্যধর্ম জীবন ও জগতের সহিত যোগসূত্রহীন ও বাক্‌চাতুরীসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল। কৃত্রিমতাই ধ্বংসের বীজ। সেই সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা কৃত্রিম, বিষয় কৃত্রিম, ভঙ্গীও কৃত্রিম; তাই ভারতে নূতন সুরের প্রাণময় সাহিত্যের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন মিটাইতে সহজ সরল প্রাণপূর্ণ গ্রাম্য গীতিকা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল বঙ্গসাহিত্য, বাঙ্গালী কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' সংস্কৃত ও বাংলা এই উভয় কাব্যধর্মের সম্মিলন দেখা যায়।

বঙ্গসাহিত্য নবজাত সাহিত্য। কিন্তু তাহার পক্ষে গৌরবের কথা, তাহার প্রথম নিদর্শনের মধ্যেও প্রাথমিক প্রচেষ্টার অস্পষ্টতা, অস্ফুটতা ও দুর্বলতা দেখা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রচনা 'চর্যা'পদ আদিম ছড়া বা রূপকথার ন্যায় বালকোচিত নহে। ইহার কারণ আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রধানতঃ জনসাহিত্য হইলেও অশিক্ষিত জনগণের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য নহে। উহার লেখকেরা যে অপণ্ডিত ও অরসিক ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোনো কারণ নাই; বরং স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা কালোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও চিত্ত-প্রসার ও সত্য-চর্যার ফলে গতানুগতিক কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা ও রীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের জন্যই নিজেদের ভাব ও চিন্তাকে অকৃত্রিম মৌখিক ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। বাংলা চর্যা-গীতিকার সংস্কৃত টীকা এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রতি সর্গের পুষ্পিকা বা পরিচয়াত্মক সংস্কৃত শ্লোকগুলি উহাদের লেখকের বিদ্যাবত্তার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

অবশ্য নূতন সাহিত্যে কিছু কিছু অপরিণতির ত্রুটি থাকিবেই। কিন্তু

সে কথা নহে। বঙ্গসাহিত্যের দৃষ্টি সংকীর্ণ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং ভাবালু। কবি হয়ত সংস্কৃতজ্ঞ, কিন্তু রচনায় সে সংস্কৃতি নাই; সংস্কৃত সাহিত্যের উদারতা, সর্বজনীনতা ও মননশীলতা বঙ্গসাহিত্যে অনুপস্থিত। ধর্ম-সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অঙ্গ মাত্র, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের শরীর। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনই ইহার জন্য দায়ী। জাতীয় মন অপরিণত, সংকীর্ণ ও আদিম ধর্মভাবের ভাবুক। বৈষ্ণব, শাক্ত, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি ধর্মগোষ্ঠীর পরিচয়ই তাৎকালিক বাঙ্গালীব প্রধান পরিচয়। কবি জনতারই অধীন, কাজেই কাব্য সাধারণতঃ গোষ্ঠী-গত ধর্ম-সাহিত্য। এমন কি বঙ্গসাহিত্য যেখানে গোষ্ঠী-বহির্ভূত বারোয়ারী সভার সাহিত্য, সেখানেও প্রাকৃত ও লৌকিক হইয়া উঠিতে পাবে নাই, কবি সেখানে ইষ্টদেবতা বা কুল-দেবতার পরিবর্তে আদিম গ্রামদেবতারই বন্দনা করিয়াছেন মাত্র, মানবজীবনকে বড কবিয়া দেখাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ঘটনা-সংঘাত ছিল না তাহা নহে। কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজপরিবর্তন, বিজয়ীর উৎপীডন, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি বিপর্যয়কর ঘটনাও অদৃষ্ট-বিশ্বাসী বাঙ্গালীব জাতীয় জীবনে কোন পরিবর্তন আনে নাই। শম্বুকের মতো ক্ষুদ্র পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনের কঠিন আবরণের মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া বাঙ্গালী দীর্ঘ ছয়শত বৎসর একই ভাবে চক্ষু বুজিয়া কাটাইয়াছে।)যে জাতীয়তা-বোধ সময় বিশেষে মানুষের মনে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও অসন্তোষের বহ্নি জ্বালাইয়া তোলে এবং পুবাতন ভাব ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটায়, প্রাচীন বাঙ্গালীর জীবনে সেই জাতীয়তা-বোধেরই ছিল একান্ত অভাব। সেই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইয়াছে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে ক্লান্তিকর সাহিত্য। ইহাতে কোন বিশেষ শতাব্দীর চিহ্ন নাই। কোন গ্রন্থকেই বিশেষ স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করিতে হয় না। নূতন আবিষ্কৃত কোন গ্রন্থের আভ্যন্তর প্রমাণে যুগ-চিহ্ন দেখিয়া তাহার রচনাকাল নিরূপিত হইতে পারে—এমন কোন সম্ভাবনা নাই। 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থকে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ কেহ কেহ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের গ্রন্থ বলিয়াছেন, কেহ পঞ্চদশ-ষোড়শ, কেহ বা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের গ্রন্থ বলিতেও ইতস্তত করেন নাই। রচনাকাল সম্বন্ধীয় এইরূপ অদ্ভুত মতভেদের জন্য এই গ্রন্থপাঠে পাঠকের কিছুমাত্র

ক্ষতিবৃদ্ধি, স্থবিধা বা অস্থবিধা ঘটে না। প্রাচীন সমস্ত গ্রন্থেই এই ব্যাপার। এইখানেই বঙ্গসাহিত্যের বিশিষ্টতা।

বঙ্গসাহিত্যের ভাষা ত্রিবিধ—প্রাচীনযুগীয়, মধ্যযুগীয় ও আধুনিকযুগীয়; যথাক্রমে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বঙ্কিমচন্দ্রাদির ভাষা ইহাদের উদাহরণ। কিন্তু সাহিত্য-লক্ষণ বিচারে বঙ্গসাহিত্যের যুগ মাত্র দুইটি—প্রাচীন যুগ ও আধুনিক যুগ। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছয় শত বৎসর হইতেছে বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন যুগ এবং তৎপরবর্তী কাল হইতেছে আধুনিক যুগ। প্রথমটি ভাবালু, ধর্মান্ধ ও জীবন-বিমুখ; দ্বিতীয়টি মননশীল, বাস্তব ও জীবন-সচেতন। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী তৃতীয় লক্ষণের কোন মধ্যযুগ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনাদি গ্রন্থ ভাষায় মধ্যযুগীয়, কিন্তু ভাবে নহে; ভাবের দিক দিয়া প্রাচীনযুগীয়ই বটে। [পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিশেষের ইতিহাসে আদি, মধ্য ও নব্য—এই তিন যুগের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসেও তিন যুগ অনুমান করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।]

বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য ও সূচনাকাল সম্বন্ধে কোন কোন মহলে একটি অবাস্তব থিয়োরি প্রচলিত আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যের আধুনিকতা ইংরেজের দান এবং পাশ্চাত্য প্রভাব অর্থাৎ সাহেবী রীতির অনুকরণই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত, সেই হেতু উনবিংশ শতাব্দীই হইল বঙ্গসাহিত্যের 'রেনেশাঁস' বা নব জাগরণের কাল। নবজাগরণের পূর্ববর্তী অবস্থা নিদ্রিতাবস্থা; সেইজন্য অষ্টাদশ শতক হইতেছে—বঙ্গসাহিত্যের নিষ্ফল 'অন্ধযুগ'। থিয়োরি প্রচারের জেদে এই সকল পণ্ডিত অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যিক সফলতাকেও নিষ্ফলতা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই; বিদ্যাসুন্দর কাব্য হইতে আধুনিকতার উন্মেষকে দেখিয়াও দেখেন নাই, এবং এই যুগের প্রসাদী সঙ্গীত, নিধুবাবুর টপ্পা ও মৈমনসিংহ গীতিকার মতো কালজয়ী উৎকৃষ্ট সাহিত্যকেও 'কিছু নয়' বলিয়া চাপা দিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য ভাবের অনুকরণকে বাঙ্গালীর আধুনিক মনোবৃত্তি বলা ইতিহাসের দিক দিয়া অসত্য

ও বাঙ্গালীর পক্ষে অমর্যাদা-জনক। অনুকরণ একটা নিষ্ফল আদিম বৃত্তি মাত্র। অনুকরণে জীবনের বিকাশ ঘটে না। লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়—অনুকরণ নহে, মননশীলতাই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীর আধুনিক মনোবৃত্তি। বাঙ্গালীর এই মননশীলতা, ইংরেজের বা অপর কাহারও দান হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহা জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির ফল হইতে বাধ্য। মননশীলতাকে দেখিয়া শেখা যায় না, নকল করিয়া পাওয়া যায় না। কেবল মননশীলতা কেন, কোন স্বাভাবিক মনোভাবই কখনো বাহির হইতে কৃত্রিম ভাবে আসিতে পারে না। বঙ্গদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্বেই অষ্টাদশ শতকে স্বাভাবিক ভাবে আধুনিক মনোবৃত্তি বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।[১] তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ঊনবিংশ শতকে নব প্রবর্তিত ইংরেজী-ভাবের অনুকূল আবহাওয়ায় বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক যুগ অতি দ্রুত শৈশব দশা অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হইয়াছে। ইংরেজ আধুনিক মনোবৃত্তির বিকাশে বাঙ্গালীকে কিছু পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া তাহার জনকত্বের দাবী করিতে পারে না। নবাগত ইংরেজ রাজপুত্রের মতো সোনার কাঠি ছোঁয়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী-মনের মরা রাজকন্যা বাঁচিয়া উঠিল—ইহা রূপকথা মাত্র, ইতিহাস নহে।

প্রাচীন বাঙ্গালীর ভাবালুতা ও আধুনিক বাঙ্গালীর মননশীলতা—এই মূল বিভেদের জন্য উভয় যুগের সাহিত্যের ব্যবধান হইয়াছে অনেকখানি। বাঙ্গালীর হৃদয়বত্তাই প্রধান ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে। দার্শনিক রূপে নহে, বৈজ্ঞানিক রূপে নহে, সাধারণতঃ কবি রূপেই বাঙ্গালী করিয়াছে আত্ম-প্রকাশ, তাহাও মধুর, কোমল ও কান্ত ভাবের কবিরূপে মাত্র। মানব-মানবী নহে, দেবতা বা অপদেবতাই হইয়াছে তাহার সাহিত্যে বন্দনীয়; অলৌকিকের উদ্দেশেই বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যে নিবেদন করিয়াছে ভক্তি ও ভয়ের পুষ্পাঞ্জলি। স্বাভাবিক ভাবে পদ্যই হইয়াছে তাহার ভাবের ভাষার বাহন, এমন কি গানের সুর হইয়াছে তাহার নিত্য সহচর। গ্রামের বারোয়ারি মণ্ডপে বা পূজা-প্রাঙ্গণে চামর মন্দিরা মৃদঙ্গ সহযোগে গায়ক-

১। এই গ্রন্থের বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মণ্ডলীর সমবেত 'কোরাস' আবৃত্তিতে হইয়াছে সেকালের সাহিত্য-আস্বাদন। গানের সুরে হইয়াছে ধর্মতত্ত্ব-প্রচার, গানের সুরে হইয়াছে কথকতা ও রামায়ণ-পাঠ, গানে গানে হইয়াছে সেকালের অভিনয়। সেকালের 'যাত্রা' প্রকৃত নাটক নহে, গীতাভিনয় মাত্র।

অপর পক্ষে আধুনিক যুগধর্ম—মননশীলতার জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গালী মস্তিষ্কের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে। ইহাতে বিশ্বাস-প্রবণতার স্থলে বস্তুনিষ্ঠা আসিয়া দেখা দিয়াছে। এ-যুগের বাঙ্গালী আধ্যাত্মিক বিষয়কেও বিশ্বাসের চক্ষে নহে, বিচারের চক্ষে দেখিয়াছে। এ-যুগে দেব-চরিত্র লইয়া সাহিত্য-রচনার প্রথা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; সাহিত্যের বিষয় হইয়াছে মানবিক ও সম্পূর্ণরূপে ইহ-লৌকিক। সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়াছে গদ্য, কাব্যের মধ্যেও আসিয়াছে চিন্তাশীলতা। নাগরিক সভ্যতা বিশেষ করিয়া যন্ত্র-সভ্যতা সাহিত্যকে ক্রমশঃ প্রভাবিত করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য আর পল্লীসাহিত্য নহে, প্রাদেশিক সাহিত্যও নহে, বিভিন্ন বিদেশীয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ হইয়া উঠিতেছে বিশ্বসাহিত্য। গানের সুরেই উপরে আর সাহিত্য প্রচারের ভার নাই, সে-ভার গ্রহণ করিয়াছে মুদ্রাযন্ত্র। এখন আর বঙ্গসাহিত্য শ্রব্য নহে, তাহা পাঠ্য। 'শ্রোতৃ'মণ্ডলী পূর্বযুগের ন্যায় বঙ্গপল্লীর চণ্ডীমণ্ডপে আবদ্ধ নহে, 'পাঠক'রূপে দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জনতার রসাস্বাদনের স্থলে দেখা দিয়াছে পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত রসাস্বাদন। এমন কি এ-যুগের লেখকও আর সেকালের মতো সমাজের অঙ্গ বা জনগণের একজন নহে; আধুনিক লেখক এখন জনগণের প্রতিনিধি এবং জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও পরিচালক।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সাধারণ ভাবে পল্লীসাহিত্যই বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে ইহারও আভ্যন্তর রূপভেদ আছে; বহিরাগত প্রেরণার বিভিন্নতাই এই রূপ-ভেদের জন্য দায়ী। যেমন জনতা তেমনি জমিদারবর্গ, তেমনি ধর্মচক্র বা গোষ্ঠী প্রাচীন সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেরণা দান করিয়াছে। সেইজন্য রূপভেদে সমগ্র বঙ্গসাহিত্য হইয়াছে চতুর্বিধ—সভা-সাহিত্য, গোষ্ঠী-সাহিত্য, জন-সাহিত্য ও ব্যক্তি-সাহিত্য। ইহাদের প্রথম তিনটিকে প্রাচীন যুগে এবং চতুর্থটিকে আধুনিক যুগে দেখা যায়। প্রাচীন যুগে সাধারণতঃ ব্যক্তি-সাহিত্যের সন্ধান

পাওয়া যায় না। তেমনি আধুনিক যুগে সভা-সাহিত্য, গোষ্ঠী-সাহিত্য ও জন-সাহিত্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন যুগের কোন সাহিত্যই স্বাধীন রচনা নহে; সভা-সাহিত্য ভূস্বামী ও সভাসদের দ্বারা, গোষ্ঠী-সাহিত্য ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা ও জন-সাহিত্য অশিক্ষিত পল্লীবাসীদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপর পক্ষে আধুনিক যুগে ব্যক্তি-সাহিত্য বন্ধনমুক্ত স্বাধীন; ইহা মোটেই পাঠক-প্রভাবিত নহে বরং নিজেই পাঠকের উপর প্রভাব-বিস্তারী। কেবল পাঠকের বা শ্রোতার দিক হইতে নহে, বিষয়বস্তুর দিক হইতেও প্রাচীন-সাহিত্যের কোনটিবই স্বাধীনতা নাই। কাহিনীর ব্যাপারে সভা-সাহিত্যে পৌরাণিক দেবতা, গোষ্ঠী-সাহিত্যে ইষ্টদেবতা ও জন-সাহিত্যে গ্রাম-দেবতা কবিমনে প্রভুত্ব করিয়াছে। এদিক দিয়াও আধুনিক সাহিত্য যথার্থ ভাবে ব্যক্তি-সাহিত্য অর্থাৎ স্বাধীন; লেখক কোন বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিতে বাধ্য নহেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সমগ্র বঙ্গসাহিত্যই ব্যক্তি-সাহিত্যের নিদর্শন। প্রাচীন যুগের সাহিত্যের মধ্যে সভা-সাহিত্যের দৃষ্টান্ত বাংলা পৌরাণিক সাহিত্য—প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়) এবং অন্নদামঙ্গল। আলাওলের পদ্মাবতী ঠিক সভা-সাহিত্য নহে, ইহা সভাজাত হইয়াও ব্যক্তি-সাহিত্য। রাজরুচির জন্য বাংলা সভা-সাহিত্য সাধারণতঃ হইয়াছে উদাত্ত গম্ভীর মহাকাব্য-শ্রেণীর রচনা। ভাষায় ভঙ্গিতে অলংকরণে অধিকাংশ সভা-সাহিত্য হইয়াছে বাংলার ক্লাসিক সাহিত্য। প্রাচীন যুগের গোষ্ঠী-সাহিত্য দ্বিবিধ—সাধন-সঙ্গীত ও প্রচার-সাহিত্য। প্রথমটির উদাহরণ চর্যা গীতিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত ও বাউল গান। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যাদি বৈষ্ণব গুরুগণের জীবনী-কাব্য এবং সহজিয়াদিগের রাগময়ী-কণা, রত্নসার প্রভৃতি তত্ত্ব-গ্রন্থ। গোষ্ঠী-সাহিত্যের সাধন-সঙ্গীতগুলিই প্রাচীন বঙ্গের গীতি-কবিতা; ভাষায় কল্পনায় ও ভাবে এইগুলির অধিকাংশই রোমান্টিক এবং কিছু কিছু মিষ্টিক। এই গুলির অধিকাংশই কালজয়ী কবিতা; আধুনিক যুগেও ইহাদের জনপ্রিয়তা অল্প নহে। গোষ্ঠী-সাহিত্যের দ্বিতীয়াংশ—চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থ। এইগুলি কাব্যের ছদ্মবেশে প্রাচীন বাংলার কালোচিত দার্শনিক সাহিত্য। ইহাদের উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, অন্য মত খণ্ডন

এবং স্বধর্মের যৌক্তিকতা প্রচার দেখা যায়। প্রসঙ্গত তাৎকালিক ঐতিহাসিক তথ্যও কিছু কিছু ইহাদের মধ্যে আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যৎকিঞ্চিৎ চিন্তাশীলতার জন্ম ইহারা বহুমূল্য।

জন-সাহিত্য গোষ্ঠী-সাহিত্যের বিপরীতধর্মী। গোষ্ঠী-সাহিত্য বিশেষ ধর্ম-চক্রগত গুরু-ভ্রাতৃবৃন্দের সাহিত্য, সে ক্ষেত্রে জন-সাহিত্য বারোয়ারি জনতার সাহিত্য। গোষ্ঠী-সাহিত্যের উদ্দেশ্য পারত্রিক, জন-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঐহিক। সেইজন্ম গোষ্ঠী-সাহিত্য প্রধানতঃ ভাবমূলক বা তত্ত্বমূলক গীতি-কবিতা, জন-সাহিত্য স্থূল-ঘটনা-মূলক কাহিনী-কাব্য। গোষ্ঠী-সাহিত্য সংসার-বিরাগী সাধকের রচনা, জন-সাহিত্য সংসার-নিষ্ঠ জনগণের রচনা। তাই বলিয়া গোষ্ঠী ও জনতাকে পরস্পরের বিপরীত ভাবিলে ভুল হইবে। গোষ্ঠী জনতার বহির্ভূত নহে, অন্তর্গতই বটে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ ক্ষেত্রে যাহারা পরস্পর পৃথক, লৌকিক জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে তাহাদের মিলন আশ্চর্যজনক নহে। ধর্মানুভূতিতে পার্থক্য ও বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গোষ্ঠী জন-সাহিত্যের রসাস্বাদনে পরস্পর মিলিত হইয়াছে এবং বিপরীতধর্মী হিন্দু-মুসলমানের মিলনও জন-সাহিত্যের আসরে সম্ভব হইয়াছে। এমন কি গোষ্ঠী-সাহিত্য ও জন-সাহিত্যে পরস্পরের প্রভাবও দেখা যায়।

গোষ্ঠী-সাহিত্যের ন্যায় জন-সাহিত্যও দ্বিবিধ—ধামালী ও লৌকিক পাঁচালী। ধামালী সাধারণতঃ অবৈধ, পাঁচালী বৈধ। ধামালীই আদি জন-সাহিত্য। 'ধামালী'র অর্থ উৎপাত বা উৎপীড়ন। উৎপীড়ন-বাসনা আদিম মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক, সমাজবিরোধী ও উচ্ছৃঙ্খল। এই অবৈধ আদিম বাসনা রূপায়িত হইয়াছে ধামালী কাব্যে, আদি ধামালী কাব্য এত ইতর ও অশ্লীল যে ভদ্রলোকের অশ্রাব্য। ইহাকে বলা হইত কৃষ্ণ ধামালী এবং ইহা গীত হইত গ্রামের বাহিরে। গ্রামের ভিতরে গাহিবার মতো অপেক্ষাকৃত অল্প অশ্লীল ধামালীর নাম শুক্ল ধামালী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতেছে শুক্ল ধামালীর নিদর্শন। লক্ষ্য করিবার বিষয়—ধামালী কাব্য ইতর অতএব অশ্লীল লৌকিক কাব্য হইলেও ইহারও প্রাচীন যুগোচিত ধর্মের ছদ্মবেশ আছে, ইহাতে পৌরাণিক দেব-দেবীকে বিকৃত করিয়া কাব্যের পাত্র-পাত্রী করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের

কাল্পনিক চরিত্রহীনতার কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রহীনতাই প্রধান, শিবের চরিত্রহীনতাও আছে; তবে পৃথকভাবে নহে, উহা ঈষৎ মার্জিত ভাবে শিবের গানে, মনসামঙ্গল কাব্যে ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। ধামালী ও লৌকিক পাঁচালী উভয়েই সগোত্র জন-সাহিত্য বলিয়া একের মধ্যে অপরের অনুপ্রবেশ সহজ হইয়াছে। সমাজ-জীবনে ধামালীর ন্যায় অশ্লীল সাহিত্য বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত অন্যান্য কৃষ্ণ-ধামালী ও শিব-ধামালী কাব্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ধামালী কবিদিগের বংশধর রূপে খেউড়, ঝুমুর প্রভৃতি অশ্লীল কাব্য রচয়িতা কবিওয়ালাগণ আবির্ভূত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে বাঙ্গালীর রুচি-পরিবর্তনে তাহাদের রচনাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

লৌকিক পাঁচালীকে বলা যায় সার্থক জন-সাহিত্য। ইহা সকল সম্প্রদায়ের ও সকল বয়সের আবালবৃদ্ধবনিতার সাহিত্য। সেই জন্যই আদিম হইলেও ইহা শ্লীলতাবর্জিত নহে, অসামাজিক নহে। লৌকিক পাঁচালী দ্বিবিধ—প্রাচীন ও অর্বাচীন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে দাশরথি রায়ের রচনা বিকৃত ও অর্বাচীন লৌকিক পাঁচালীর নিদর্শন। অপরপক্ষে প্রাচীন যুগের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, সূর্যের পাঁচালী প্রভৃতি প্রাচীন পাঁচালীর দৃষ্টান্ত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নাথ-মঙ্গল (গোর্খ-বিজয় ও গোপীচাঁদের গান) প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য লৌকিক প্রাচীন পাঁচালীরই সুপরি`ত রূপ। মঙ্গল কাব্যভেদে দেবতাভেদ আছে বলিয়া কেহ কেহ মঙ্গলকাব্যকে ধর্ম-সাহিত্য বা গোষ্ঠী-সাহিত্য বলিয়া ভুল করেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে ধর্ম নহে, ধর্মের আবরণ মাত্র আছে; ইহাদের দেবতা ইহলোকের দেবতামাত্র, পরলোকের নহে। মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্মঠাকুর দক্ষিণ রায় প্রভৃতি বঙ্গের অনার্য গ্রাম-দেবতার এবং দেবোচিত বা দেবাধিক নাথ-গুরুগণের অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য। মহত্ত্বের নহে, শক্তির কাহিনীই এইগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্য-গুলির অধিদেবতা যতটা ভয়ের পাত্র, ততটা ভক্তির পাত্র নহেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে, লৌকিক উন্নতিই এই কাব্যগুলির ফলশ্রুতি। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে—লৌকিক পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্য সাধক-বিশেষের রচিত গোষ্ঠী-সাহিত্য নহে, জন-কবির রচিত জন-সাহিত্যই

ঘটে। ইহাতে জনতার আদিমতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। সমাজের নিম্নস্তরে পল্লীরমণীদের মধ্যে প্রচলিত অনার্য গ্রাম-দেবতার গল্প হইতে প্রথমে সংক্ষিপ্ত ছড়া-রূপে পাঁচালীর আবির্ভাব হয়, পরে গ্রাম্য কবিদের দ্বারা ইহার পরিপুষ্ট কবিতা-রূপের প্রকাশ ঘটে ; তখন হইতেই ইহার নাম হয় পাঁচালী। পাঁচালী আবার স্ফীতকায় হইয়া মঙ্গলকাব্য নাম গ্রহণ করে। এই প্রকার বারংবার রূপ-পরিবর্তন পাঁচালীর জন-ধর্মিতার অন্যতম লক্ষণ। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই পাঁচালী শাখাতেই বাঙ্গালীর সাধনা হইয়াছে সর্বাধিক,—আকারে ও সংখ্যায় মঙ্গলকাব্যগুলিই বঙ্গীয় প্রাচীন গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান দখল করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে তৎকালে-জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্যেরও সর্বাধিক সমাবেশ দেখা যায়। এইগুলিই অশিক্ষিত পল্লীবঙ্গের সত্যকার সামাজিক ইতিহাস এবং পল্লীজীবনের বিশ্বকোষ।

[পাঁচালী কাব্যের জন-প্রিয়তার ফলে পাঁচালী ও মঙ্গল শব্দের অর্থ-বিস্তার হয়, এবং 'কাহিনী কাব্য' অর্থেই ইহারা ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনীকে ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া যে গোষ্ঠী-সাহিত্য রচিত হয়, তাহাদের নাম হয় যথাক্রমে চৈতন্য-মঙ্গল ও কৃষ্ণ-মঙ্গল। তাছাড়া সভা-সাহিত্য, পুরাণ-কথাও 'পাঁচালী' নামে অভিহিত হইতে থাকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতকেও রামায়ণ-পাঁচালী ও ভারত-পাঁচালী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি বিশেষ ঘটনা মাত্র, সাধারণ ঘটনা নহে। কোন শব্দের বিশেষ অর্থের দ্বারা কখনই সাধারণ অর্থ খণ্ডিত হয় না।]

যদিও বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন যুগ প্রায় ছয় শত বৎসরব্যাপী, তথাপি তাহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থসংখ্যা কালানুপাতে নিতান্ত অল্প। এই সংখ্যাল্পতার কারণ বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রতিভার অভাব নহে। কবি-ধর্ম ও সঙ্গীতপ্রিয়তা বাঙ্গালীর চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন যুগে বহু গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশেরই অকাল-বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। এই বিলুপ্তির প্রধান কারণ—সাহিত্য-জগতের প্রাকৃতিক নির্বাচন। দুঃখের বিষয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনে সাহিত্য-গুণে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সর্বত্র রক্ষা পায় নাই। প্রাচীন বঙ্গে সাধারণ লাইব্রেরী বলিয়া কিছু ছিল না। নালন্দার মতো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, সংস্কৃত

চতুষ্পাঠীতেও বাংলা গ্রন্থ স্থান পাইত না। কাজেই সুপণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা বঙ্গীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অপকৃষ্টের বর্জন এবং উৎকৃষ্টের নির্বাচন ও সংরক্ষণ সম্ভব হয় নাই। বহু ক্ষেত্রে নিম্নরুচিসম্পন্ন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরা বাংলা পুথি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সাহিত্য-প্রীতির জন্য নহে, ধর্মসংস্কারের বশেই তাহাদের এই পুথি রক্ষা; তাহাদের বিশ্বাস, কাব্য দৈব-শক্তি-জাত এবং সেই জন্য পূজনীয়। মন্দিরে মন্দিরে পুথিপত্রও দেবতার সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে এবং সিন্দুর, চন্দন ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া পুরুষানুক্রমে পূজা পাইয়া আসিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট গ্রন্থই যে কালজয়ী হইয়াছে এবং বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থও কালগ্রাসে ধ্বংস হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থ ধ্বংসের জন্য দায়ী প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা—মোঘল-পাঠানের যুদ্ধ, কালাপাহাড় প্রভৃতির দ্বারা দেবমন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠন, বার-ভুঁইয়াদের সহিত নবাবদিগের সংঘর্ষ এবং মগ, ফিরিঙ্গি, বর্গী প্রভৃতি দস্যুদিগের লুণ্ঠন; তাছাড়া অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বঙ্গদেশের জলবায়ুর আর্দ্রতা ও পোকা-মাকড়ের উৎপাত প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর ঘটনাও গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী। এত বিপদ সত্ত্বেও যে কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থকে আমরা এ-যুগে খুঁজিয়া পাইয়াছি, তাহা আমাদিগের বিশেষ সৌভাগ্য। ভালো হউক, মন্দ হউক, যে কয়েকটি গ্রন্থ এ-যাবৎ রক্ষিত হইয়াছে, সেই গুলিই আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অমূল্য সম্পদ এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের একমাত্র উপকরণ।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অন্য ভাষার কবিগণের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব এবং পঞ্চদশ শতকের ব্রজবুলি ভাষার কবি বিদ্যাপতি। ইহাদের রচনা ও বিষয়বস্তুর অনুসরণে বাংলা বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যের একাংশ রচিত হইয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের সংস্কৃত গান এবং বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার পদাবলী বহুকাল যাবৎ প্রাচীন বাঙ্গালীর পরম উপাদেয়, আস্বাদ্য ও জীবনসহচর হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের রচনা ভাষায় যাহাই হউক, ভাবের দিক দিয়া খাঁটি বঙ্গীয়ই বটে। কাজেই ইহাদের কাব্য বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত হইবার দাবী রাখে।

নেপথ্য-বার্তা

প্রাচীন রীতির রচনা-পঞ্জী*

দশম-দ্বাদশ শতাব্দী (হিন্দু আমল)

ধর্মীয় গীতিসাহিত্য :

বৌদ্ধ সহজিয়া পদাবলী—কাহ্নু, লুই, ভুসুকু, কুকুরী, মীন, শবর, বিরুঅ, গুণ্ডরী, চাটিল, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, তন্ত্রী, আর্যদেব, ঢেণ্ঢণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী ও ধাম পাদের 'চর্যা'

পঞ্চদশ শতাব্দী (পাঠান আমল)

লৌকিক সাহিত্য :

ধামালী—বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

পৌরাণিক সাহিত্য :

কৃষ্ণ-লীলা—মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'

রামায়ণ—কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ-পাঁচালী'

ধর্মীয় গীতিসাহিত্য :

বৈষ্ণব পদাবলী—আদি চণ্ডীদাসের 'পদাবলী' (?)

মঙ্গলকাব্য :

মনসাকাব্য—বিজয় গুপ্তের 'মনসা-মঙ্গল' (?), বিপ্রদাস পিপিলাইএর 'মনসা-বিজয়' (?)

ষোড়শ শতাব্দী (পাঠান-মোঘল আমল)

পৌরাণিক সাহিত্য :

কৃষ্ণ-লীলা—গোবিন্দ আচার্য বা দ্বিজ গোবিন্দ, মাধব আচার্য, পরমানন্দ গুপ্ত ও কৃষ্ণদাসের 'কৃষ্ণ-মঙ্গল', ভাগবতাচার্য রঘুপণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী,' কবি শেখরের 'গোপাল-বিজয়', দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দ-

* নিত্য নূতন আবিষ্কারের জন্য এই তালিকা ক্রমবর্ধমান ও অসম্পূর্ণ না হইয়া পারে না।

মঙ্গল', অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতীর 'জয়দেব-কাব্য', পীতাম্বরের ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ, শঙ্করদেবের 'ভাগবতপুরাণ', মাধবদেবের 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মরহস্য', রামচরণের 'কংসবধ যাত্রা'

মহাভারত—কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'মহাভারত পাঁচালী', শ্রীকর নন্দীর ও রামচন্দ্র খানের 'অশ্বমেধ পর্ব', পীতাম্বরের 'নলদময়ন্তীচরিত্র', দ্বিজ রঘুনাথের 'অশ্বমেধ পাঁচালী', অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতীর 'ভারত পাঁচালী' ও তৎপুত্র গোপীনাথের 'দ্রোণপর্ব'

বিবিধ—দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', পীতাম্বরের মার্কণ্ডেয় পুরাণের পদ্যানুবাদ, পীতাম্বরের 'উষা-পরিণয়'

জীবনীসাহিত্য :

চৈতন্য-বিষয়ক—বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত', লোচনদাসের ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ-বিজয়', গোবিন্দদাসের 'কড়চা'

অদ্বৈত-সীতা-বিষয়ক—শ্যামদাস আচার্যের ও হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব', লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র'

নিত্যানন্দ-বিষয়ক—বৃন্দাবন দাসের (?) 'নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার'

ধর্মীয় গীতিসাহিত্য :

বৈষ্ণব পদাবলী—যশোরাজ খান, মুরারি গুপ্ত, (শ্রীখণ্ডের) নরহরিদাস সরকার, লোচনদাস, (একাধিক) বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, বাসুঘোষ, গোবিন্দঘোষ ও মাধবঘোষ, মাধবদাস, বাসুদেব দত্ত, রামানন্দ বসু, পরমানন্দ গুপ্ত, বংশীবদন চট্ট, অনন্ত আচার্য, অনন্ত দাস, রায় অনন্ত, পুরুষোত্তম দাস, দেবকীনন্দন, মাধবী, পরমেশ্বর, আত্মারাম, চন্দ্রশেখর, নয়নানন্দ, শিবানন্দ সেন ও শিবানন্দ আচার্য, উদ্ধবদাস, জগন্নাথ দাস, বৃন্দাবন দাস, নরোত্তম দাস, রায় বসন্ত, রায় চম্পতি, ভূপতি, রামচন্দ্র কবিরাজ, রামচন্দ্র মল্লিক, হরিদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দ আচার্য, মোহনদাস, রাধাবল্লভ, বল্লভ, প্রসাদ দাস,

মথুরাদাস, যদুনন্দন চক্রবর্তী, গোকুলদাস, ব্রজানন্দ, গিরিধর, ধরণী, শিবরাম, তুলসীরাম, রঘুনাথ, চৈতন্যদাস (বীর হাম্বীর), জয়কৃষ্ণ, রসিকানন্দ, গোপীবল্লভ, জানকীবল্লভ, গোস্বামীদাস, বিহারী দাস, কিশোরী, গোবর্ধন দাস, রায় শেখর বা দৈবকীনন্দন সিংহ, কবিরঞ্জন, দুঃখী শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতির পদাবলী

বৈষ্ণব রাগাত্মিক পদাবলী—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস, নরহরি প্রভৃতির ভণিতায় সহজিয়া পদাবলী, নরোত্তমের কিশোরী-ভজনের পদ

বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ—কবি শেখরের 'দণ্ডাত্মিকা লীলা,' গোবিন্দদাসের 'অষ্টকালীয় লীলাবর্ণন'

বৈষ্ণববন্দনা—দেবকীনন্দন ও মাধবদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'

তত্ত্বগ্রন্থ :

বৈষ্ণবতত্ত্ব-গ্রন্থ—লোচনদাসের 'দুর্লভসার', 'চৈতন্যবিলাস', 'বস্তুতত্ত্বসার', 'আনন্দলতিকা,' জ্ঞানদাসের 'ভাগবততত্ত্বলীলা', রামচন্দ্র কবিরাজের 'স্মরণদর্পণ', 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা', 'পদ্মমালা', শঙ্করদেব ও রামচরণের 'ভক্তিরত্নাকর', মাধবদেবের 'ভক্তিরত্নাবলী', কবিবল্লভের 'রসকদম্ব', শ্যামানন্দ দাসের 'উপাসনাসার', 'অদ্বৈত-তত্ত্ব', 'ভাব-মালা', 'গোবর্ধনোপদেশ-সংপ্রার্থনা', নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'স্বরূপকল্পতরু', 'দেহ-কড়চা', 'রাগমালা', 'আশ্রয়নির্ণয়', 'সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা', 'সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা', 'রসভক্তিচন্দ্রিকা', 'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'উপাসনাপটল', 'স্মরণমঙ্গল,' 'প্রেমভক্তিচিন্তামণি', 'ছয়তত্ত্বমঞ্জরী', 'ছয়তত্ত্ব-বিলাস', 'বস্তুতত্ত্ব', 'বস্তুতত্ত্বসার', 'ভজননির্দেশ', 'নবরাধাতত্ত্ব', 'ভক্তিলতাবলী', 'ভক্তিসারাৎসার', 'প্রেমমদামৃত', 'অভিরামপটল', 'মঙ্গলারতি,' 'চতুর্দশপটল', 'হাটপত্তন', 'প্রেম-বিলাস', 'বৈষ্ণবামৃত'

তীর্থ-মাহাত্ম্য—শ্যামানন্দের 'বৃন্দাবন-পরিক্রমা'

মঙ্গলকাব্য :

মনসাকাব্য—নারায়ণ দেব ও তন্ত্রবিভূতির 'মনসামঙ্গল'

চণ্ডীকাব্য—মানিক দত্ত (?), দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল'

লৌকিক সাহিত্য :

বিদ্যাসুন্দরকাব্য—দ্বিজ শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দরকাব্য', সাবিরিদ খাঁর 'বিদ্যাসুন্দর'

সপ্তদশ শতাব্দী (মোঘল আমল)

পৌরাণিক কাব্য :

কৃষ্ণলীলা—শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', ভবানন্দের 'হরিবংশ', যশশ্চন্দ্র ও তিলকরামের 'গোবিন্দবিলাস', পরশুরাম, বংশীদাস ও জীবন চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণমঙ্গল', ঘনশ্যাম কৃষ্ণকিঙ্করের 'কৃষ্ণসংকীর্তন', অভিরাম দাসের 'গোবিন্দ-বিজয়', বাণীকণ্ঠের 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত', ভবানী ঘোষের 'রাধাবিলাস'

মহাভারত—কাশীরাম দাস (দেব), নন্দরাম দাস ও নিত্যানন্দ ঘোষের 'ভারত পাঁচালী', গোবিন্দ কবিশেখরের 'কিরাতপর্ব', রামনারায়ণ দত্ত ও শ্রীনাথের 'দ্রোণপর্ব', শ্রীনাথ ও রাম কবিরাজের 'ভীষ্মপর্ব', বিশারদ চক্রবর্তীর 'বনপর্ব' ও 'বিরাটপর্ব', কৃষ্ণানন্দ বসুর 'শান্তিপর্ব' ও 'স্বর্গারোহণপর্ব', অনন্ত মিশ্র, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যাম দাস, দ্বিজ প্রেমানন্দ, দ্বিজ অভিরাম ও কৃষ্ণরাম দাসের 'অশ্বমেধপর্ব', জয়ন্ত দাসের 'স্বর্গারোহণ-পর্ব', গঙ্গাদাস ও রামেশ্বর নন্দীর 'আদিপর্ব'

রামায়ণ—অদ্ভুতাচার্য নিত্যানন্দের 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ', অদ্ভুতাচার্য রামশঙ্কর ও বৈদ্য রামশঙ্কর দত্তের 'রামায়ণ', ভবানীনাথের 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', দ্বিজ লক্ষ্মণের অধ্যাত্ম রামায়ণের আদিকাণ্ড ও 'শিবরামের যুদ্ধ', চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ-পাঁচালি' (?), কৈলাস বসুর 'অদ্ভুত রামায়ণ'

চণ্ডীকাব্য—দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়', ভবানীপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল', শ্রীকৃষ্ণ জীবনদাসের 'অম্বিকামঙ্গল'

শিবকাব্য—দ্বিজ রতিদেব ও রাম রায়ের 'মৃগলুব্ধ' (শিবচতুর্দশী), রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' (গদ্যে রচিত 'বচনিকা'-যুক্ত)

অন্যান্য—যদুনন্দন দাসের 'শুকদেবচরিত্র', ভবানীদাসের 'ব্রহ্মপুরাণ', পরশুরাম ও শ্যামদাস দত্তের 'গুরুদক্ষিণা', কাশীরামদাসের ভ্রাতা গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' বা 'জগন্নাথমঙ্গল'

জীবনীসাহিত্য :

বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক ও মোহন্ত-বিষয়ক—যদুনন্দনের 'কর্ণানন্দরস', নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস', গুরুচরণ দাসের 'প্রেমামৃত', রাজবল্লভের 'বংশীবিলাস', মনোহর দাসের 'অনুরাগ-বল্লী', তিলকরামের 'অভিরামলীলামৃত', গতিগোবিন্দের 'বীররত্নাবলী', আনন্দচন্দ্রের 'জগদীশবিজয়', যদুনন্দনের 'কর্ণানন্দ', গোপীজনবল্লভ দাসেব 'রসিকমঙ্গল', তিলকবামের 'বৈষ্ণবকথা'

বৈষ্ণবশাখা-নির্ণয়—('গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-অবলম্বনে) দেবনাথ দাসের 'গৌরগণাখ্যান', বলরামদাসের 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা', হৃদয়ানন্দ দাসের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকা', রসিক দাসের 'শাখাবর্ণন', রসিকানন্দ, অভিরাম দাস ও রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়', নরহরির 'আচার্যপ্রভুর শাখানির্ণয়', জয়কৃষ্ণ দাসেব 'ভুবনমঙ্গলগীত', রামগোপাল দাস ও নীলাচলচন্দ্র দাসের 'দ্বাদশপাটনির্ণয়', অভিরাম দাসের 'পাটপর্যটন', অজ্ঞাত লেখকের 'পণ্ডিত গোসাঞির সখাগণ', অজ্ঞাত লেখকের 'চৈতন্যগণোদ্দেশ',

বৈষ্ণববন্দনা—বৃন্দাবন দাস ও দাস-মণ্ডলের 'বৈষ্ণববন্দনা', রাইচরণ দাসেব 'অভিরামবন্দনা'

ধর্মীয় গীতিসাহিত্য :

বৈষ্ণবপদাবলী—হেমলতা দেবী, যদুনন্দন দাস, দিব্যসিংহ, ঘনশ্যামদাস কবিরাজ, রাধাবল্লভ দাস, পীতাম্বর দাস, "হরিবল্লভ" বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বিপ্রদাস ঘোষ, সৈয়দ মর্তুজা, সৈয়দ সুলতান, নরচন্দ্র, গোবিন্দবল্লভ, মর্কটবল্লভ, পার্বতী, দয়ারাম, কুমুদ, কৃষ্ণদেব, নট ভূঞিয়া, গতিগোবিন্দ, গৌরসুন্দর, গৌরমোহন, সুবলচন্দ্র ঠাকুর, সুন্দর দাস, জগদানন্দ দাস (১নং), বল্লভীকান্ত, মধুসূদন, রতিপতি, গোপাল দাস, গোপীকান্ত,

বীরবল্লভ, মহেশ বসু, তরুণীরমণ, মনোহর দাস, শঙ্কর ঘোষ, গোকুলানন্দ, বংশীদাস, শ্যামদাস, শিবরাম দাস, নৃসিংহ, রাঘবেন্দ্র রায়, উদয়াদিত্য, প্রতাপাদিত্য ও শ্যামপ্রিয়ার পদাবলী

রাম-পদাবলী—রামদাস ও কৃত্তিবাসের "রাম-রাসের" পদ, দুর্লভ রায়, দুর্গাচরণ ও মধুকণ্ঠের 'রাম-পদাবলী'

তত্ত্বগ্রন্থ :

বৈষ্ণব-তত্ত্ব-গ্রন্থ—অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্ত-বিলাস', 'ভক্তিরসালিকা', 'ভক্তি-রসাত্মিকা' ও 'ভক্তিরসচন্দ্রিকা', যদুনন্দনের 'হরিভক্তিচন্দ্রামৃত' ও রায়-শেখরকৃত সংস্কৃত হীরাবলীতত্ত্বের বঙ্গানুবাদ, যদুনাথের 'সংগ্রহতোষণী', গতিগোবিন্দের 'অন্তপ্রকাশখণ্ড', অজ্ঞাত লেখকের 'বংশীলীলামৃত', বৃন্দাবন দাসের 'তত্ত্ববিলাস', ঘনশ্যাম দাসের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী', রামগোপালের 'চৈতন্যতত্ত্বসার', মনোহর দাসের 'দিনমণিচন্দ্রোদয়', 'আশ্রয়কল্পলতিকা', 'ভক্তিরসোজ্জ্বলচূড়ামণি', 'মনোহর কারিকা' এবং 'রূপাঞ্জনলতিকা', দ্বিজ-বৃন্দাবন দাসের ভণিতায় 'তত্ত্বনিরূপণ', 'তত্ত্বসার', 'আনন্দলহরী', 'গোলোকসংহিতা', 'পাষণ্ড-দলন', 'ভক্তিতত্ত্বচিন্তামণি', 'ভাবাবেশ'; 'বৈষ্ণব-বন্দনা', 'বৈষ্ণবধর্ম', 'লীলামৃতসার', 'শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-সংবাদ', 'তত্ত্বমঞ্জরী', 'গোকুল-বিলাস' এবং 'তত্ত্ববিলাস', কৃষ্ণদাস-কবিরাজ ভণিতাযুক্ত 'অদ্বৈতসূত্রকড়চা', 'আত্মজিজ্ঞাসা', 'আত্মনিরূপণ', 'আত্ম-সাধন', 'আত্মাচিন্তামণি', 'আশ্রয়নির্ণয়', 'কিশোরীমঙ্গল', 'গুরুতত্ত্ব', 'চৈতন্য-তত্ত্বসার', 'জবা-মঞ্জরী', 'জ্ঞানরত্নমালা', 'নিগূঢ়তত্ত্বসার', 'নৃলোকসারচিন্তামণি', 'বাল্যরসবিলাস', 'বৃন্দাবনধ্যান', 'ভজনক্রম' ও 'মনোবৃত্তিপটল', রঘুনাথ গোস্বামীর 'শোচক', 'রাগময়ী কণা', 'রাগ-রত্নাবলী', 'শিক্ষাদীপিকা', 'শুদ্ধরতিকারিকা', 'সখী মঞ্জরীর কুঞ্জবাস', 'সারসংগ্রহ', 'সিদ্ধিনাম', 'স্বরূপবর্ণন', 'রসময়চন্দ্রিকা', 'রসকদম্বকলিকা', মুকুন্দদাসের ভণিতায় 'অমৃতরত্নাবলী', 'আত্মসারাৎসারকারিকা', 'আনন্দ-লহরী', 'রসসমুদ্র', 'রসসাগরতত্ত্ব', 'রাগরত্নাবলী', 'রাধারসকারিকা', ও 'সাধনোপায়', গৌরীদাসের 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী', রসিক দাসের

'সর্বতত্ত্বসার', বলরাম দাসের 'গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা', 'গুরুমাহাত্ম্যকথা', 'বৈষ্ণববিধান', 'হরপার্বতীসংবাদ' ও 'হাটবন্দনা', জগন্নাথ দাসের 'তিনমানুষবিবরণ', 'প্রেমদর্শন', ও 'ভক্তিসিদ্ধান্ত', জীব গোস্বামীর 'চম্পককলিকা' ও 'সাধ্যভাবামৃত', জ্ঞানদাসের 'আগম', গোবিন্দদাসের 'নিগম-গ্রন্থ', 'রসতত্ত্বসার' ও 'রসভক্তিচন্দ্রিকা', যুগলকিশোর দাসের 'চৈতন্যকারিকা', 'তত্ত্ববিবেচন', 'প্রেমবিষয়বিলাস' ও 'স্নেহমঞ্জরী', প্রেমদাসের 'গৌরাঙ্গ-কড়চা', 'নিত্যানন্দ-কড়চা', 'ভক্তিরসকৌমুদী', 'ভৃঙ্গরত্নাবলী' এবং 'রসোল্লাসতত্ত্ব', বংশীদাসের 'ভজনরত্ন' ও 'রসতত্ত্ব গ্রন্থ', শ্যামদাসের 'আত্মজিজ্ঞাসা', 'নিগূঢ়তত্ত্ব গ্রন্থ' ও 'সাধনবর্ত্ম', উত্তমদাসের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন' ও 'রসতত্ত্বসার' নরোত্তম দাসের 'কাঁকড়াবিছা গ্রন্থ', 'প্রেমবিলাস', 'বৈষ্ণবামৃত', কিশোরী দাসের 'সহজপ্রেমামৃত', রসময় দাসের 'প্রাপ্তিদুর্লভ', 'ভাণ্ডতত্ত্বসার' ও 'কৃষ্ণভক্তিবল্লী', রাধামোহন দাসের 'রসতত্ত্বকল্প', রাধাবল্লভ দাসের 'সহজতত্ত্ব', রায় রামানন্দের 'শ্রীচৈতন্য-প্রেমতত্ত্বমর্মনিরূপণ', রামচন্দ্র দাসের 'পদ্মমালা', দ্বিজ রামচন্দ্রের 'জাতক-সংবাদ', কৃষ্ণরাম দাসের 'ভজনমালিকা', রসিকানন্দ দাসের 'লীলামৃত-রসপূর', গোপীকৃষ্ণদাসের 'হরিনামকবচ', শ্রীচৈতন্যদাসের 'রসভক্তি-চন্দ্রিকা', নিকৃষ্ট কুশাই-এর 'জ্ঞানশব্দপুস্তক', নরহরির 'নামামৃতসমুদ্র', প্রেমানন্দ দাসের 'চন্দ্রচিন্তামণি', ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাসের 'গোপী উপাসনা', অনন্ত দাসের 'ভজনতত্ত্ব', গদাধর দাসের 'রসামৃতলতিকা', অজ্ঞাত লেখকের 'উজ্জ্বলরস', 'গুণাত্মিকা গ্রন্থ', 'ব্রজপটলকারিকা,' 'সাধনতত্ত্বসার', 'সাধকসিদ্ধরূপবিচার', 'গৌরচন্দ্রমনোবৃত্তি', 'চূড়ামণি', 'রসপূরকারিকা', 'জ্ঞানসন্ধান', 'পঞ্চাঙ্গনিগূঢ়ার্থ', 'নিত্যপ্রকটস্বসেবা', 'পঞ্চনামের তত্ত্ব', 'ভণটিকা গ্রন্থ,' 'ব্রজতত্ত্বনিবর্ত', 'মন্ত্রমালা', 'রসদীপিকা,' 'রাগমার্গলহরী', 'ভাবাদিরস', 'সর্বতত্ত্বসার', 'হরিনামামৃতদীপিকা', 'হরিনামের অর্থ', 'শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থ', 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা', 'প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী' ও 'ব্রজপুরকারিকা', 'রসাল'

বৈষ্ণব অলংকার তত্ত্ব-গ্রন্থ—নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা', রামগোপাল দাসের 'অষ্টরস' ও 'রসকল্পবল্লী', মুকুন্দ দেবের 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়', পীতাম্বর

দাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাখ্যা', বৃন্দাবন দাসের 'রস-নির্যাস', অজ্ঞাত লেখকের 'নায়িকা-রত্নমালা'

সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ—মদন রায়ের 'গোবিন্দলীলামৃতভাষা' (কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত'), যদুনাথ, রূপনাথ দাস ও দেবনাথ দাসের 'ভ্রমরগীতা' (ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৭ অধ্যায়, ১২-২১ শ্লোক), দ্বিজ নরসিংহ ও কিশোর দাসের 'উদ্ধবদূত' (রূপ গোস্বামী রচিত), যদুনন্দনের 'রসকদম্ব' (রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব'), 'দান লীলাচন্দ্রামৃত' (রূপের'দান-কেলি-কৌমুদী'), 'গোবিন্দবিলাস' (কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত') ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' (বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণ-কর্ণামৃত), নরোত্তম ও নরসিংহ দাসের 'হংসদূত' (রূপ গোস্বামীর 'হংসদূত'), বিষ্ণুরাম নন্দীর 'উদ্ধবগীতা' ও অজ্ঞাতকবির 'উদ্ধবদূত' (কবীন্দ্র রচিত), রাধাবল্লভ দাসের 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' ও কৃষ্ণচন্দ্র দাসের 'বিলাপবিবৃত্তিমালা' (রঘুনাথ দাসের 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'), নারায়ণ দাসের 'মুক্তাচরিত্র' (রঘুনাথ দাস রচিত), অজ্ঞাতনামা কবির 'স্বনিয়মদশক', (রঘুনাথ দাস রচিত) 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি' এবং (রূপ গোস্বামীর) 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' (প্রবোধানন্দের)

গীতার অনুবাদ ও অনুসরণ—রতিরাম দাসের 'সারগীতা', কৃষ্ণদাসের 'রত্নগীতা', ভবানীদাসের 'রামরত্নগীতা', ব্যাসদাস ও মুকুন্দদাসের 'অর্জুন-সংবাদ', ভক্তিদাসের 'বৈষ্ণবামৃত'

খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব-গ্রন্থ—দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'

মুসলমানী তত্ত্বগ্রন্থ—সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও 'নবীবংশ'

মঙ্গলকাব্য :

মনসাকাব্য—বংশীদাস চক্রবর্তী, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল, কালিদাস ও সীতারাম দাসের 'মনসামঙ্গল', রসিক মিশ্র কবি বল্লভ ও দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'জগতী-মঙ্গল', রতিদেবের 'মনসার ধূপাচার', দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দের 'বেহুলা-লখীন্দর পাঁচালি'

চণ্ডীকাব্য—দ্বিজ হরিরামের 'অদ্রিজা (চণ্ডিকা) মঙ্গল', জনার্দনের 'মঙ্গল-

চণ্ডীর পাঁচালি, অজ্ঞাত কবির 'ঘোর মঙ্গলচণ্ডী', দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডিকার ব্রতকথা', রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল'

ধর্মকাব্য—খেলারাম, শ্যামপণ্ডিত, ধর্মদাস, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক ও সীতারাম দাসের 'ধর্মমঙ্গল'

বিবিধ—কৃষ্ণরামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল,' 'শীতলামঙ্গল,' 'রায়মঙ্গল'

লৌকিক কাব্য ঃ

বিদ্যাসুন্দর কাব্য—কবি কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, ও প্রাণরাম চক্রবর্তীর 'কালিকা-মঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দর

অন্যান্য প্রেম-কাব্য—দৌলৎ কাজির 'লোর চন্দ্রাণি', আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'ছয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল', 'সতী ময়না', 'তোফা', 'সপ্তপয়কর' ও 'দারা সেকেন্দার নামা', কোরেশী মাগনের 'চন্দ্রাবতী'

ঐতিহাসিক কাব্য—মহম্মদ খানের 'মুক্তাল হোসেন' (কারবালার যুদ্ধ-কাহিনী)

অষ্টাদশ শতাব্দী (মোঘল আমল)

পৌরাণিক সাহিত্য ঃ

কৃষ্ণলীলা—হরিদাসের 'মুকুন্দমঙ্গল', 'বলরামদাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত', রমানাথের মনোহর সেনের, যুগলকিশোরের, নন্দরাম ঘোষের ও শিবানন্দের 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', গোপালসিংহ দেবের 'রাধাকৃষ্ণলীলা', ঘনশ্যাম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস', শঙ্কর চক্রবর্তীর 'ভাগবতামৃত', রামেশ্বরের 'গোবিন্দমঙ্গল', মাধবেন্দ্রের 'ভাগবতসার', প্রভুরামের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রের 'কৃষ্ণমঙ্গল', বৃন্দাবনদাসের 'দধিখণ্ড', গোপিকামোহন ও ভবানন্দের 'ঘুঘু-চরিত্র', শতজীবদাসের 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড', গঙ্গারামের 'গোপালচরিত', রামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত', পরাণদাসের 'রসমাধুরী', বৃন্দাবনদাস, মাধবানন্দ ও কৃষ্ণরাম দত্তের 'রাধিকা-মঙ্গল' হরিচরণের 'শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ', যদুনন্দনের 'কলঙ্কভঞ্জন', শঙ্কর কবিচন্দ্র, কাশীনাথ, কেতকাদাস, ক্ষুদিরামদাসের 'রুক্মিণীমঙ্গল', শচীনন্দনের 'উদ্ধব-সংবাদ' ও

'রাসপঞ্চাধ্যায়', রসিকনন্দনের 'গোপীগোষ্ঠ', মদনচাঁদ গোলকচাঁদের 'কলঙ্ক উদ্ধার', গিরিধর দাসের 'নন্দোৎসব', গৌরচন্দ্র কুণ্ডুর 'বস্ত্রহরণ', শিব শিরোমণির 'মণিহরণ', দ্বিজ রামশরণের 'সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন', কিশোর দাসের 'উদ্ধব-সংবাদ', 'রাসপঞ্চাধ্যায়', মদন দত্ত, শ্রীধর বাণিয়া ও ক্ষীণ দেবীদাসের 'রাধার চৌতিশা' ও 'রাধার বারমাসি', অজ্ঞাত লেখকের 'কাহ্নাই বন্ধন খালাস'

মহাভারত—শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'সংক্ষিপ্ত ভারত-পাঁচালী', ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব', সারলা দাসের কয়েকটি পর্ব, দুর্লভসিংহের 'মহাভারত', গোপীনাথ দত্তের 'দ্রোণপর্ব' ও 'স্ত্রী-পর্ব', গোপীনাথ পাঠকের 'সভাপর্ব', চন্দনদাস দত্ত, ঘনশ্যাম, কৃষ্ণরাম, প্রেমানন্দ, সুবুদ্ধি রায়, গঙ্গাদাস, ভবানীদাস প্রভৃতির 'অশ্বমেধ পর্ব', পুরুষোত্তম দাসের 'পাণ্ডব পাঞ্চালী, রামলোচনের 'স্ত্রী-পর্ব', গোবর্ধনের 'গদাপর্ব', কৃষ্ণপ্রসাদের 'ভীষ্মপর্ব', অকিঞ্চন দাসের 'সৌপ্তিকপর্ব', নিমাই-এর 'কর্ণপর্ব', দ্বৈপায়ন দাসের 'বন, গদা ও স্বর্গারোহণপর্ব', মহেন্দ্র, রাজারাম, হরিদেব ও রামেশ্বরের 'দণ্ডীপর্ব', বাসুদেবের 'স্বর্গারোহণ-পর্ব', রাজেন্দ্র দাসের 'আদিপর্ব', রঘুরাম ও রুদ্রদেবের 'আদিপর্ব', গোপীনাথ, জয়দেব, হরেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজসুন্দরের 'সভাপর্ব', কৌশারি, বলরাম, বৈদ্যনাথ, পরমানন্দ, মহীনাথ, রামবল্লভ দাস ও জগন্নাথ কবি-বল্লভের 'বনপর্ব', লক্ষ্মীরাম ও বৈদ্য পঞ্চাননের 'কর্ণপর্ব', রামনন্দনের 'শল্যপর্ব', রামনন্দন ও বৈদ্যনাথের 'গদাপর্ব', হরেন্দ্রনারায়ণের 'ঐষিকপর্ব', দ্বিজ বৈদ্যনাথের 'শান্তিপর্ব'. মহীনাথ শর্মার 'অশ্বমেধপর্ব', দ্বিজ কীর্তিচন্দ্রের 'আশ্রমিক পর্ব', মহীনাথ ও মাধবচন্দ্রের 'প্রস্থানিক পর্ব'

রামায়ণ—শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ পাঁচালী', রামনারায়ণ, দ্বিজ তুলসী, খোসাল শর্মা, মতিরাম, জগন্নাথ দাস ও দ্বিজ দুলালের 'অঙ্গদ রায়বার', লক্ষ্মণ ও কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ', দয়ারাম ও রামশঙ্করের 'তরণীসেনের যুদ্ধ', রামশঙ্কর ও সর্বাণীনন্দনের 'মহীরাবণ বধ , লক্ষ্মণের 'নরমেধ যজ্ঞ', সীতাসুতের 'বাল্মীকি পুরাণ', রামগোবিন্দ দাসের 'রামায়ণ কাব্য', ভবানীশঙ্করের 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড', রামশঙ্করের 'অরণ্যকাণ্ড', সাফল্যরাম ও ধনঞ্জয়ের 'অরণ্যকাণ্ড', শিবচন্দ্র সেনের 'সারদামঙ্গল' বা 'শ্রীরাম

পাঁচালী', রাজীবের 'উত্তরাকাণ্ড', কৃষ্ণানন্দের 'অশ্বমেধ', পঞ্চানন্দ, মানিকচন্দ্র ও রামচন্দ্রের যথাক্রমে 'উত্তরাকাণ্ড', 'লঙ্কাকাণ্ড' ও 'সুন্দরাকাণ্ড', শিবরাম ও লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল', শম্ভুসুতের 'আদিকাণ্ড', উৎসবানন্দের 'সীতার বনবাস' ও 'লবকুশের যুদ্ধ', রসিকের 'তাড়কাবধ', জয়দেবের 'পদ্মলোচনবধ', গঙ্গারাম, দুর্গারাম ও হটু শর্মার কয়েকটি রামায়ণ পালা, গুণরাজ খান, কল্যাণ দেব, মনোহর সেন, লক্ষ্মীরাম, রঘুরাম, রুদ্রদেব, দেবীনন্দন, ব্রজসুন্দর, লোকনাথ, শারদানন্দ ও বংশীমোহনের কয়েকটি পালা, রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের 'সুন্দরাকাণ্ড', রামানন্দ যতি ও বুদ্ধাভিমানী রামানন্দ ঘোষের 'রামায়ণ পাঁচালী', জগৎরাম রায়ের (পুষ্করখণ্ড ও রাম-রাস যুক্ত) 'অদ্ভুত রামায়ণ', রামচন্দ্রের 'বিভীষণের রায়বার', কাশীনাথের 'কালনেমির রায়বার', পৃথ্বীচন্দ্রের 'ভূষণ্ডী রামায়ণ'

চণ্ডীকাব্য—পৃথ্বীচন্দ্রের ও শিবচরণের 'গৌরীমঙ্গল', হরিশ্চন্দ্রের 'চণ্ডীবিজয়', রামশঙ্করের 'অভয়ামঙ্গল', হরিনারায়ণের 'চণ্ডিকামঙ্গল', কালিদাসের 'কালিকাবিজয়', বনদুর্লভের 'দুর্গাবিজয়', জগন্নাথের 'দুর্গা পুরাণ', দীনদয়ালের 'দুর্গাভক্তিচিন্তামণি', রামনিধির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', রামনারায়ণের 'শক্তিলীলামৃত' ও 'ভবানীমঙ্গল', গঙ্গানারায়ণের 'ভবানীমঙ্গল', রঘুবংশ, তিলকচন্দ্র ও রাজীবলোচনের যথাক্রমে 'গৌরীবিদায়', 'গৌরীবিবাহ' ও 'শিবদুর্গার বিবাহ', মহীনাথ শর্মার 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' (দেবীসপ্তশতী) বিষ্ণুরামের 'দুর্গাসপ্তশতী', মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ'

অন্যান্য পৌরাণিক পাঁচালী—ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দ্বিজ বৈদ্যনাথের 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' ও 'শিবপুরাণ', রিপুঞ্জয়ের 'ব্রহ্মবৈবর্ত' ও 'পদ্মপুরাণ', রামানন্দের 'ধর্মপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'নৃসিংহপুরাণ', পরমানন্দ ও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের 'স্কন্দপুরাণ' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', সিদ্ধান্ত সরস্বতীর 'নারদীয় পুরাণ', কালুরাম দাসের 'একাদশীর মাহাত্ম্য', কৃষ্ণদাসের 'কণ্বমুনির পারণা', অনন্তরাম দত্ত, রামেশ্বর নন্দী ও রামসুন্দরের পদ্মপুরাণের 'ক্রিয়াযোগসার', পরশুরাম, শ্যামাদাস, অযোধ্যারাম শঙ্কর,

শিবশঙ্কর কবিভূষণ, শঙ্কর আচার্য ও মহাদেব দাসের 'গুরুদক্ষিণা', ভরত পণ্ডিত, শ্রীমন্ত দাস, জয়রাম দাস, দেবীদাস, দ্বিজ কংসারি, সীতারাম দত্ত ও কৃষ্ণদাসের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত ও ভরত পণ্ডিতের 'ধ্রুব-চরিত্র', কংসারি সুত, ভগীরথ, গোবিন্দ ও দুর্গাদাসের 'তুলসীচরিত্র', অনন্তরাম, গৌরীচরণ, শ্রীনাথ, দয়াময় ও রামচন্দ্রের 'উষাহরণ', রসিক, ভবানীনাথ ও গোপীনাথ দত্তের 'পারিজাতহরণ', ভৈরবচন্দ্র দাসের 'উষারসার্ণব', কালিদাসের 'যমকবলচরিত্র', লক্ষ্মীকান্তের, 'উঞ্ছবৃত্তি', কমলাকান্তের 'মণিহরণ', মাধবদাসের 'হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ', রামকেশবের 'সহস্রগিরি রাবণবধ', শঙ্করদাসের 'যমপ্রজাসংবাদ', মুকুন্দদাস, ভক্তিদাস ও আনন্দদাসের 'অর্জুনসংবাদ', মহেন্দ্র, রাজারাম ও হরিদেবের 'দণ্ডীপর্ব', কামদেব দত্তের 'ব্রতমালা', দ্বিজ সৃষ্টিধরের 'মহেশমঙ্গল', দ্বিজ হরিহরপুত্রের 'বৈদ্যনাথমঙ্গল', শম্ভুরামের 'অনন্ত-চতুর্দশীব্রতকথা', রামেশ্বর ও মাধবানন্দের 'জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা', দ্বিজ গৌরাঙ্গ ও জয়রামের 'গঙ্গামঙ্গল', অযোধ্যারামের 'গঙ্গাবন্দনা', দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী', শম্ভুরামের 'জীমূতমঙ্গল', শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'গুরুদক্ষিণা', শঙ্কর কবিচন্দ্রের ও কৃষ্ণদাসের 'দাতাকর্ণ'

জীবনীসাহিত্য :

চৈতন্য বিষয়ক—কবি কর্ণপূরের নাটকের অনুসরণে প্রেমদাসের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী', হৃদানন্দের 'চৈতন্যচরিত', জগজ্জীবন মিশ্রের 'মনঃসন্তোষিণী', পুরন্দরের চৈতন্যচরিত্র', দ্বিজ নিত্যানন্দের 'চৈতন্য পাঁচালী', রামশরণের 'চৈতন্যবিলাস', ধূপরাজের 'গৌরাঙ্গসন্ন্যাস', জগন্নাথের 'চৈতন্য পাঁচালী', নবণীদাসের 'জগন্মোহন-ভাগবত'

বৈষ্ণব মোহন্ত বিষয়ক—উদ্ধবদাসের 'ব্রজমঙ্গল' (লোচনদাস-জীবনী) কৃষ্ণচরণ দাসের 'শ্যামানন্দপ্রকাশ', কবীর দাসের 'রামকৃষ্ণ-চরিত' (রামকৃষ্ণ গোস্বামী) ও 'চরিত্র-চিন্তারত্ন' (বাণীকিশোর গোস্বামীর জীবনী), নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' (তিন প্রভু; ছয় গোস্বামী

ও শ্রীনিবাসাদি মহাত্মকথা), 'নরোত্তমবিলাস' ও 'শ্রীনিবাস-চরিত্র', রাধারমণ দাসের 'বঙ্কিত চরিত্র' (গঙ্গারাম ঘোষের জীবনী'), জগদানন্দের 'শ্যামচন্দ্রোদয়' (পাহুআ ঠাকুরের কাহিনী)

বৈষ্ণব শাখা নির্ণয়—দীনহীনের 'কিরণ-দীপিকা', রমাই-এর 'চৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকা'

ধর্মীয় গীতিসাহিত্য :

বৈষ্ণব পদাবলী—নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস, নটবর দাস, উদ্ধব দাস, দীনবন্ধু দাস, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর জগদানন্দ (২নং), ভগীরথ, পীতাম্বর দাস, দীন অকিঞ্চন, কান্তদাস, রামানন্দ, গোপীবল্লভ দাস, পরীক্ষিৎ দাস, দামোদর, কার্তিক, প্রেমানন্দ দাস, ঘনরাম দাস, রাধামোহন ঠাকুর, ভুবন দাস, বিন্দু দাস, গোবর্ধন দাস, আনন্দ দাস, নবকান্ত, দীনদাস, নন্দ প্রভৃতির পদাবলী, শচীনন্দনের 'গৌরাঙ্গ-বিজয়'

বৈষ্ণবপদসংগ্রহ গ্রন্থ—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র', বৈঁষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু', গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ', দীনবন্ধুর 'সংকীর্তনামৃত', রাধামুকুন্দ দাসের 'মুকুন্দানন্দ', কমলাকান্ত দাসের 'পদ-রত্নাকর', নিমানন্দ দাসের 'পদ-রস-সার', চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের পদের সংকলন—'নায়িকা-রত্নমালা'

শাক্ত পদাবলী—রামপ্রসাদ সেনের শ্যামাসঙ্গীত

তত্ত্বগ্রন্থ :

বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থ—গোবিন্দদাসের 'গৌরাখ্যান', শ্যামানন্দ দাসের 'সাধনবত্ম' ও 'নিগূঢ় তত্ত্বগ্রন্থ', জয়কৃষ্ণ দাসের 'তত্ত্বসার', অচ্যুত দাসের গোপীভক্তিরস', রাধাকৃষ্ণ দাসের 'রসভক্তিলহরী', শ্যামদাসের 'আত্মজিজ্ঞাসা', নরসিংহ-দাসের 'দর্পণচন্দ্রিকা', রামানন্দ মিশ্রের 'রসতত্ত্ববিলাস', ভক্তিদাসের 'বৈষ্ণবামৃত', কৃষ্ণদাসের 'আত্মচিন্তামণি', স্বরূপের 'উপাসনাপটল', প্রেমানন্দ দাসের 'চন্দ্রচিন্তামণি', হরিদাসের 'চৈতন্য মহাপ্রভু', নরহরির 'নামামৃতসমুদ্র', রাধাদাসের 'মনুষ্যতত্ত্বসারাবলি', রাধাদামোদর দাসের

'সখীরস পয়ার', চৈতন্যদাসের 'রসভক্তিচন্দ্রিকা' (বা 'আশ্রয়নির্ণয়'), কালিদাসের 'চৈতন্য নিত্যানন্দ গীতা', রাধাবল্লভ দাসের 'সহজ তত্ত্ব', নরসিংহ দাসের 'পদ্মশৃঙ্গার', গোপীকৃষ্ণ দাসের 'হরিনামকবচ', শ্রীরূপের 'ব্রজতত্ত্বনিবর্ত্ত', দাস গোস্বামীর 'সিদ্ধান্ত-টীকা', রঘুনাথ দাসের 'আত্ম-নির্ণয়', 'কড়চা' ও 'রাগমার্গলহরী', নিত্যানন্দ দাসের 'রসকল্পসার', রত্নদাসের 'ভজনতত্ত্বকথা', বলরাম দাসের 'পাষণ্ডদলন', গোপাল দাসের 'পাষণ্ডদলন', ধনঞ্জয় দাসের 'কৃষ্ণভক্তিরস, বৈষ্ণব দাসের 'সাধ্যসাধনতত্ত্ব', কৃষ্ণদাসের 'বৃন্দাবনলীলা', আনন্দ দাসের 'রসসুধার্ণব', গৌরমোহন দাসের 'হরিনামার্থ গ্রন্থ', জগৎদাসের 'যোগাগম গ্রন্থ', রামকৃষ্ণদাসের 'স্মরণচমৎকার', হরিরাম দাসের 'মনঃশিক্ষা', গিরিধর দাসের 'মনঃ-শিক্ষা', মুকুন্দদাসের 'সর্বতত্ত্বসার', 'বৈষ্ণবামৃত' ও 'অমৃততোষণী', মথুরা-দাসের 'আনন্দলহরী', গুণরাজ খানের নিবন্ধ, ভগীরথ বন্ধুর 'চৈতন্য-সংহিতা', রামরত্নের 'শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী', রামানন্দের 'রসতত্ত্ববিলাস', অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্ত-বিলাস', নয়নানন্দের 'ভক্তি-মাধবীকণা' ও 'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব', অজ্ঞাত লেখকের 'ভক্তিরসার্ণব', 'বৈষ্ণবরহস্য', 'প্রেম উল্লাস' ও 'আগমবর্ণভেদ'

অনুবাদ ও অনুসরণ—মূল 'উৎকলখণ্ড' অনুসরণে দ্বিজ মুকুন্দ, বিশ্বম্ভর দাস, কবি কুমুদ ও দ্বিজ মধুকণ্ঠের 'জগন্নাথমঙ্গল' এবং বিজয়রাম সেনের 'গজেন্দ্রমোক্ষণ, গিরিধর দাস, রঘুনাথ দাস, রসময় দাস ও দ্বিজ প্রাণ-কৃষ্ণের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের অনুবাদ (প্রাণকৃষ্ণের অনুবাদের নাম 'জয়দেব প্রসাদাবলী'), জগৎসিংহের গীতগোবিন্দ অনুবাদ, স্বরূপ-চরণের 'প্রেমকদম্ব' কাব্য (মূল—রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' নাটক), বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারীর 'গীতা'-ভাষা, গোপাল দাস, পরাণ দাসের রামানন্দ রায়-রচিত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের অনুবাদ, কৃষ্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক রঘুনাথ দাস-রচিত 'বিলাপবিবৃতিমালা'র অনুবাদ, প্রেমদাস কর্তৃক কবি-কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ, কৃষ্ণদাস কর্তৃক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'মাধুর্য-কাদম্বিনী', 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা', 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-বিন্দু', 'ভাগবতামৃত-কণা' ও 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ'

অনুবাদ; 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অপর অনুবাদ জগন্নাথ দাসের 'উজ্জ্বলরস' ও শচীনন্দন বিদ্যানিধির 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা', অজ্ঞাত কবির 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র অনুবাদ (মূল 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র লেখক রূপ গোস্বামী), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র অনুসরণে নয়নানন্দের 'কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব', অজ্ঞাত লেখকের প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' কাব্যের অনুবাদ, কাশীনাথ কৃষ্ণকিঙ্করের জয়গোপাল-রচিত 'ভক্তিভাবপ্রদীপে'র অনুবাদ, বৈষ্ণবচরণ দাসের কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত 'শ্রীরূপমঞ্জরীপাদ প্রার্থনা', কিশোরী দাসের 'অয়ি দীন শ্লোকার্থ সিন্ধুর বিন্দু প্রকাশ' ('অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে' শ্লোক মাধবেন্দ্র-পুরী রচিত), রাঘবের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে'র অনুবাদ, রসিকানন্দ দাস কর্তৃক গোপালঠাকুর-রচিত 'লীলামৃতরসপূর' অনুবাদ

মঙ্গলকাব্য:

মনসাকাব্য—জগৎজীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, রাজা রাজসিংহ, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, বৈদ্য হরিনাথ, কৃষ্ণানন্দ, জানকীনাথ, জগন্নাথ, কবি কর্ণপুর শ্রীরামবিনোদ, গঙ্গাদাস সেন, ষষ্ঠীবর ও বাণেশ্বরের 'মনসা-মঙ্গল'

চণ্ডীকাব্য—দ্বিতীয় মানিক দত্তের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী', মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল', রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' (কবিকঙ্কণের কাব্য-সমালোচনাযুক্ত), জয়নারায়ণ রায়ের 'চণ্ডিকামঙ্গল' (কালকেতু, ধনপতি, মাধব-সুলোচনা কাহিনী), ভবানীদাসের 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা', মদন দত্ত ও দ্বিজ জনার্দনের 'চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী', দ্বিজ রঘুনাথ, শিবনারায়ণ, দেবীদাস শর্মা ও দুইজন অজ্ঞাত কবির যথাক্রমে 'নিয়তমঙ্গলচণ্ডী', 'নিত্যমঙ্গলচণ্ডী', 'নিকটমঙ্গলচণ্ডী' 'ঘোরমঙ্গলচণ্ডী' ও 'জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী', দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত', শ্রীচাঁদ দাসের 'কালকেতুর চৌতিশা', দেবীদাস সেনের 'শ্রীমন্তের চৌতিশা', বলরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল', অজ্ঞাত কবির 'চৈত্র-মাহাত্ম্য'

ধর্মকাব্য—ধনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বাড়ুজ্জে, নরসিংহ বসু, প্রভুরাম

মুখুজ্জে, হৃদয়রাম সাউ, নিধিরাম কবিচন্দ্র, শঙ্কর কবিচন্দ্র, মাণিকরাম গাঙ্গুলি ও রামকান্ত রায়ের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য, দ্বিজ রাজীব ও ভবানন্দের 'গোলাহাট' পালা', সহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণের 'অনিলপুরাণ', ময়ূর-ভট্টের নামে প্রচলিত রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের 'ধর্মপুরাণ', রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত 'শূন্যপুরাণ', দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের 'লাউসেন চুরি' ও রামনারায়ণের 'ইছাই বধ' পালা।

নাথকাব্য—ভীমসেন, ভীমদাস ও ফৈজুল্লার 'গোর্খ-বিজয়' বা 'মীনচেতন', দুর্লভ মল্লিকের 'ময়নামতীর গান' বা 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', ভবানীদাস ও সুকুর মামুদের 'গোপীচন্দ্রের গান'

শিবকাব্য—দ্বিজ কবিচন্দ্র ও রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন'

অন্যান্য দেবতার পাঁচালী—দয়ারাম, বীরেশ্বর ও মুনিরামের 'সারদামঙ্গল,' রাজা রাজসিংহের 'ভারতীমঙ্গল', মালাধর বসু, দ্বিজ কালিদাস, লক্ষ্মণ ও রামজীবম বিদ্যাভূষণের 'সূর্যমঙ্গল পাচালী', কৃষ্ণ কিঙ্করের 'পঞ্চানন-মঙ্গল', দ্বিজ বিনোদ, রামদয়াল, যদুনাথ, কালিদাস, ষষ্ঠীচরণ, অন্নপূর্ণা দাসী ও গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর 'শনির পাঁচালী', শিবানন্দ কর, দ্বিজ পঞ্চানন, ভরত পণ্ডিত, শঙ্কর, বসন্ত, ক্ষীরোদনন্দন, ধনঞ্জয় ও যাদব দাসের 'লক্ষ্মী-চরিত্র,' রুদ্ররাম চক্রবর্তীর 'ষষ্ঠীমঙ্গল', রুদ্রদেবের 'রায়মঙ্গল', মানিক গাঙ্গুলি, দয়াল, অকিঞ্চন চকবর্তী, দ্বিজ গোপাল, শ্রীবল্লভ, শঙ্কর ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল', মুরলীধর, রামপ্রসাদ ও মাধবীলতার 'সুবচনীর পাঁচালী', অজ্ঞাত কবির 'রাজবল্লভীর কথা', ভক্তদাস পালের 'দণ্ডেশ্বরীর বন্দনা', অজ্ঞাত কবির 'যোগাদ্যার বন্দনা', গঙ্গাধর দাসের 'কিরীটীমঙ্গল', কাশীদাসের 'ইতুপূজা পালা'

সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী—ভৈরব ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর চক্রবর্তী, ফকিররাম দাস, বিকল চট্ট, গিরিধর, মৌজিরাম ঘোষাল, কৃষ্ণকান্ত, শিবচরণ, রামশঙ্কর, কৃপারাম, কাশীনাথ, রামধন, নন্দরাম, অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায়, রামভদ্র, বিশ্বেশ্বর, জনার্দন, অমর সিংহ, রামচন্দ্র, দুর্গাপ্রসাদ, ঈশান, নরহরি, মধুসূদন, কালিদাস, বিশ্বনাথ গোবিন্দ, শিবচন্দ্র, বিপ্রনাথ, রামকিশোর, লালা

জয়নারায়ণ সেন, রামানন্দ, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ, ফকিরচাঁদ, দ্বীজরাম, নয়নানন্দ, রঘুরাম, হরিদাস, বিজয় ঠাকুর, শিবরাম, দেবকীনন্দন, গঙ্গারাম, শিবনারায়ণ, বিদ্যাপতি ও কুমুদানন্দের পাঁচালী। তাছাড়া শ্রীকবিবল্লভ, কিঙ্কর, ফকীররাম, কৃষ্ণবিহারী ও মুসলমান কবি আরিফ্ -এর রূপকথামূলক বৃহত্তর পাঁচালী। শঙ্কর আচার্য ও কৃষ্ণহরি দাসের 'সত্যপীর পাঁচালী' (এক্ষেত্রে সত্যপীর মাধব মাত্র), শ্রীকবিবল্লভের সত্যপীর বিষয়ক 'মদনসুন্দর' পালা

অন্যান্য পীর—মছন্দলী পীর, ত্রিনাথ, হাসিলদেব, বড় খাঁ গাজী ও মানিক-পীরের ছড়া

লৌকিক সাহিত্য :

(১) প্রেমকাব্য—বলরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র রায়, রাধাকান্ত, রামপ্রসাদ সেন, কবীন্দ্র চক্রবর্তী ও নিধিরাম আচার্যের 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকামঙ্গল', মোহাম্মদ কবীরের 'মনোহর মালতীর পাঁচালী'

(২) উপদেশ সাহিত্য—জগন্নাথ সেনের 'হিতোপদেশ', হায়াৎ মামুদের 'চিত্ত উত্থান' 'জঙ্গনামা' বা 'মহরম পর্ব', 'হিতজ্ঞানবাণী ও অম্বিয়া বাণী', গৌরহরিদাসের 'চাণক্যশ্লোক'

(৩) বিক্রমাদিত্যের গল্প—অজ্ঞাত কবির 'বেতাল পঁচিশ', শিবরাম ঘোষের 'কালিকামঙ্গল' (দ্বাবিংশ পুত্তলিকা), রামলোচনের 'বিক্রমাদিত্য রাজোপাখ্যান', জগন্নাথের 'সসেমিরা'

(৪) শিশু সাহিত্য—কাশীশ্বর ও কৃষ্ণহরিদাসের 'চোর চক্রবর্তী', কবি-কর্ণের 'ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমীর উপাখ্যান', মদন ঘোষের 'ব্যাঙ্গ কাহিনী', উমানাথের 'মাণিক্যমিত্রের কথা', ফকীর রাম কবিভূষণের 'সখীসোনা'।

(৫) ইতিহাস—গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'

(৬) তীর্থমাহাত্ম্য—বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'

(৭) জ্যোতিষ—অজ্ঞাত লেখকের 'যাত্রানির্ণয়', 'ক্রিয়াসিদ্ধ', 'জ্যোতিষ-বিদ্যা', 'জ্যোতিষতত্ত্ব', মহাদেবের 'স্বরোদয়-ভাষা'

(৮) কামশাস্ত্র—গোপাল দাস ও কয়েকজন অজ্ঞাত লেখক
(৯) ছন্দ—নরহরি চক্রবর্তীর 'ছন্দঃসমুদ্র'
(১০) গণিত—'শুভঙ্কর', ভৃগুরাম, রামনারায়ণ, রামদুলাল, শোভারাম, নন্দরাম, হরেকৃষ্ণ, ধূলদস্তি, কবিভূষণ, কমলাকান্ত, ধনঞ্জয় দাস, ভবানীচরণ, দয়ারাম প্রভৃতির 'আর্যা'
(১১) আইন—বিজয়রাম ও জগদীশ দাসের 'সেহাখত সন্ধান' বা দলিল লিখন পদ্ধতি (১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গদ্যে আইনের বই রচিত ও মুদ্রিত হয়)
(১২) শিক্ষা—দ্বিজ দুর্গারামের 'শিশুজ্ঞানচরিত্র'
(১৩) বাইবেল—পর্তুগীজ পাদরী 'মানোএল দ্য আস্সুম্পসাম'-এর বাংলা গদ্যে রচিত 'কৃপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ' (রোমান অক্ষরে ছাপা বাংলা গ্রন্থ লিসবনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত)

বিঃ দ্রঃ—ইংরেজিতে লেখা হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮ খ্রীঃ) ছাপা বাংলা হরফেব প্রথম ব্যবহার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (ইংরেজ আমল)

(ইংরেজ-প্রভাবপূর্ব প্রাচীন ধারার তালিকা)

পৌরাণিক কাব্য ঃ

চণ্ডী—মুক্তারামের 'কালীপুরাণ', কৃষ্ণকিশোরের 'দুর্গালীলাতরঙ্গিণী', দীনদয়ালের 'দুর্গাভক্তিচিন্তামণি', রামচন্দ্রের 'দুর্গা মঙ্গল' বা 'গৌরী-বিলাস', কালিদাসের 'কালীবিলাস', নন্দকুমার কবিরত্নের 'কালী কৈবল্যদায়িনী', রামরত্ন ন্যায়পঞ্চাননের 'ভগবতী-গীতা', বঙ্গচন্দ্রের 'দুর্গামঙ্গল', রাধাচরণ রক্ষিতের 'চণ্ডিকামঙ্গল', গঙ্গাধরের 'সঙ্গীত-গৌরীশ্বর', জয়নাথ বিশির 'দেবীযুদ্ধ'

রামায়ণ—রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ন', জগৎমোহনের 'রামায়ণ', কমললোচন দত্তের 'রামভক্তিরসামৃত', হরিমোহন গুপ্তের 'অদ্ভুত রামায়ণ', কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ভূষণ ও দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদ্ভুত রামায়ণের গদ্যানুবাদ

কৃষ্ণলীলা—দ্বিজ রামচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, রঘুনন্দনের 'রাধামাধবোদয়', রামকুমারের ভাগবতের পদ্যানুবাদ, উপেন্দ্র মিত্রের 'ভাগবত', জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 'বিল্বমঙ্গলের শ্লোক', মাধব শর্মার 'বিষ্ণুপুরাণ', কৃষ্ণদাসের 'রুক্মীসংবাদ', রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের 'শ্রীকরুণা-নিধান-বিলাস', গোপাল বসুর 'রাধাকালী', শিবরাম দাসের 'প্রভাসখণ্ড', নারায়ণ চট্টোরাজের 'কৃষ্ণলীলারসোদয়', বিশ্বনাথের 'কৃষ্ণকেলিকল্পলতা, দুর্গাপ্রসাদের 'মুক্তালতাবলী', কুশদেবের 'হরিবিলাসসার', জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বারকাবিলাস', মহেশ পালের 'অক্রূরসংবাদ' ইত্যাদি

অন্যান্য পৌরাণিক রচনা—কাশীশ্বরের 'ব্রহ্মোত্তর খণ্ড', রামনন্দনের 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', বৈদ্যনাথের 'শিবপুরাণ', বৈকুণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতার পদ্যানুবাদ', পীতাম্বর সেনের 'ঊষাহরণ', গয়ারামের 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের এবং কেবলকৃষ্ণ ও সীতানাথের 'কাশীখণ্ড', অজ্ঞাত কবির 'পদাঙ্কদূত'-অনুবাদ, গঙ্গাধরের 'মহিম্নস্তব', অজ্ঞাত লেখকের 'শালগ্রাম-নির্ণয় ও তুলসীমাহাত্ম্য' ও রাধামোহন সেনের 'বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণী', ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশের 'হরিভক্তিবিলাস', রাধামাধব ঘোষের 'বৃহৎসারাবলি', দেবানন্দ বর্ধনের 'শিব-মাহাত্ম্য'

জীবনীসাহিত্য :

বৈষ্ণব জীবনী—লালদাসের 'ভক্তমাল', জগন্নাথ দাসের 'ভক্তচরিতামৃত', শ্যামকিশোরের 'জয়দেবচরিত্র', অজ্ঞাত লেখকের 'রঘুনাথলীলামৃত'

যিশুখ্রীষ্টজীবনী—'খ্রীষ্টবিবরণামৃত' (শ্রীরামপুর মিশন), 'নিস্তার-রত্নাকর' (ঐ)

হজরৎ মহম্মদ জীবনী—জৈনুদ্দিন, শেখ চান্দের 'রসুল-বিজয়'

হাসান-হোসেন জীবনী—নসরুল্লা খাঁ, গরীবুল্লার 'জঙ্গনামা', মালী ধর্মদাসের 'হুসেন পর্ব'

মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী :

চণ্ডী—দ্বিজ রঘুনাথের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী'

মনসা—হরগোবিন্দ, মধুসূদন, ছিরাবিনোদ, কালীপ্রসন্ন, জগমোহনের মনসামঙ্গল

লক্ষ্মী—জগমোহনের কমলামঙ্গল, রামচন্দ্রের 'মাধব-মালতী' মহেশচন্দ্রের 'লক্ষ্মীমঙ্গল'

ষষ্ঠী—রামধন চক্রবর্তীর 'ষষ্ঠীমঙ্গল'

অন্যান্য—রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগীর 'গোসানী-মঙ্গল', জগমোহনের 'কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ-পরিধান', আবদুল গফুর, হালু মিঞা, আবদুল রহিমের 'গাজী মঙ্গল', ফৈজুল্লার 'গাজী-বিজয়',

ধর্মীয় গীতিসাহিত্য :

বৈষ্ণব পদাবলী—সংকর্ষণ, পীতাম্বর মিত্র, জন্মেজয় মিত্র, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি

শাক্ত পদাবলী—সাধক কমলাকান্ত, রামানন্দ, ভৃগুরাম, নরচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, কালী মির্জা প্রভৃতি

বাউল পদাবলী—লালন ফকীর, গঙ্গারাম, পদ্মলোচন, কাঙ্গালী, সিরাজ সাঁই, পাঞ্জ শাহ, যাদুবিন্দু, রেজো খ্যাপা, এরফান শাহ, রসীদ প্রভৃতি

অন্যান্য—মারফতি, মুর্শিদা, কর্তাভজা, সঙ্গীত

বৈষ্ণবপদসংগ্রহ—গৌরমোহন দাসের 'পদকল্পলতিকা'

লৌকিক গীতিসাহিত্য :

প্রেম-সঙ্গীত—নিধু বাবুর 'টপ্পা', শ্রীধর কথক, লালচন্দ্র-নন্দলাল

কবি-সঙ্গীত—রাসু-নৃসিংহ, লালু-নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রামবসু, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা প্রভৃতি

যাত্রা সঙ্গীত—লোচনদাস অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম দাস, সুবল দাস, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

নূতন পাঁচালী সঙ্গীত—মধুসূদন কিন্নর, দাশরথি রায়, ঠাকুরদাস দত্ত, রসিকচন্দ্র রায়

লৌকিক গাথাসাহিত্য :

বারমাসী গান—সরূফের 'দামিনীচরিত্র', 'নীলার বারমাসি', 'কমলমালার বারমাসি'

প্রণয় গাথা—খলিলের 'চন্দ্রমুখীর পুথি'

গীতিকা—'মৈমনসিংহগীতিকা', 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'

ঐতিহাসিক গাথা—অনুপম দত্তের 'প্রতাপচন্দ্র লীলা রস সঙ্গীত', মাহুল্লা মণ্ডলের 'কান্তনামা', রানী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত', 'রাজমালা', হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবন-চরিত্র'

লৌকিক আখ্যায়িকা-কাব্য :

হিন্দু—পরাণ চাঁদের 'হরিহর মঙ্গল', কালীপ্রসাদ কবিরাজের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'ভানুমতীর উপাখ্যান', 'চন্দ্রকান্ত', মদনমোহন তর্কালংকারের 'বাসবদত্তা', বৈদ্যনাথ বাগচি ও মধুসূদন দাসের 'কামিনীকুমার'

মুসলমানী—দৌলৎ উজীরের 'লায়লি-মজনু', বদিউদ্দীনের 'ফাতেমার সুরৎনামা', শের বাজের ও শেখ সাদীর 'ফকরর-নামা', গরীবুল্লার ও সৈয়দ হামজার 'আমীর হামজা', গরীবুল্লার 'ইউসুফ-জেলেখা', সাকের মামুদ ও সৈয়দ হামজার 'মনোহর-মধু মালতী', 'জৈগুন-হানিফার কেচ্ছা', 'হাতেম তাই', মহম্মদ মীরনের 'বাহার দানেশ', এরদৎ উল্লার 'গোলে বকাওলি', মোহাম্মদ দানেশ-এর 'চাহার দরবেশ' ও 'গুল সনৌবার', সেরাদোতুল্লার 'কুরঙ্গভানু', দাএমল্লার 'গোলে দেও গান্দার পুঁথি', ফকীর উদ্দীনের 'সোনাভান-কেচ্ছা'

(অনুবাদ)—উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের 'গোলেবকাঅলি ইতিহাস', অজ্ঞাত লেখকের 'তুতিনামা', গোবর্ধনদাসের 'হাতেম তাই', হরিমোহন কর্মকারের 'ইউসুফ জেলেখা', মহেশচন্দ্র মিত্রের 'লয়লা মজনু' ও হরিমোহন কর্মকারের 'ক্যোমার জিলম্যানের মনোহর উপাখ্যান'

দ্বিতীয় অধ্যায়

চর্যাপদ

'চর্যা'পদই বাংলা কবিতার আদিরূপ। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতেছে বাংলা ভাষার জন্মকাল এবং দ্বাদশ শতকে হইয়াছে চর্যারূপে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। জন্মকালে বাংলা কবিতাকে 'পরভৃতিকা' বা পরভাষায় লালিত বলা চলে। বাংলা ভাষার বিমাতৃ-স্বরূপ শৌরসেনী প্রাকৃতের অপভ্রংশ বা 'অবহট্‌ঠ' ভাষার শব্দের আশ্রয়ে বাংলা সাহিত্যের আদি কবিতাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পরভাষার সাহায্য গ্রহণের কারণ ছিল। 'অবহট্‌ঠ' ছিল সংস্কৃত ভাষার পরেই সমগ্র আর্যাবর্তের সাহিত্য-ভাষা। প্রাদেশিক অপভ্রংশ-সাহিত্য রচনা করিতে হইলে অবহট্‌ঠ ভাষার আশ্রয়ই প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। তদানীন্তন প্রথা অনুসারে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী আচার্যেরা বাংলা শব্দের সহিত অবহট্‌ঠ শব্দ মিশাইয়া চর্যাপদ রচনা করেন। তাই বলিয়া চর্যা অবহট্‌ঠ-সাহিত্য নহে। চর্যাপদের বাগ্‌বৈশিষ্ট্য ও প্রবাদ সম্পূর্ণরূপে বঙ্গীয় এবং চর্যার শব্দরূপে ও ধাতুরূপে বাংলা ভাষারই বিশিষ্ট বিভক্তি বর্তমান আছে। কয়েকটি অবহট্‌ঠ শব্দ দেখিয়াই চর্যাপদের বঙ্গীয়তায় সন্দেহ করা চলে না।

পদ-সাহিত্যের জন্ম ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তকর ঘটনা। চর্যাপদের মধ্যেই প্রথম সত্যকার গীতিকবিতার প্রকাশ। চর্যা-পূর্ব যুগে গীতি-কবিতা অর্থে সুর-সংযোগে গেয় কবিতা বুঝা হইত, কবিতার নিজের দিক দিয়া সঙ্গীতগুণ-বিশিষ্ট হইবার প্রয়োজন ছিল না; গদ্যধর্মী বর্ণনাত্মক যে কোন রচনা লঘু ও ক্ষুদ্রাকার হইলেই তাহাতে সুরসংযোগ চলিত এবং তাহাকে বলা হইত গান বা গীতিকবিতা। কালিদাসের নাটকে গানগুলি দেখিলেই এ-কথা স্পষ্ট হইবে। শকুন্তলা নাটকে আর্যাছন্দে রচিত গ্রীষ্ম-বর্ণনায় সুরভি বনবায়ু ও দিবানিদ্রার পরিচয়[1] অথবা কর্ণাভরণের জন্য প্রমদাগণের কুসুমচয়ন

---

১ সুভগ সলিলাবগাহাঃ পাটল সংসর্গ সুরভি বনবাতাঃ।
প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ॥

বৃত্তান্ত[১] উৎকৃষ্ট গীতিকবিতারূপে সেকালে গৃহীত হইয়াছে। রচনার অর্থ ভাব ও শব্দঝঙ্কারের সামগ্রিক সঙ্গতি ও একমুখিতা সে যুগে গীতিধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সংস্কৃত যুগে কবিতা মাত্রেই ছিল মিলশূন্য। অপভ্রংশ-যুগে গানে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল ও শব্দঝঙ্কার প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাব গদ্যতা যায় নাই, চতুষ্পদী শ্লোকত্ব হইতেও মুক্তি হয় নাই। "গৃহিণী কলাপাতায় পরিবেশন করিতেছেন ডালমিশানো ওগরা চাউলের ভাত, ময়না মাছ, নালিতা শাকের তরকারি ও তৎসহ একটু গাওয়া ঘি আর দুধ, পুণ্যবান ব্যক্তি উদরস্থ করুন"[২]—ইহাই হইতেছে অপভ্রংশ যুগের গীতিকবিতার নমুনা। প্রাণবত্তা বা চিন্তা ও ভাবেব গতিশীলতা হইতেছে গীতিকবিতার বহির্লক্ষণ এবং বর্ণনীয় বস্তুবিষয়ে কবিচিত্তের তন্ময়তা ও গভীর উপলব্ধি হইতেছে উহার অন্তর্লক্ষণ। এই উভয় লক্ষণের একত্র প্রকাশ সর্বপ্রথম চর্যাপদে। চর্যাপদের পরে বাঙ্গালী কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দে' এই প্রকার গীতি-কবিতা সৃষ্টির চেষ্টা করিযাছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত দ্বিতীয় কারণেব অভাবে তাহা চর্যাপদের মতো পূর্ণতা লাভ কবে নাই।

চর্যাপদাবলী বাংলার ধর্মগত গোষ্ঠীসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। বৌদ্ধ সমাজের সংঘগত ধর্মসাধনার জন্যই ইহাদেব উৎপত্তি। পূর্বযুগে সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য সঙ্গীতের আবশ্যকতা হয় নাই, আবশ্যক হইয়াছিল দর্শন-গ্রন্থের ও তাহার ভাষ্যের। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে নূতন সংঘ সৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশ পরিবর্তনে প্রচার পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটিল। সাধকেবা দূরে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে না থাকিয়া স্থানে স্থানে কেন্দ্রীভূত হইল। সমবেত সভ্যসংঘের মধ্যে সেইজন্য যুক্তিমূলক তত্ত্বপ্রচাবের প্রয়োজন রহিল না, প্রয়োজন হইল হৃদয়াবেগ ও ভাবসৃষ্টির। সাধনভাব উদ্দীপনের জন্য প্রয়োজন হইল সঙ্গীতের। সেই প্রয়োজন মিটাইতেই চর্যাপদের উৎপত্তি। সাধনাসংঘের নাম চক্র, সেইজন্য চর্যাপদ হইতেছে চক্র-সঙ্গীত। এই চক্র-সঙ্গীত

১ ঈসীসি চুম্বআইং ভমরেহিং সুউঁমার কেসর সিহাইং।
ওদংসয়ন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীস কুসুমাইং॥

২ ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা ণালিচ গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা॥

পরে বৈষ্ণব রস-কীর্তনের পদাবলী ও সহজিয়া পদাবলী হইয়া দেখা দিয়াছিল। বর্তমানেও কর্তাভজা, বাউল, এমন কি ব্রাহ্মসমাজেও এইরূপ চক্র-সঙ্গীত দেখা যায়।

চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য ইহার অর্থের গোপনীয়তা। এইখানে চর্যা বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য পদাবলী হইতে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ আছে। বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি পদাবলী ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসংস্কারেরই অনুগামী, কিন্তু বৌদ্ধ চর্যাপদ ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ-বিরোধী। চর্যাপদের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা হিন্দুদের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি ব্যঙ্গ করিতে ও হিন্দু আচারকে ঘৃণা করিতে দ্বিধা করেন নাই। "হোমের ধূমে চক্ষু পীড়াই সার"[১] অথবা "দেবপূজা করিও না, তীর্থে যাইও না, দেবপূজায় মোক্ষ পাইবে না"[২] প্রভৃতি বাক্য দ্রষ্টব্য। হিন্দু-সংস্কারের প্রতি তাঁহাদের আঘাতও অল্প নহে। হিন্দুর পরম পূজনীয় ত্রিদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে যথাক্রমে বিষ্ঠানাড়ী, মূত্রনাড়ী ও শুক্রনাড়ীরূপে প্রচার করা চর্যাকারদিগের হিন্দুবিদ্বেষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৩] কাজেই স্ব-সম্প্রদায়ের বাহিরে চর্যার প্রচার নিরাপদ নহে, এইজন্য চর্যা রহস্যাবৃত। চর্যাপদের অর্থকে নিগূঢ় রাখার অপর কারণ হইতেছে—চর্যায় ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি প্রতীকের বাহ্য অর্থ ভদ্রতা ও শালীনতার বিরোধী। অধ্যাত্ম সাধনার অতীন্দ্রিয় আনন্দকে চর্যা কবিরা শারীর যৌন-বিলাসের চিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন। চর্যায় বহুল-ব্যবহৃত বজ্র ও পদ্ম নরনারীর জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক —এই অভব্য ও অশোভন প্রতীক ঈশ্বর-জীব-মিলনে বা মোক্ষলাভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চর্যার ভাষা সুস্পষ্ট হইলে গোষ্ঠীবহির্ভূত ও স্থূল-অর্থ-প্রিয় সাধারণের কাছে বহু পদ অশ্লীল 'নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড' বলিয়া ঘৃণিত হইবার আশঙ্কা ছিল। কাজেই চর্যাকারগণ ইচ্ছা করিয়াই চর্যার মধ্যে মধ্যে এমন ভাবে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে কেবল গোষ্ঠীগত প্রতীকজ্ঞ লোকেরাই বুঝিতে পারে। প্রাচীন টীকাকার মুনিদত্তের সংস্কৃতে রচিত চর্যাভাষ্য

১ "অকৃখি ডহাবিঅ কড়ুএ ধূমেমিতি"—ভূমিকা "বৌদ্ধ গান ও দোহা"

২ দেব মা পূজহ তিত্থ ন জাবা।
দেব পূজাহি মোকখ ন পাবা॥—তীলপার দোহা পৃঃ ১২৮ চর্যাগীতি পদাবলী

৩ ভূমিকা পৃঃ ২৪ চর্যাগীতি পদাবলী (সুকুমার সেন সম্পাদিত)

না থাকিলে এ-যুগে চর্যাপদের অর্থগত রহস্য ভেদ করা মোটেই সম্ভব হইত না। তুরীয়ের অর্থ কুম্ভক সমাধি, শাশুড়ি শ্বাস-ক্রিয়া, সোনা শূন্যতা, রূপা রূপানুভূতি, ব্যাং অবয়বহীনতা, ইঁদুর ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য এবং অ-কার ক-কার প্রশ্বাস নিঃশ্বাস—এ-কথা মুনিদত্তই টীকার মধ্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই প্রকার প্রতীক ও ইঙ্গিতগুলি যেমন একদিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির কাছে বাধাদায়ক ও বিরক্তিকর তেমনি অপরদিকে কাব্য-রসিকের কাছে উপাদেয় ও কৌতুকোদ্দীপক। অনেকগুলি প্রতীক সত্যকার কবিকল্পনা-সঞ্জাত এবং নিরাকার চিন্তার সাকার রূপ।

চর্যায় মনন-জগতের সূক্ষ্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য অরূপতত্ত্ব চর্যাকারগণের কল্পনার বলে স্থূল রূপজগতের সামগ্রী হইয়া দেখা দিয়াছে এবং নানা চিত্রে মূর্তিধারণ করিয়াছে। বিবাহ-ক্রিয়া, সাঁকো নির্মাণ, গুণ টানিয়া নৌকা বাওয়া, তুলা ধোনা, কাপড় বোনা, হরিণ-শিকার, মগদস্যুর লুণ্ঠন প্রভৃতি স্থূল চিত্র রচনার মাধ্যমে চর্যাকারদিগের সূক্ষ্ম সাধন-প্রক্রিয়া বুঝাইবার চেষ্টা দেখা যায়। এই সকল চিত্র রচনার উদ্দেশ্য যে লৌকিক নহে, অলৌকিক, তাহা বুঝাইবার জন্য কবিগণ সুকৌশলে এই চিত্রগুলিকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য করিয়াছেন। তাই বলিয়া সবগুলিই যে বাস্তবিক দুর্বোধ্য তাহাও নহে। যথা—

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। (চ'২)

(কচ্ছপের দুধ[1] দুহিয়া হাঁড়িতে ধরে না।)

সুনা পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে। (চ'১৫)

(শূন্য প্রান্তরের সীমা দেখা যায় না, যাইতে ভুল করিস না।)

দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায় ? (চ'৩৩)

(দোহা দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে ?)

বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে (চ'৩৩)

(বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা।)

—এগুলির তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত হইতে পারে, কিন্তু অর্থ বুদ্ধিগ্রাহ্য ; কোনোটিই অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য নহে। এখানে বলা হইতেছে—নির্বাণ বা পারমার্থিক সত্য অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অতীত হইলেও অসম্ভব বা অপ্রাপ্য বস্তু নহে, সাধনবলে ইহা করায়ত্ত হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি এই বক্তব্যেরই কাব্যরূপ।

---

১ কচ্ছপের ডিমই হয়, দুধ হয় না ; কচ্ছপের দুধ অসম্ভব বস্তু।

চর্যাপদাবলীর অবলম্বিত বিষয় মোটেই কাব্যোচিত প্রসঙ্গ নহে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সাধনতত্ত্বই ইহাদের বর্ণনীয় বিষয়। চর্যার প্রাচীন টীকাকার মুনিদত্ত ইহার উদ্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার টীকার সাহায্যে দেখা যায়—চর্যামতে ব্রহ্ম বলিয়া কোন বস্তু নাই, ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব নাই। জগতের সর্ববিধ বস্তুই মিথ্যা, অনিত্য ও জীবের চিত্ত-বিকারের ফল। একমাত্র শূন্যতাই সত্য বস্তু, এই শূন্যতাই জীবনের কাম্য। শূন্যতার মধ্যেই জীবনের সর্ববিধ সুখ-দুঃখের লোপ এবং মহাসুখ প্রাপ্তি। ইহাই অদ্বয় ও সহজ অবস্থা। এই সহজাবস্থা বর্ণাশ্রমধর্মের শাস্ত্রীয় আচরণে প্রাপ্য নহে, ইহার জন্য ধ্যানধারণা, ঈশ্বরভক্তি, ইন্দ্রিয়সংযম বা যোগসমাধির প্রয়োজন নাই, একমাত্র প্রয়োজন শক্তিশালী সদ্‌গুরুর উপদেশ। গুরুর উপদেশে শূন্যতাবোধে চিত্ত স্থির হইলে সর্ববিধ কামনা-বাসনার নাশ হইবে ও অদ্বয় জ্ঞানের বিকাশ হইবে। তখনই সহজাবস্থা প্রাপ্তি। ইহাই মহাসুখময় নির্বাণ। নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে গুরুরও আর প্রয়োজন থাকে না।

চর্যার বিষয়বস্তু যাহাই হউক, চর্যার উদ্দেশ্য কিন্তু তাত্ত্বিক নহে, সাহিত্যিক। চর্যাকারদিগের দৃষ্টি দার্শনিক দৃষ্টি নহে, কবি-দৃষ্টি। চর্যার বিষয় সহজিয়া তত্ত্ব হইলেও এই তত্ত্বের মূল বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া বিশ্বাসের স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। চর্যার তত্ত্বে থিয়োরির সংশয়িত রূপ দেখা যায় না, সত্যের দৃঢ়তাই আসিয়া গিয়াছে, যুক্তিতর্ক বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই, সমস্তই স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে কেবল কবিদৃষ্টির ফলে। চর্যার ভাষাও শাস্ত্র-ভাষা নহে, কবি-ভাষা মাত্র,—উপভোগধর্মী বক্রোক্তি, বাগ্‌বাহুল্য ও সরসতা শাস্ত্রীয় স্পষ্টভাষণের রীতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে চর্যাভাষার বিন্যাস গদ্যধর্মী নহে, কাব্যধর্মী—

বাহ তু ডোম্বী, বাহ লো ডোম্বী; বাট ভইল উছারা (চ·১৪)

(ওগো ডোম যুবতি, তুমি নৌকা বাহগো—বাহিয়া চলো, পথে বেলা হইল যে!)

তঁহি তোলি শবরো, ডাহ কএলা, কান্দই সগুণ শিয়ালি (চ·৫০)

(তাহাতে তুলিয়া শবরকে দাহ করা হইল, কাঁদিল শুধু শকুনি শৃগালী!)

কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবি ধোকে ন ভমরা ॥ (চ' পরিশিষ্ট ২)
(কমল ফুটিল, শামুক জানে না, কিন্তু ভ্রমর ঠকে না মধুপান করিতে।)
নানা তরুবর মৌউলিলরে গঅনত লাগেলি ডালী। (চ'২৮)
(নানা তরুবর মুকুলিল রে গগনে লাগিল ডাল।)

—এইগুলির রচনায় যুক্তির বিন্যাস নাই, আছে ভাবের বিন্যাস। প্রয়োজন-মূলক ও চিন্তামূলক ভাষা ইহা নহে। ভঙ্গীর দিক দিয়া ইহাতে প্রশান্ত মনন-ভঙ্গী নাই, আছে উদ্বেল আবেগ ও হৃদয় চাঞ্চল্য। বলা বাহুল্য, এইগুলি কবি-ধর্ম।

চর্যাকারগণের সৌন্দর্যমুগ্ধতা ও বিলাস ইহাদের কবিমনের অন্যতম লক্ষণ। সৌন্দর্যপ্রিয়তার জন্যই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রথাগত পথের অনুসরণে ইহাদিগের কল্পনা ধাবিত হয় নাই। পুরাতন উপমা ও রূপকের মধ্যে শক্তিশালী কবি মাত্রেই একটা নির্জীব অসাড়তা অনুভব করেন; চর্যাকবিরাও সেইজন্য নবলব্ধ অনুভূতি প্রকাশ করিতে নূতন নূতন চিত্রকল্পনা ও রূপরচনা করিয়াছেন। জ্ঞানকে জ্যোৎস্না (চ'৫০), কায়াকে নৌকা (চ'৩৮), বিশেষতঃ করুণাকে ডমরু-ধ্বনি (চ'২১) কল্পনা করা পুরাতন ব্যাপার নহে, ইহা চর্যাকারদিগের মৌলিক কল্পনাশক্তির প্রকাশক। এই সকল চিত্র কল্পনায় বর্ণনীয় বস্তুতে নূতনতর লালিত্য ও সৌন্দর্য ব্যঞ্জিত করিয়া চর্যাকারেরা প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে চর্যা কবিদের কবিত্ব ও সৌন্দর্য-সৃষ্টি দ্রষ্টব্য—

তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ (চ'৬)
(উল্লম্ফনে তরঙ্গরেখায় চলিয়াছে হরিণ, তাহার খুর যায় না দেখা।)

ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ (চ'৫)
(ভবনদী গহন, গম্ভীর বেগ বাহিনী, তাহার দুই অন্তে পাঁক, মধ্যে অথই জল।)

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুয়াল।
সদ্গুরু বঅণে ধর পতবাল ॥ (চ'৩৮)
(কায়া তোমার নৌকা, খাঁটি মন বৈঠা, সদ্গুরুর বচনকে পালরূপে ধর।)

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দৃষ্টান্তগুলিতে সৌন্দর্যগুণে উপমানই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, উপমেয় হইয়া পড়িয়াছে গৌণ। ইহা কবিত্বেরই লক্ষণ।

চর্যাকবি কৃষ্ণাচার্য কবিজনোচিত মনোবিলাস দেখাইয়াছেন নিজেকে মত্তমাতঙ্গ ও নৈরাত্মা বা নৈরামণিকে করিণী কল্পনা করিয়া। কবি ভুসুকু অধিকতর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন নৈরামণির হরিণীরূপ কল্পনা করিয়া। নৈরামণি সম্বন্ধে চর্যাকবিদের মনোবিলাস চরমে উঠিয়াছে। নৈরামণি আসলে হইতেছে নির্বাণের আনন্দ, ইহা অরূপ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বমাত্র। কিন্তু এই তত্ত্বকে চর্যাকবিরা দেখিয়াছেন সুন্দরী যুবতী নৈরামণিরূপে। ইনি দেবী হইলেও সাধকের প্রেয়সী ; ইনিই হইয়া উঠিয়াছেন চর্যাপদাবলীর নায়িকা। সাধকের নির্বাণের আনন্দ হইতেছে এই দেবীর সহিত যৌন-মিলন। এই মিলন বর্ণনায় চর্যাকবিগণ এমনই প্রমত্ত ও মুখর হইয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহাদের সাধকরূপ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রকাশিত হইয়াছে রসবিলাসী কবি-রূপ। তত্ত্বের দিক দিয়া বাস্তব জগৎ যাঁহাদের কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাঁহাদের চিত্ত রসভোগের দিক দিয়া কাল্পনিক বিলাস-জগতের সৃষ্টিতে হইয়া উঠিয়াছে মদির-বিহ্বল—

তিঅড়া চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী ॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমল মধু পীবমি ॥ (চ'৪)

[ইহার প্রথম দুই চরণের অর্থ শ্লীলতাবর্জিত]

রঙীন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন বলিয়াই চর্যাকবির কাছে নৈরামণি হইয়াছেন ছলনাময়ী বিলাসিনী ('ভাভরিআলী'—চ'১৪), কখনও স্বৈরিণী ('ছিনালী' চ'১৮), কখনও বা রহস্যময়ী অভিনেত্রী। শবরপাদের চর্যায় (চ'২৮) দেখা যায়—ইনি মাথায় ময়ূরপাখা, গলায় গুঞ্জামালা, কানে কুণ্ডল পরিয়া পরস্ত্রীর ছদ্মবেশে সাধকের সঙ্গে মিলিত হন, পরস্ত্রীবেশে গোপনে তাহাকে পরকীয় রসসম্ভোগ করান, শেষে পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে যে ইনিই সাধকের নিজের গৃহিণী 'সহজ সুন্দরী'। ইহার ছলনার আর একটি প্রমাণ—ইনি দিবসে তুচ্ছ কাকের ভয়েই ভীতি-বিহ্বলা এবং রাত্রে দুঃসাহসিকা কামরূপগামিনী।[১]

---

১ দিবসই বহুড়ী কাঅই ডরে ভাই।
রাতি ভইলে কামরু যাই ॥ (চ'২)
(দিবসে বউ কাকের ভয়ে সারা, রাত্রিতে কিন্তু কামরূপ যায়)

খুবই সন্দেহ হয়—চর্যাগীতির সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈরামণির নাগরীবৃত্তির সমাপ্তি ঘটে নাই, ইনি যুগে যুগে নানারূপের ছদ্মবেশে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়াছেন। সহজ রস-সাধনার সূত্রে ইনিই খুব সম্ভব বৈষ্ণবকাব্যে রাধারূপে[১] এবং রবীন্দ্রকাব্যে 'মানস-সুন্দরী' বা 'জীবন-দেবতা'রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া চর্যায় অসমাপ্ত ও অতৃপ্ত যৌবনলীলার চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি খুঁজিয়াছেন।

চর্যার ভাষা কবি-ভাষা ও চর্যার দৃষ্টিভঙ্গী কবিজনোচিত হইলেও চর্যাপদ উৎকৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কাব্যরূপের প্রধান বাধা আসিয়াছে ধর্মের দিক হইতে। চর্যাকারেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—নৈরাত্মা দেবীকে ইন্দ্রিয়জগতের রূপলোকে যদি তাঁহারা ধরিয়া রাখেন, তাহা হইলে কাব্যসাধনা হইলেও ধর্ম-সাধনা হইবে না, সহজিয়া শূন্যবাদ থাকিবে না, গোষ্ঠীসাহিত্য জনসাহিত্যে পরিণত হইবে। কাজেই চর্যাকবিরা নৈরামণিকে পূর্ণভাবে অঙ্কন করেন নাই, অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছেন; ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে নানা পারিভাষিক তত্ত্বের বোঝা চাপাইয়া চর্যাগীতিকে করিয়া তুলিয়াছেন—যৌবনে জরতী। তাহা না হইয়াছে কাব্য, না হইয়াছে সাধনতত্ত্ব। চর্যায় সমস্তই অসমাপ্ত, চিত্র, প্রসাধনকলা, তত্ত্বকথা, সমস্তই অপরিস্ফুট। তাহাতে উন্মেষ আছে, পরিণতি নাই, কবিশক্তি আছে, কাব্য নাই; সাধনা আছে, সিদ্ধি নাই। সুবৃহৎ শক্তির হইয়াছে বিরাট অপচয়। এইজন্যই চর্যাপদ বঙ্গসাহিত্যের একটি দুর্বোধ্য রহস্যগ্রন্থরূপে উপেক্ষার বস্তু হইয়া জাদুঘরের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গীতের দিক হইতে বিচারে ইহার গীতিরূপের প্রধান অন্তরায় পরভাষার দাসত্ব। চর্যায় পরভাষা অবহট্‌ঠের শব্দসমূহের মধ্যে বাংলাকে আড়ষ্টভাবে চলিতে হইয়াছে। তাহার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশে প্রচলিত চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিদেশী শৃঙ্খলের মধ্যে তাহার প্রাণচাঞ্চল্য ও লাস্যের সহজ

---

১ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদর চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন…এই তত্ত্বের মধ্যে তান্ত্রিক মহাযান মতের যুগনদ্ধ হেরুক-নৈরাত্মা সাধনার জের অবশ্যই আসিয়াছে"—পৃঃ ৩০১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ)

সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। চর্যাকবিরা বিদেশী অবহট্‌ঠ ভাষায় বাংলার জাতীয় লঘু ত্রিপদী ছন্দ চালাইতে পারেন নাই; কাজেই তাহাতে নবীনতার স্ফূর্তি জাগে নাই, বাংলাকে পুরাতন মামুলী অপভ্রংশের ছন্দে ও ভাষায় বিদেশিনীর পোষাকে বিদেশী নাচের অভিনয় করিতে হইয়াছে। এই অস্বাভাবিকতা ও আড়ষ্টতার জন্য এবং বিষয়বস্তুর দুর্বোধ্য তত্ত্বের বোঝায় ও সাঙ্গীতিক লঘুতার অভাবে চর্যাপদকে বাঙ্গালী পাঠক হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ সেইজন্য চর্যাগীতিকে স্বদেশ ছাড়িয়া নেপালে তিব্বতে প্রবাসিনী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চেষ্টায় ইদানীন্তনকালে ইহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। (অবশ্য রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ঘটনাও চর্যার অজ্ঞাতবাসের কারণ হইতে পারে।)

কবিত্ব বিচারে না হউক, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদ আমাদের অমূল্য সম্পদ ও গৌরবের বস্তু—একথা অবশ্য স্বীকার্য। চর্যাকবির কবিত্ব অর্ধ-প্রকাশিত ও দুর্বল বটে কিন্তু নিষ্ফল নহে। চর্যাকবিগণ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রাণের বীজ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পরবর্তী বৈষ্ণব পরকীয়া রসতত্ত্ব, রাগাত্মিক পদাবলী ও বাউল গান অঙ্কুরিত হইয়াছে। নৈরামণির পরিকল্পনা বাদ দিলেও চর্যাকবির কল্পনাজাত রূপকল্প (imagery) বাঙ্গালী ভুলিতে পারে নাই। পরবর্তী যুগের সঙ্গীতে মনহরিণ, কায়ানৌকা, মনমাঝি প্রভৃতি রূপকল্প চর্যাকবির কল্পনার অমরতা প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে যখন বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা আক্ষেপ করে—

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিলা নারী।
আপনার মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী॥ (দান খণ্ড, কৃষ্ণকীর্তন)

কিংবা যখন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে পশুগণ খেদ করে—

কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপ বংশে।
হরিণ জগত বৈরী আপনার মাংসে॥

তখন তাহাদের মধ্য হইতে চর্যাকবি ভুসুকুর কণ্ঠই শুনিতে পাওয়া যায়—

আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। (চ'৬)

বাংলা প্রবাদ বাক্য "দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো," ইহার মূল সম্ভবতঃ—

বর শূন গোহালী কি দুঠ বলন্দে (চ'৩৯)

নিম্নের চর্যাচরণগুলি ভাষণের সংক্ষিপ্ততায় অর্থের ব্যঞ্জনায় ও ভাবের প্রগাঢ়তায় চিরন্তনী সুভাষিত উক্তি বা প্রবচনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে—

হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ (চ'৩২)
(হাতেই কঙ্কণ আছে, দর্পণ লইও না।)

ভাঙ্গ তরঙ্গ কি সোষই সাগর ? (চ'৪২)
(ভঙ্গ তরঙ্গ কি সাগর শোষণ করে ?)

নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক (চ'৩২)
(বুদ্ধত্ব নিকটেই আছে, লঙ্কাতে যাইও না।)

দুধ মাঝে লড চ্ছন্তে ন দেখই (চ'৪২)
(দুধের মধ্যে না দেখা গেলেও মাখন আছে।)

উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা (চ'২৯)
(জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ সত্য নয়, কিন্তু মিথ্যাও নয়।)

নেপথ্য-বার্তা

চর্যা-তথ্য

চর্যাপদের আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি নেপাল দরবার হইতে তিনটি অপভ্রংশ দোহার পুথির সহিত চর্যাপদের পুথি উদ্ধার করেন। পণ্ডিতগণ এই পুথিটি পরীক্ষা করিয়া চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে অনুলিখিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। সাধারণতঃ পুথির আদিতে ও অন্তে গ্রন্থের নাম লিখিত থাকে। কিন্তু চর্যার পুথি আদ্যন্ত খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়, কাজেই গ্রন্থের নাম জানা যায় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এই সঙ্গে চর্যাপদের একটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত টীকাও পাইয়াছিলেন। টীকায় টীকাকারের নাম পাওয়া যায় নাই, পরে জানা গিয়াছে টীকাকার চতুর্দশ শতকের ব্যক্তি, নাম—মুনিদত্ত। শাস্ত্রী মহাশয় মনে করিয়াছিলেন চর্যা ও অন্য তিনটি পুথির ভাষা পুরানো বাংলা, তাই পদগুলিকে টীকার সহিত একত্র করিয়া বাংলা

১৩২৩ সালে তিনি সাহিত্য পরিষদ হইতে 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে খাঁটি বাংলা শব্দের পরিবর্তে অপভ্রংশ 'অবহট্‌ঠ' শব্দের আধিক্য দেখিয়া অনেকেই গ্রন্থগুলির ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিচার করিয়া প্রমাণ করেন যে—'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের' ভাষা মূলতঃ খাঁটি বাংলাই বটে, অন্যগুলির ভাষা অপভ্রংশ মাত্র। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি শাস্ত্রি-প্রদত্ত। মুনিদত্তের টীকায় এক জায়গায় 'আশ্চর্যচর্যাচয়' শব্দটি থাকায় শাস্ত্রী মহাশয় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি গঠন করিয়াছিলেন। এইজন্যই কেহ কেহ মনে করেন, নামটি সঙ্গত হয় নাই, মুনিদত্ত-ব্যবহৃত 'আশ্চর্যচর্যাচয়' শব্দটিই গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের মতে শুদ্ধ নাম হইবে 'চযাশ্চর্য বিনিশ্চয়'।[১]

পুরা সংখ্যক চর্যাপদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের খণ্ডিত পুঁথিতে সাড়ে ছচল্লিশটি পদ ছিল। তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের একটি তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থের সাড়ে ছচল্লিশটি পদ ছাড়াও আরও তিনটি পূর্ণ পদ এবং অপূর্ণ পদটির অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। সুতরাং এ পর্যন্ত মোট পঞ্চাশটি পদ পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া মুনিদত্তের টীকা হইতে জা-া যায়, লাড়ীডোম্বী পাদ নামক সিদ্ধাচার্যের একটি পদ ছিল, সেটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয়—চর্যাগ্রন্থ মূলে একান্নটি পদের সংগ্রহ-গ্রন্থ রূপেই র‍চিত হইয়াছিল।

চর্যার পুঁথিটি ষোড়শ শতকের হইতে পারে, কিন্তু চর্যাগুলি প্রাচীন। ডাঃ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন—চর্যার অন্যতম কবি লুইপাদ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দের ব্যক্তি। কিন্তু শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী দশম হইতে দ্বাদশ শতককেই চর্যা কবিদের কাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের মতে "ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব কালের নিম্নতম সীমা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দ, কেননা ঐ শতাব্দের প্রথম ভাগে রচিত মৈথিল পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে চৌরাশী সিদ্ধের তালিকায়

১ পৃঃ ৫৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ)

বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্যদের অনেকেরই নাম পাইতেছি। ঊর্ধ্বতম সীমা হইতেছে একাদশ শতাব্দ।"[১]

চর্যাপদগুলি মোট চব্বিশ জন কবির রচনা—লুই, কুক্কুরী, বিরূপ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্নু, কাম্বলি, ডোম্বী, লাড়ীডোম্বী, শান্তি, মহিণ্ডা, বীণা, সরহ, তন্ত্রী, শবর, আর্যদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, কঙ্কণ, জয়নন্দী, তাড়ক ও ধাম। এই নামের মধ্যে কুক্কুরী, বীণা, তন্ত্রী, তাড়ক ও কঙ্কণ ছদ্মনাম হইতে পারে।

কবি হিসাবে কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপাদই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহার ভণিতায় অন্ততঃ বারোটি চর্যা পাওয়া গিয়াছে। ইনি প্রধানতঃ প্রেমের কবি। সাহিত্যে বহুবচনবাদী সুকুমার সেন মনে করেন—"সিদ্ধাচার্যের মধ্যে একাধিক কাহ্নুপাদ ছিলেন।"[২] চর্যার কাহ্নুপাদকেই কেহ কেহ নাথ-পন্থী ময়নামতীর গানের কানফা-যোগী বলিয়া মনে করেন।

পদসংখ্যার দিক দিয়া দ্বিতীয় হইতেছেন কবি ভুসুকু; ইনি আটটি পদ লিখিয়াছেন। ভুসুকু চিত্রধর্মী কবি। ইহার একটি চর্যায় • জলদস্যুদের পদ্মানদীতে লুণ্ঠন-চিত্র দেখা যায়, তাছাড়া ইহার দুইটি পদে মৃগয়াচিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে।

সরহ নামেও নাকি একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। সরহের ভণিতায় দোহাকোষের দোহা এবং চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে চারিটি চর্যা দেখা যায়। সরহের রচনায় তাত্ত্বিকতা ও রসিকতার সংমিশ্রণ দেখা যায়। আদি সরহ প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যদিগের অন্যতম, ইনি একাদশ শতকের পূর্বেই ছিলেন।

কুক্কুরীপাদের চর্যা-সংখ্যা তিন। সুকুমার বাবু মনে করেন, এগুলি কুক্কুরী-পাদের কোনো শিষ্যের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের রচনা। নিজের লেখা হইলে চর্যার ভণিতায় গৌরবসূচক 'পা' শব্দ থাকিত না এবং পুরুষের লেখা হইলে এতখানি গ্রাম্য ও ইতর হইত না।

চর্যাকবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি লুইপাদ। ইহার রচিত দুইটি চর্যা দেখা যায়, তন্মধ্যে একটি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের প্রথম কবিতা। প্রবোধচন্দ্র

১ পৃঃ ৫৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ)

২ পৃঃ ৬৬ ঐ

বাগ্‌চী এই লুইপাদকে নাথ-গুরু মীননাথ মনে করিয়াছেন, কিন্তু টীকাকার মুনিদত্ত লুইপাদ ও মীননাথকে দুই বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

লুইপাদ ভিন্ন শান্তিপাদ ও শবরপাদ দুইজনে দুইটি করিয়া চর্যা লিখিয়াছেন, অবশিষ্ট ষোল জন কবি একটি করিয়া পদ লিখিয়াছেন এবং লাড়ী-ডোম্বীর পদ বাদ গিয়াছে।

চর্যাপদের অর্থোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মনীন্দ্রমোহন বসু ও সুকুমার সেন। মণীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদিত 'চর্যাপদ' ও সুকুমার সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'চর্যাগীতিকা' চর্যা সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ। মণীন্দ্রমোহন বসু মুনিদত্তের টীকা অবলম্বন করিয়া ও সুকুমার সেন তিব্বতীয় অনুবাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক তুলনামূলক বিচার অবলম্বন করিয়া চর্যাপদের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক অর্থ নির্ণয় মণীন্দ্রমোহনের এবং লৌকিক অর্থ নির্ধারণ সুকুমার সেনের বৈশিষ্ট্য। চর্যার ধর্মতত্ত্ব সামাজিক ও অন্যান্য দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন মণীন্দ্রমোহন বসু ও ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বতে প্রাপ্ত একটি তালপাতার পুথি হইতে বিনয়শ্রী, সরুহ ও অবধূ এই তিন নূতন কবির রচিত কয়েকটি চর্যা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এইগুলি অর্বাচীন রচনা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

সাহিত্য সামাজিক মনোবৃত্তিসঞ্জাত এবং সেইজন্য মিলনধর্মী। স্থান কাল ও জাতিত্বের বাধা থাকিলেও সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক। বঙ্গসাহিত্য জন্মকালে যদিও পল্লীসাহিত্যরূপে স্বাতন্ত্র্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল তথাপি বেশীদিন নাগরিক সভা-সাহিত্যকে অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে নাই। সৌন্দর্যের জগতে জাতিভেদ নাই, প্রকৃত কবি কখনও সৌন্দর্যকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বঙ্গভাষার প্রাচীন লেখকেরা চর্যাপদের ন্যায় ধর্মসঙ্গীত রচনা করিলেও তাত্ত্বিক ছিলেন না, কবিই ছিলেন—পারিপার্শ্বিক লৌকিক সৌন্দর্যের প্রতি লুব্ধ না হইয়া পারেন নাই। বাংলায় লক্ষ্মণ সেনের ও মিথিলায় শিবসিংহের রাজসভা হইতে নাগরিক সংস্কৃতির যে কলাবতী রাগিণী উত্থিত হইয়াছিল তাহার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বাংলার পল্লীকবির চিত্তও স্পর্শ করিয়াছিল। তাই দেখা যায়—পরবর্তীকালে পল্লীকবিদের কতকটা দৃষ্টি-বিস্তার ঘটিয়াছে, সংকীর্ণতারও কিছু হ্রাস হইয়াছে, চর্যাপদের একতারা বৈষ্ণবপদের সপ্তস্বরা বীণায় পরিণত হইয়াছে। সভাকাব্যের প্রভাবে বঙ্গীয় ধর্মসঙ্গীতের সংকীর্ণরূপের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য প্রবেশ করিয়াছে এবং বঙ্গীয় কবিতা নিরাভরণা বালিকা-মূর্তি ত্যাগ করিয়া সালংকারা পূর্ণযৌবনা বিলাসিনী রূপে দেখা দিয়াছে। এই পরিণতির মূলে নেপথ্যে রহিয়াছেন দুইজন সভাকবি—জয়দেব ও বিদ্যাপতি, প্রথম জন বাঙ্গালী হইয়াও সংস্কৃত ভাষার কবি, দ্বিতীয় জন মিথিলাবাসী হইয়াও অবহট্‌ঠ ভাষার কাব্য-রচয়িতা। বঙ্গীয় পদাবলীর ইতিহাসে ইহাদের দান সর্বাগ্রে স্বীকার্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, অমার্জিত পল্লীকবির উপরে বিদগ্ধ রাজকবির—বিশেষতঃ অন্যভাষায় কবির প্রভাব-বিস্তার কিভাবে সম্ভব হইয়াছে? বঙ্গীয় কবিরা সকলেই কি সংস্কৃতে ও অবহট্‌ঠে সুপণ্ডিত ছিলেন? সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হইলেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসাদির অনুসরণ না করিয়া

অর্বাচীন জয়দেবের অনুকরণ করিয়াছেন কেন? এ-কথার উত্তরে বলা চলে—জয়দেবের সংস্কৃত ও বিদ্যাপতির অবহট্‌ঠের সহিত তদানীন্তন বাংলা ভাষার ভেদ ছিল যৎসামান্য; তৎফলে ভাবের আদান-প্রদান অসম্ভব হয় নাই। জয়দেবীয় সংস্কৃত কালিদাসের অভিজাত সংস্কৃত নহে—তাহা আভিজাত্যবর্জিত ও লৌকিক ভাবাপন্ন, তাহাকে অনুস্বব-বিসর্গযুক্ত বাংলাও বলা চলে। কালিদাসাদির কাব্য শ্রেষ্ঠ কাব্য হইলেও সাধারণ ভারতবাসীর কাছে জয়দেবের কাব্যেবই প্রচার ও প্রভাব হইয়াছিল অধিক। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের গীতত্বই এই প্রভাবেব কাবণ। বলা বাহুল্য, পাঠ্য কবিতার অপেক্ষা গেয় সঙ্গীতেরই প্রচার ও প্রভাব বেশী। জয়দেব সেই সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। জয়দেবেব সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল অসামান্য—তাঁহার সাধনায় বহু শতাব্দীব কৃত্রিম আড়ষ্ট ও ভাবমন্থব সংস্কৃতভাষা আকস্মিক প্রাণচাঞ্চল্য লাভ কবিয়া বিচিত্র সুবে ও তালে গান গাহিয়া উঠিয়াছিল। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে 'পদ্মাবতী-চরণ-চাবণ চক্রবর্তী' জয়দেব পদ্মাবতীর নৃত্য-গীত-বাদ্যের অনুসবণেই গীতগোবিন্দ বচনা কবিয়াছিলেন। তাই এখনও গীতগোবিন্দ পাঠ কবিতে গেলে শব্দগুণে আপনা হইতেই গানের সুর আসিয়া যায়, ছন্দে মৃদঙ্গ বাজে এবং কালের ব্যবধান ভেদ কবিয়া নৃত্য-নূপুবের নিক্কণ ভাসিয়া আসে। বাঙ্গালী কবির এই জাতীয় সঙ্গীত যে বাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে এবং বাঙ্গালী মাত্রেই যে ইহাতে মুগ্ধ হইবে তাহাতে আশ্চর্যেব কিছু নাই।

বিদ্যাপতি-পদের প্রচারের কারণ স্বতন্ত্র। বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুসংস্কৃতিব পতন হইলেও বহুকাল যাবৎ মিথিলায় হিন্দুরাজত্ব ছিল—মিথিলাই হইয়াছিল হিন্দু-সংস্কৃতির কেন্দ্র ও শাস্ত্রপঠনেব বিদ্যাপীঠ মিথিলায় যাতায়াত বাঙ্গালীদিগের ছিল স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা। সেইজন্য মৈথিল ও বাঙ্গালীতে অপরিচয়ের পার্থক্য ছিল না। তাহার পর বিদ্যাপতি কথ্য মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করেন নাই, তৎকাল-প্রচলিত সর্বভারতীয় কৃত্রিম সাহিত্য-ভাষা "অবহট্‌ঠে" কবিতা লিখিয়াছিলেন। এ কথা বিদ্যাপতি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"দেসিল বঅনা সবজন মিট্‌ঠা, তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা।" এই অবহট্‌ঠেরই পরিণতি

ব্রজবুলি।[১] এই ব্রজবুলি বাঙ্গালা দেশেও পূর্ব হইতে দ্বিতীয় ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। কাজেই ইহা বিদ্যাপতির কাব্যাস্বাদনে মোটেই বাধা সৃষ্টি করে নাই, বরং ব্রজবুলির জন্যই বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। কবিরঞ্জন, কবিবল্লভ, কবিশেখর প্রভৃতি পরবর্তী বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির ভাবে ভাবিত হইয়া এমন হুবহু বিদ্যাপতির নকল করিয়াছেন যে আসল বিদ্যাপতি ও নকল বিদ্যাপতির ভেদ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বিদ্যাপতির পদকে অবঙ্গীয় বলিয়া ত্যাগ করা চলে না।

বঙ্গীয় পদ-সাহিত্যের বিকাশে জয়দেবের দানই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এই দান উভয়বিধ—কাব্যের গঠনগত ও বিষয়গত। রচনা-পদ্ধতির দিক দিয়া মধুর ভাবের কবিতায় যথাসম্ভব যুক্তাক্ষরবর্জিত সুললিত শব্দবিন্যাস প্রয়োজন এবং ছন্দের সহিত ভাবের সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ কবিতার ভাব-পরিবর্তনে ছন্দও যে পরিবর্তনীয় তাহা জয়দেবই বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছেন। অভিসারসূচক চতুর্মাত্রিক "চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জম্" ছন্দের দ্রুতগতি যে মানভঞ্জনে ব্যবহৃত হইতে পারে না, যেখানে "বদসি যদি কিঞ্চিদপি"র পঞ্চমাত্রিক মন্থরতার প্রয়োজন, তাহা প্রথম বুঝা গেল গীতগোবিন্দ হইতে। পরবর্তী বঙ্গীয় রসকীর্তনের তাল-পরিবর্তন প্রথা ও পুনরাবৃত্তিমূলক ধ্রুবপদ বা 'ধুয়া' গাহিবার রীতি জয়দেবের নিকট হইতেই আসিয়াছে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে জয়দেবের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের রচনা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কাব্য-বিষয়ের দিক হইতে বঙ্গীয় কাব্যে জয়দেবের দান রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা। জয়দেবের কবিতা হইতেই বাঙালী বুঝিতে পারে—কবিতার বর্ণনীয় বিষয় চর্যাপদের মতো তত্ত্ব নয়, কবিতার বর্ণনীয় মানব মানবীর রূপ ও প্রেম অর্থাৎ কবিতার শ্রেষ্ঠরস মধুররস, আবার এই মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় রাধাকৃষ্ণ লীলা। শুধু তাই নহে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধাতুর ও জাতীয় মনোবৃত্তির

১ "এই অবহট্ঠ থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে।...এই পরবর্তী অবহট্ঠ যার উপর মৈথিলা প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলি রূপ নিয়েছিল।...সুতরাং ব্রজবুলি কোন প্রদেশবিশেষের সম্পত্তি নয়, তা আর্যভাষার সাধারণ সম্পত্তি।" পৃঃ ৬০-৬৩ বিচিত্র সাহিত্য (২য় খণ্ড)—সুকুমার সেন

পক্ষে এই রাধাকৃষ্ণ লীলারস যে অনুকূল ও উপযোগী তাহা জয়দেবের প্রতিভাই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। প্রেম-কাব্যের রসতত্ত্ব-সম্মত পালা বিভাগও জয়দেবের অবিস্মরণীয় কীর্তি। একই রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন সূত্র অবলম্বন করিয়া জয়দেব বাসকসজ্জা, মিলনোৎকণ্ঠা, প্রেমদৌত্য, অভিসার, বিপ্রলব্ধার মান, মানভঞ্জন ও সম্ভোগ ক্রমানুসারে বর্ণনা করিয়াছেন। বহুবল্লভ লম্পটকৃষ্ণের চাতুরী ও খণ্ডিতা রাধার কলহান্তরিত চিত্রের দ্বারা লীলা-রসের জটিলতা ও প্রগাঢ়তা সৃষ্টি তাঁহারই দান। তিনি যে সংস্কৃত ভাষার একজন মহাকবি হইয়াও মহাকাব্যের পুরাতন পন্থায় গীতগোবিন্দ রচনা করেন নাই, ইহার জন্য রসিকসমাজ তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বৈষ্ণব কাব্যে ও বৈষ্ণবধর্মে জয়দেবের দান রাধা-চরিত্র এবং রাধা-চরিত্রে পরকীয় রসতত্ত্ব। জয়দেববর্ণিত কৃষ্ণলীলা শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাধাবর্জিত কৃষ্ণ-গোপী-লীলা নহে—রাধাই নায়িকা, গোপীরা লীলাসহায়িকা মাত্র। জয়দেবের রাধা জয়দেবের নিজস্ব। এই রাধা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী রাধা নহেন, ইনি পরকীয়া নায়িকা। পালরাজত্বে চর্যাপদের যুগে দেখা যায়, হিন্দুসমাজ-বিরোধী বৌদ্ধ সহজিয়াদের দ্বারা বঙ্গদেশে পরকীয় রসতত্ত্ব প্রচারিত হয়। সমাজ-বিরোধী যৌনসম্ভোগে আদিম জীবনোল্লাস আছে বলিয়া জনসাধারণের পক্ষে এই তত্ত্ব পরম উপাদেয় হইয়া ওঠে। আমরা চর্যাপদে স্বকীয়া নৈরামণিকে পরকীয়ার অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে—নৈরামণির অনুকরণেই গীতগোবিন্দে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণপত্নী রাধা পত্নীত্ব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমিকা পরপত্নী হইয়া দেখা দিয়াছে। জয়দেব যেরূপ উল্লাসের সহিত নিজেকে 'পদ্মাবতীরমণ' ও 'পদ্মাবতী চরণচারণ-চক্রবর্তী' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা হইতে সন্দেহ হয়—খুব সম্ভব নৈরামণির পরকীয় ভাবের রস-সম্ভোগ জয়দেব-পদ্মাবতীর জীবনেও দেখা দিয়াছিল। পরবর্তী পরকীয়াবাদী বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে জয়দেবকে তাঁহাদের আদিগুরু ও নবরসিকের শ্রেষ্ঠ রসিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ আছে। লক্ষ্মণসেনীয় বিলাসকলার যুগে হিন্দুর যে কেবল রাষ্ট্রশক্তিগত ও ভাষাগত অপভ্রংশ নহে, সমাজনীতিগত অপভ্রংশও হইয়াছিল, এবং পরকীয় রস-কামনা নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা ঐ যুগের মধুরবাণী

বিজ্জকা প্রভৃতি নারী কবিদের রচিত সংস্কৃত কবিতায় নিজপতিকে উপপতিরূপে কামনা করার রসিকতা হইতেও জানা যায়।[১]

জয়দেব ও তৎশিষ্য 'নবজয়দেব' বিদ্যাপতি হইতে বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্যে দেহ-বিলাস ও সম্ভোগ বর্ণনার কদর্য রীতি ও রুচি আসিয়াছে। সাম্প্রদায়িক কারণে বৈষ্ণবেরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সাধকত্ব প্রচার করিলেও ভুলিলে চলিবে না যে ইঁহাদের কেহই আধ্যাত্মিক কারণে লেখনী ধারণ করেন নাই। রাজার নর্ম-বিলাসের সহচর হিসাবে রাজার ও সভাসদদিগের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই ইঁহাদের কাব্য রচনা। যুবতী নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনাও প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত কবিতা হইতে নহে, জয়দেব ও বিদ্যাপতির রচনা হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীতে আসিয়াছে। এই রীতি নিকৃষ্ট ও আদিম প্রবৃত্তিজাত সন্দেহ নাই; তথাপি বলিতে হইবে—জয়দেবের বিশেষ করিয়া বিদ্যাপতির দেহ-বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য দেহকে উপলক্ষ্য করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি—বহুক্ষেত্রে রূপাসক্তি ভোগাসক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। ইঁহাদের সম্ভোগ বর্ণনাও যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতর নহে, তাহা যে মার্জিত অগ্রাম্য ও শিল্পসৌন্দর্যযুক্ত, তাহা বুঝা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের সম্ভোগ চিত্রের সহিত তুলনায়। কৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণ সত্যকার বাস্তবজগতের দেহসর্বস্ব মানুষ, তাহাদের ইন্দ্রিয়ভোগ শ্লীলতাবর্জিত লালসাপূর্ণ পাশবিক ব্যাপার। কিন্তু জয়দেব-বিদ্যাপতির বর্ণনায় সম্ভোগ-চিত্র হইয়া উঠিয়াছে কল্পজগতের বা ভাব-বৃন্দাবনের ব্যাপার। সেখানে দ্বন্দ্ব সংশয় বাধা বিপত্তির বাস্তবতা নাই। সে জগৎ চিরবসন্ত ও চিরযৌবনের অমরাবতী—সেখানের নায়ক

১ আকারে চন্দ্র, কূজনে কোকিল, পারাবত চুম্বনে,
গতির ভঙ্গে হংস, হস্তী বিলাস-বিমর্দনে।
যুবতী কাম্য সব গুণ আছে—কি আর বলিব আমি,
না থাকিত যদি দোষটুকু—সে যে মোর বিবাহিত স্বামী!

—মধুরবাণী (মূল সংস্কৃত হইতে ডাঃ সুশীল দে কৃত অনুবাদ)

বাল্যে বালক, যৌবনে যুবা বৃদ্ধ বয়সে নিতি
বৃদ্ধ লইয়া ঘর করি মোরা, এই আমাদের রীতি।
পুত্রী রে তোর এক পতি লয়ে জন্ম কাটাতে সাধ,
আমাদের কুলে হয়নি কখনো হেন সতী-অপবাদ।—বিজ্জকা (ঐ)

নায়িকা রাধাকৃষ্ণ ছায়া-শরীরী, তাহাদের দেহবিলাসে সৌন্দর্য-রসই মুখ্য, লালসা গৌণ। সেখানে—

"বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল—চাঁদ বেড়ল মেঘমালা।"

বঙ্গীয় পদাবলীর ইতিহাসে জয়দেবের অপেক্ষা বিদ্যাপতির স্থানই বেশী। জয়দেব কবি মাত্র, কিন্তু বিদ্যাপতি হইতেছেন কবি-পণ্ডিত। বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য অসাধারণ। তাঁহার পদাবলীর মধ্য দিয়া জনসাধারণ সংস্কৃত যুগের বিভিন্ন কবির কাব্যের রসাস্বাদন করিয়াছে, অলংকারের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছে এবং মেঘদূত, ঋতুসংহার, অমরুশতক, গাথাসপ্তশতী, কামশাস্ত্র প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতা সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃতির মিলনতীর্থ। জয়দেব রাধাকৃষ্ণলীলার অংশমাত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার পূর্ণতা দিয়াছেন বিদ্যাপতি। পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাব-সম্মিলন পর্যন্ত প্রণয়লীলার এমন কোন অবস্থা নাই যাহা তাঁহার লেখনীতে ধরা দেয় নাই। জয়দেবে রহিয়াছে—রাধাকৃষ্ণের যৌবনে বসন্তকালীন অল্প কয়েকদিনের ঘটনা, কিন্তু বিদ্যাপতিতে রহিয়াছে—কিশোর বয়সের প্রেমোন্মেষের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনান্তিক প্রেমের চরম পরিণাম পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী সমগ্র প্রেম-জীবন। ছদ্মবেশী কৃষ্ণের দ্বারা প্রেমিকা রাধাকে ছলনা ও "চৌরী পীরিতি"র[১] রসসম্ভোগের ব্যাপার জয়দেবে নাই, ইহা বিদ্যাপতিরই প্রথম পরিকল্পনা। বিদ্যাপতির মধ্যে বৃন্দাবনের পরিবেশ জয়দেবের চিত্রের তুলনায় স্পষ্টতর, সখীগণ অধিকতর সক্রিয়ভাবে সহযোগিনী। জয়দেবের অপেক্ষা বিদ্যাপতির প্রেমও গভীরতর। জয়দেবের প্রেম নিতান্তই সহজ সরল এবং দেহানুগ; তাঁহার সম্ভোগ দৈহিক আরাম এবং বিরহ দৈহিক কষ্ট মাত্র। কিন্তু বিদ্যাপতিতে প্রেম অতি জটিল, তাহা মনস্তত্ত্ব ও রসতত্ত্ব-সম্মত—কেবল দৈহিক ক্রিয়ার ব্যাপার নহে, তাহার সহিত ছলনা, কৌতূহল, লজ্জা, ভয়, ঈর্ষা, হর্ষ, উদ্বেগ এবং অর্ধ-প্রকাশ ও অর্ধ-গোপনের নাগরী-বৃত্তি ওতপ্রোত। বিদ্যাপতির রাধা-চরিত্র পূর্ণাঙ্গ, রহস্যগভীর ও মনস্তত্ত্বসঙ্গত। সাহিত্যদর্পণ, অলংকারকৌস্তুভ প্রভৃতি রস-শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন নায়িকার চিত্র বিদ্যাপতিতে পাওয়া যায়।

জয়দেবের তুলনায় বিদ্যাপতির রচনাগত পূর্ণতার কারণ গঠনগত ভেদ।

---

১ চৌরী পীরিতি হোত লাখগুণ রঙ্গ

বিদ্যাপতির কবিতা সাধারণতঃ পাঠ্য কবিতা, জয়দেবের কবিতা সম্পূর্ণ গেয় কবিতা। বিদ্যাপতির অনেক পদ সুর সহযোগে গীত হইলেও প্রকৃতিতে পাঠ্য, গেয় নহে; তাহাতে সুর বাহির হইতে সংযোজিত হয়। সেক্ষেত্রে জয়দেবের রচনা হইয়েছে একেবারে গান, সুর সেখানে স্বতস্ফূর্ত। ইহারও কারণ আছে। বিদ্যাপতি কখনও জয়দেবের মতো সুরে তালে ও নৃত্যে কান পাতিয়া পদ রচনা করেন নাই, বরং ধ্যানস্থ হইয়া চরিত্রাঙ্কনের অবকাশ পাইয়াছিলেন। এ-অবকাশ জয়দেব পান নাই। তবে জয়দেবের সুরের জন্য সমস্ত ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সুরের স্রোত প্রবল বন্যার মতো কাব্যের সমস্ত অগভীরতাকে ছাপাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছে, কাব্যের সমস্ত আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেইজন্য জয়দেবেব কাব্য অপূর্ণাঙ্গ হইলেও বিদ্যাপতির তুলনায় তাঁহারই প্রতিষ্ঠা সমধিক। বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠা মিথিলায় ও বাংলায়, কিন্তু জয়দেবের প্রতিষ্ঠা সমগ্র ভারতে।

বিদ্যাপতির প্রচলিত পদগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—বিদ্যাপতিই বঙ্গীয় কবিদিগের কাব্য-কলার গুরু। তবে বর্তমানকালে বিদ্যাপতির রচনা-কৌশল বুঝিবার জন্য যথেচ্ছ পদ উদ্ধার করার বিঘ্ন আছে। কারণ বিদ্যাপতির প্রভাবে তাঁহার বহু শিষ্য তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া ব্রজবুলিতে এমন সমস্ত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে আসল নকল একাকার হইয়া গিয়াছে, কোনগুলি আসল বিদ্যাপতির রচনা তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তবে, নকল প্রমাণিত হইলেও কিন্তু এইগুলি হইতে কবির কাব্য-বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি অসম্ভব হয় না, কারণ ভক্তদের দ্বারা বিদ্যাপতির আদর্শ অনুসারে মূলের সাদৃশ্য রাখিয়া এইগুলি যে রচিত তাহা নিঃসন্দেহ, তদ্দ্বারা বিদ্যাপতির মহিমাও খর্ব হয় না। বলা বাহুল্য রসজগতে রসের অপ্রাপ্তি অপেক্ষা যথাসম্ভব প্রাপ্তিও বাঞ্ছনীয়। নকল প্রমাণিত হইলেও সাদৃশ্যজাত বলিয়া পদগুলি উপেক্ষণীয় নহে। তাহা হইতেও মূল রসের আস্বাদন সম্ভব।

আমাদিগের বক্তব্য—বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বর্তমান পদগুলি হইতেও বিদ্যাপতির দান বুঝা যায়। বাঙ্গালী প্রথম বিদ্যাপতির পদেই বুঝিয়াছে—কল্পনা ব্যতীত কাব্য হয় না, কল্পনাই বিভিন্ন সৌন্দর্যকে ঐক্যবদ্ধ করে। নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক পৃথক উপমা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথাগত ব্যাপার, একমাত্র

কল্পনাতেই এই বিচ্ছিন্ন উপমাগুলি ঐক্যসূত্রে বদ্ধ ও সুন্দর হইতে পারে। যেমন বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদে আছে—রাধার করতল রাঙা পল্লব, অধর বিম্বফল ও দশন দাড়িম্ববীজ; ইহাদের প্রতি লুব্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছে দুইটি পয়োধর-পক্ষী কিন্তু দেখিতেছে দূর হইতে, কারণ ভ্রূযুগলের ধনু রহিয়াছে উদ্যত।[1] এইরূপ কল্পনা-সৃষ্টি ছাড়া কাব্যরচনায় চরিত্রাঙ্কন বা মানসরহস্য প্রকাশ বিদ্যাপতির অপর অবদান। অন্তর্দৃষ্টি ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই এই চরিত্রাঙ্কন সম্ভব। যেমন একটি পদে গুরুজনের মধ্যে অবস্থিত রাধার লুকাইয়া কৃষ্ণদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। রাধার নিজের মুক্তামালা ছিন্ন করা ও সকলকে মুক্তা কুড়াইতে ব্যস্ত করিয়া প্রিয়দর্শনের অবসর সৃষ্টি করিয়া লওয়া[2] বিদ্যাপতির মানবচরিত্রাঙ্কন-দক্ষতার দৃষ্টান্ত। বিদ্যাপতির কবিত্বের কিন্তু শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হইতেছে কবিতায় ভাবাবেশ সৃষ্টি। ভাবমোহই গীতিকবিতার প্রাণ। জয়দেবের মধ্যে চেষ্টা করিলে কল্পনা ও কারুকলার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু অভাব এই ভাবাবেশের। একমাত্র এই কারণে তাঁহার কবিতা উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভাবাবেশের অভাবেই জয়দেবের কবিতায় দেহের কদর্যতা আড়াল করিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ এই ভাবমুগ্ধতা প্রকাশ করিয়াই বিদ্যাপতি পাঠকের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতি তাঁহার কল্পনার ঐশ্বর্য দেখাইয়াছেন; রাধার ছলনা, হাব, ভাব, লীলাবিলাস বর্ণনায় অপূর্ব চরিত্রাঙ্কন-শক্তি ও শিল্প-কৌশল দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি—ভাবপ্রকাশ হইয়াছে বিরহ-বেদনা ও মিলনোল্লাস সৃষ্টিতে। এইখানে দেখা গিয়াছে তাঁহার গভীর ভাবাবেশ। যথা—

"হীরা মণি মানিক একো ন মাগব ফেরি মাগব পহু তোরা।"

(আমি হীরা মণিমানিক্য একটিও চাহিব না, পুনরায় চাহিব প্রভু তোমাকে।)

---

১ পাণি পল্লবগত অধর বিম্বরত দশন দালিমবীজ তোরে।
কীর দূর ভেল পাশ ন আবয় তেঁহি ধনুকি কি তোরে॥

২ নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী কৈছন হেরব বয়ান॥......
তঁহি পুন মোতিহার টুটি ফেলাওল কহত 'হার টুটি গেল।'
সভজন এক এক চুনি সঞ্চরু শ্যামে দরশ ধনী দেল॥

"জীবন লাগ মরণ সম, মরণ সোহাবন রে।"

(জীবন অনুভূত হইতেছে মরণের মতো, মরণকে মনে হইতেছে সুন্দর।)

"নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ মঝু পাশ॥"

(প্রিয়ের সঙ্গে আমার নয়নের নিদ্রা মুখের হাসি চলিয়া গিয়াছে, নিকটে আছে কেবল দুঃখ।)

"আজ মঝু গেহ, গেহ করি মানলুঁ, আঁজু মঝু দেহ ভেল দেহা।"

(আজ আমার গৃহ গৃহ বলিয়া মনে হইল, আজ আমার দেহ হইল সত্যকার দেহ।)

—এই প্রকার গভীর ভাবের সমাবেশের জন্যই পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদকীর্তনে নিরত থাকিতেন। "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" প্রভৃতি পদ চৈতন্যদেবের আস্বাদনে অমর হইয়া রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ লীলাগীতি ব্যতীত বিদ্যাপতির অপর দান ভজন পদাবলী। এই-গুলি হইতেই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার শান্তরসের প্রার্থনা-পদাবলীর উৎপত্তি। এইগুলি বিদ্যাপতির প্রকৃত অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশক; একদিকে যেমন সংসার-বৈরাগ্য, অপরদিকে তেমনি ঈশ্বরভক্তি, আত্মদৈন্য ও আত্মনিবেদন ইহাদের বৈশিষ্ট্য। এই পদাবলীর নায়ক কিন্তু মাধুর্যমণ্ডিত রসিককৃষ্ণ নহেন, ইনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত মাধব। নামে মাধব হইলেও ইহার পুরাণসম্মত বিশেষ মূর্তি নাই; ইনি সর্বব্যাপী, জগৎ-তারণ, দীনদয়াময় ও জগন্নাথ। বিদ্যাপতির "তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম" প্রভৃতি পদ বৈষ্ণব শান্ত রস সাধনায় আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। পদগুলি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ, সর্বজনীন ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি কেবল মাত্র বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গুরু নহেন, ইহারা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মেরও পথিকৃৎ। এমন কি তাঁহাদের পদাবলী শ্রীচৈতন্যজীবনে প্রেম-সাধনার আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের কাজ করিয়াছিল। অধ্যাত্মসাধনার দুর্গম অন্ধপথে কবিদ্বয়ের পরিকল্পিত রাধা-চরিত্রই শ্রীচৈতন্যকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল। জয়দেব-বিদ্যাপতির রাধার সাহায্যেই প্রধানতঃ চৈতন্যদেব বুঝিয়াছিলেন—লৌকিক রস-শাস্ত্র অনুসারে কল্পিত প্রেমজীবনের সহিত আধ্যাত্মিক প্রেমজীবনের সাদৃশ্য কত নিবিড়। এই সাদৃশ্যের জন্যই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা জয়দেব-বিদ্যাপতির

লৌকিক পদাবলীর অলৌকিক ব্যাখ্যা প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন; সাদৃশ্য না থাকিলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসঙ্গত ও হাস্যকর হইত অথবা মোটেই সম্ভবপর হইত না। সেইজন্য বলিতে হয়—জয়দেব ও বিদ্যাপতি শুধু কবি নহেন, তাঁহারা মহাজন; এবং শুধু মহাজনও নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণবজগতের সত্যদ্রষ্টা ও ঋষি।

নেপথ্য-বার্তা

কবি-পরিচিতি

জয়দেব প্রাচীন ভারতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি। ইঁহার রচিত 'গীতগোবিন্দ' অপভ্রংশযুগে সংস্কৃত ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বর্তমানে কিন্তু কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী বলিয়া কোন গ্রামের অস্তিত্ব নাই, অজয় নদীর বালুকাময় তীরভূমিতে পৌষসংক্রান্তিতে 'কেঁদুলীর মেলা' নামক একটি বাৎসরিক মেলা বসিতে দেখা যায় মাত্র। সেইজন্য মিথিলা ও উড়িষ্যা হইতে জয়দেবকে দাবি করা হইয়াছে। যেহেতু উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরে অশ্লীল যৌন ভাস্কর্য দেখা যায়, সেই হেতু আদি রসের কবি জয়দেব উড়িয়া ছিলেন—ইহাই উড়িষ্যাবাসিগণের যুক্তি। বলা বাহুল্য এ যুক্তি দুর্বল। জয়দেবকে অ-বাঙ্গালী বলিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি এখনও উপস্থাপিত হয় নাই।

জয়দেব দ্বাদশ শতকের উত্তরার্ধে আবির্ভূত হন। ইনি ছিলেন প্রাচীন বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি। ইঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। ইঁহার 'গীতগোবিন্দে'র শেষের একটি শ্লোক হইতে জানা যায়—ইঁহার পিতার নাম 'ভোজদেব', মাতার নাম 'বামা দেবী'; তাছাড়া কাব্যের প্রথম সর্গে 'পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী' ও দশম সর্গে 'জয়তি পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবি ভারতী ভণিতমতি শাতম্' এই দুই পদ হইতে জানা যায়—জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী; পদ্মাবতী ছিলেন নর্তকী ও জয়দেব

ছিলেন সঙ্গতকারী। প্রাচীন বঙ্গে পদ্মাবতী-জয়দেবের নৃত্য-গীত-নৈপুণ্যের প্রসিদ্ধি ছিল। ষোড়শ শতকে কোচবিহারের সভাকবি অনিরুদ্ধ রাম-সরস্বতীর 'জয়দেব'-কাব্যে প্রতি গানের পূর্বে গায়করূপে জয়দেবের নাম ও গানের নৃত্যরূপ-দায়িকারূপে পদ্মাবতীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থের একটি কাহিনী হইতেও এই দম্পতীর সঙ্গীত-নৈপুণ্য সমর্থিত হয়।

দ্বাদশ সর্গে 'গীতগোবিন্দ' রচিত। সর্গে বর্ণিত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক সর্গের পৃথক পৃথক নামকরণ হইয়াছে এবং প্রতিটি নাম বিভিন্ন অবস্থাগত কৃষ্ণের, যথা—মুগ্ধ মধুসূদন, ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ, সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ প্রভৃতি। কাব্যের মূল বিষয় রাধা-বিরহ হইলেও কৃষ্ণের বিলাস-লীলাই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণ-রাধা। কাব্যে নায়িকার নহে, নায়কেরই প্রাধান্য। নাটকীয় ক্রিয়ার ব্যাপারে সখীর ভূমিকাই প্রধান। কাব্যে কৃষ্ণ, রাধা ও সখীদের উক্তিচ্ছলেই গান রচিত হইয়াছে। সখীর গানের সংখ্যাই বেশী। তাহার পরে রাধার গান। কৃষ্ণের গান সংখ্যায় তিনটি মাত্র। গান মোট চব্বিশটি আছে; এইগুলিই সুর তালে গেয় 'পদাবলী'। এই পদাবলী সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকাবলী দ্বারা গ্রথিত। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন—গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি লক্ষ্মণ সেনের রচনা। তাছাড়া তাঁহার ধারণা—"জয়দেবের গীতিনাট্যেও রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই ভূমিকা পুতুলের দ্বারা প্রদর্শিত হইত, গান দোহারে গাহিত, আর সখীর ভূমিকা অধিকারী অথবা প্রধান গায়ন গ্রহণ করিত।"[১]

গীতগোবিন্দ কাব্যের কয়েকটি সংস্কৃত টীকা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ধৃতিদাস, পূজারী গোস্বামী ও রানা কুম্ভের টীকাই বিখ্যাত। কোচবিহারের রাজা চিলারায় ষোড়শ শতাব্দীতে গীতগোবিন্দের একটি টীকা রচনা করেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিধর দাস বাংলায় গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ রচনা করেন, তাহার পর রঘুনাথ দাস, রসময় দাস ও দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণের অনুবাদ রচিত হয়। আধুনিককালে কবিশেখর কালিদাস রায় ইহার একটি কাব্যানুবাদ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি দেখা যায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন,

১ পৃ: ৫৩ বাজালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং)

"বিদ্যাপতি এক ধরনের গীতি-রচয়িতা কবিদের সাধারণ নাম। এ কবিদের মধ্যে মৈথিল ছিল, বাঙ্গালী ছিল, সম্ভবত নেপালীও ছিল।"[১] তবে আদি বিদ্যাপতি হইতেছেন মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলা-রাজের সভাকবি রূপে বর্তমান ছিলেন। ইনি মোটেই বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন শিবাদি পঞ্চদেবতা-পূজক স্মার্তপণ্ডিত। অবহট্ঠ ভাষায় 'কীর্তিলতা' নামক কাব্য এবং সংস্কৃত ভাষায় 'পুরুষ পরীক্ষা' 'লিখনাবলী' 'শৈবসর্বস্ব-সার' (স্মৃতিগ্রন্থ) 'গঙ্গাবাক্যাবলী' 'বিভাগসার' 'গয়াপাত্তন' ও 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' ইঁহার সাহিত্য-কীর্তি। তাছাড়া ইনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মিথিলাবাসীর নিকটে বিদ্যাপতি পদকর্তারূপে নহেন, পণ্ডিতরূপেই বিখ্যাত। অপরপক্ষে বাঙ্গালীদের নিকটে বিদ্যাপতি পণ্ডিতরূপে নহেন, পদকর্তারূপেই বিখ্যাত। শুধু তাহাই নহে, রামগতি ন্যায়রত্ন, জগদ্বন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি লেখক ও পদসংগ্রহকারীদের ধারণা ছিল—বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষার বাঙ্গালী কবি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জন বীমস্ ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় প্রচার করেন—পদকর্তা বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন, মৈথিলী। তারপর ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বীমসকে সমর্থন করেন। বঙ্গদেশে অজ্ঞাত ও মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির এইরূপ পদও যে কিছু আছে, এ কথা রাজকৃষ্ণই প্রথম প্রচার করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন সাহেব দ্বারভাঙ্গার মধুবনী পরগনার ভিক্ষুকদের মুখ হইতে এইরূপ বিরাশিটি নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া 'মৈথিলী ক্রেষ্টোম্যাথি' নাম দিয়া বিদ্যাপতির পদ প্রকাশ করেন। [গ্রীয়ারসনের সংগৃহীত পদগুলি প্রকৃত বিদ্যাপতির কিনা, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'র সম্পাদক লিখিয়াছেন—এই পদগুলি গ্রীয়ারসন "যেমন শুনিয়াছেন তেমনি ছাপিয়াছেন, না উহাদের উপর ভাষাতাত্ত্বিক অস্ত্রোপচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নাই। করিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বাস করি।"[২]—এই অভিযোগের তথ্য-প্রমাণ কিন্তু

১ পৃঃ ৩ ৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং)

২ ভূমিকা পৃঃ ।/০ বৈষ্ণবপদাবলী (৪র্থ সং)

উপস্থাপিত হয় নাই।] ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতির পদের বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে সতীশচন্দ্র রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অভিযোগ করেন যে—সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ মৈথিল কবি ও পণ্ডিত চন্দা ঝা-র সাহায্যে বাঙ্গালী কবি কবিবল্লভ, কবিশেখর, চম্পতি, ভূপতি, রায় শেখর ও বিশেষ করিয়া 'ছোট বিদ্যাপতি'র বহু ব্রজবুলি পদ 'ক্রেষ্টোম্যাথি'র আদর্শে মৈথিলীরূপে পরিবর্তিত করিয়া বিদ্যাপতির পদরূপে চালাইয়া দিয়াছেন। কাব্যবিশারদের সংস্করণে মাত্র ১৯৯টি পদ ছিল, সেক্ষেত্রে বহু বাঙ্গালী কবির সর্বনাশ করিয়া নগেন্দ্রনাথ ৯৬৫টি পদ বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়াছেন। বর্তমানে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার বাঙ্গালী পদের কোনোরূপ ছাঁটাই বাছাই না করিয়াই নগেন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থেরই পুনঃসংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই কোন কোন পদ খাঁটি বিদ্যাপতির রচনা তাহা জানিবার উপায় নাই। সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি-বিচাব' প্রবন্ধে সতীশচন্দ্র প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন—নগেন্দ্রনাথের সংস্করণেব ২৬, ১২৮, ১৭৮, ১৮৯, ২৩৬, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৫, ২৭৬, ২৯০, ২৯২, ৩০২, ৩১৬, ৪৩৬, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৯৭ সংখ্যক পদগুলি ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী পদকর্তা রায় শেখবেব রচিত। "এ সখি হামাবি দুখের নাহি ওর" পদটি যে বিদ্যাপতির নহে, কবিশেখরের তাহার প্রমাণ—সপ্তদশ শতকের শেষে রচিত পীতাম্বর দাসের 'অষ্টরস ব্যাখ্যা'য় এই কবিতাটির 'শেখর' ভণিতায় উল্লেখ। "কী পুছসি অনুভব মোয়" এই সুবিখ্যাত ও অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাটি কখনই বিদ্যাপতির নহে, ইহা শ্রীখণ্ডের উদ্ধব দাসেব শিষ্য ও 'রসকদম্ব' প্রণেতা কবিবল্লভের। সতীশচন্দ্র রায় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন—'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের প্রভাব ইহাতে বর্তমান। "ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোন অনুসরই"—এই বয়ঃসন্ধির পদটিও বিদ্যাপতির নহে, বিদ্যাবল্লভের। "বিরহ ব্যাকুল বকুল তরুতলে" অথবা "সই প্রেম অপরূপ" পদদ্বয় কবিকণ্ঠহারের এবং "হাম নব নায়রী মাধাই" পদটি কবি নৃপ-বৈদ্যনাথের।

বর্তমানে পদ-রচয়িতা বিদ্যাপতিকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি দেখা

যাইতেছে। কিন্তু পদকর্তা বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠার অখণ্ডনীয় প্রমাণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষ্য। চৈতন্য-চরিতামৃতে স্পষ্ট লিখিত আছে—শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদই আস্বাদন করিতেন।

বহুকাল যাবৎ লোকের ধারণা ছিল—বিদ্যাপতির পদাবলী প্রথমে বিদ্যাপতির মাতৃভাষা মৈথিলীতেই রচিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়া ব্রজবুলি ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মণীন্দ্র বসু প্রথম প্রমাণ করিয়া দেখান যে মৈথিলী হইতে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয় নাই। এই ভাষা অপভ্রংশ যুগে কৃত্রিম সাহিত্য-ভাষা অবহট্‌ঠেরই পরিণত রূপ; ব্রজবুলি উড়িষ্যা, আসাম, পূর্ববঙ্গ সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। এই অভিমত ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেনও সমর্থন করিয়াছেন।

২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে (১৪১২ খ্রীঃ) মিথিলার রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতিকে 'বিসফী' গ্রাম দান করিয়াছিলেন এই মর্মে একটি অনুশাসন আছে। কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে যে অনুশাসনখানি জাল।

বিদ্যাপতির বহু কবিতায় কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ ও রানী লছিমা দেবীর সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায়। এইজন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়ারা বিদ্যাপতির সহিত রানী লছিমার অবৈধ সম্পর্ক অনুমান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

চতুর্থ অধ্যায়

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সুপরিস্ফুট বাংলাভাষায় প্রথম গ্রন্থ খুব সম্ভব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বাংলা ভাষায় লিখিত যে সকল পুথি এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিই প্রাচীনতম। চর্যাপদাবলী ইহার পূর্বে রচিত হইলেও অবহট্‌ঠ ভাষার প্রভাবের জন্য ইহাতে বঙ্গভারতীর স্বাভাবিক রূপ সুস্পষ্ট নহে; বিশেষতঃ সর্বভারতীয় প্রাকৃত ছন্দে রচিত বলিয়া চর্যার বঙ্গীয়তায় সন্দেহের উদ্রেক স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাচীন ভাষার দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বঙ্গীয়ত্বে সন্দেহ হয় না। কেবল ঐতিহাসিক প্রাচীনতার জন্য নহে, নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তনের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকার্য। ইহার মধ্যেই বঙ্গীয় কবিতা প্রথম চর্যাযুগের আধ্যাত্মিক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক আদর্শ গ্রহণ করে এবং গোষ্ঠী-সংকীর্ণতা বর্জন করিয়া সর্বজনীন হইয়া উঠে। জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাজানুগ্রহজাত নহে, অথবা রাজপুরুষের মনোরঞ্জনার্থ রচিত নহে। সংস্কৃতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত কবির দ্বারা রচিত হইলেও ইহা পূর্বসাহিত্যের অনুকরণে সৃষ্ট নহে, ইহা স্বাবলম্বী কবির উদ্ভাবিত, পল্লীর অনাড়ম্বর পরিবেশের উপযোগী, গ্রাম্যরুচিসম্মত ও জনসাধারণের আনন্দবিধানের জন্য পরিকল্পিত। রূপ-রচনা নহে, বাস্তবতাই এই কাব্যের আদর্শ, বিলাসকলা নহে, জীবনসত্যের প্রকাশই ইহার উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনীয় বিষয়—কৃষ্ণকাহিনীর আবরণে তাৎকালিক বাস্তব গ্রাম্য জীবন, অরাজকতার সুযোগে অসহায়ের উপর প্রবলের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। ইহা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি। তাছাড়া ইহা পূর্বযুগের কাব্যগ্রন্থের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ নহে, ইহা বিশেষ কাহিনীসূত্রে ঐক্যবদ্ধ পদাবলীর নবগঠিত আখ্যায়িকা-কাব্য। প্রচার-পদ্ধতির দিক দিয়া ইহা কেবল গীত-সাহিত্য নহে, অভিনয়-সাহিত্যও বটে। কাহিনী-বিন্যাসেও ইহা নাটকীয়—ইহা প্রথম কাব্য-নাট্য, তদানীন্তন অভিধায় 'নাটগীত'। কেবল মৃদঙ্গ মন্দিরার বাদ্য ইহার সহচর নহে, 'কাচ-কাচা' অর্থাৎ অভিনয়ের জন্য বিচিত্র

সাজ-সজ্জা[১] ইহাতে প্রয়োজনীয়। কবি এই কাব্য-গানের আসরের সূত্রধার মাত্র, জনসাধারণই কাব্যের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনেতা, জনসাধারণই শ্রোতা এবং জনসাধারণই ইহার পৃষ্ঠপোষক। বলা চলে, বাংলার প্রথম জন-সাহিত্যিক বড়ু চণ্ডীদাস এবং প্রথম জনসাহিত্য নিঃসন্দেহে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। সকল দিক দিয়াই ইহা মৌলিক অভিনব ও অভূতপূর্ব।

গীতগোবিন্দের ন্যায় অভিজাত ও নাগরিক সাহিত্যের পরিবর্তে বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রাম্য জনতা-কাব্য রচনা ইতিহাসে আকস্মিক দৈবঘটনা নহে, এইরূপ কাব্যের আবির্ভাব হইয়াছিল অপরিহার্য। যে-যুগে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব সে-যুগে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রনৈতিক দুর্দশা স্মরণীয়। বিধর্মী ও বিজাতীয় শক্তির আক্রমণে বাঙ্গালী হিন্দুর রাষ্ট্রশক্তি তখন বিধ্বস্ত, সমাজশক্তি বিপর্যস্ত ও নাগরিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত। অভিজাত পুরুষেরা নিহত হইয়াছে, ধনীর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশত্যাগ করিয়া নেপালে মিথিলায় আশ্রয় লইয়াছে। এই যুগে শ্রোতৃমণ্ডলীর অভাবে কবির কাব্য হইয়া পড়িয়াছে নিরাশ্রয় ও অবলম্বনহীন। কাজেই এ-যুগের কবিকে নূতন পরিস্থিতিতে নূতন শ্রোতৃমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। রাজধানী হইতে দূরে নিভৃত পল্লীতে কাব্যের আসর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গ্রাম্য জনসাধারণ বসিয়াছে শ্রোতার আসনে। ভুলিলে চলিবে না, এই শ্রোতৃমণ্ডলী লক্ষ্মণ সেনের বা রাজা শিবসিংহের সভাসদের মতো সুশিক্ষিত ও মার্জিত-রুচি-সম্পন্ন নহে, অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিক; সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় বিশ্রামের জন্য ও লঘু আমোদ-প্রমোদের জন্য ইহারা সমবেত। ভুলিলে চলিবে না—ইহাদের অধিকাংশই দেহসর্বস্ব ও প্রাণধর্মী, কেবল গান ইহাদিগকে বেশীক্ষণ ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। ইহারা প্রত্যক্ষ ঘটনায় উত্তেজনা অনুভব করিতে চায়; কেবল শ্রব্য গীত নহে, নাট-গীতের প্রত্যক্ষ অভিনয়ই ইহাদের কাছে উপাদেয়। মানসসূক্ষ্মতা, শিল্পকলাবোধ ও

---

১ চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় নাটগীতে নিত্যানন্দ প্রভৃতির প্রতি শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ—

বলিলেন প্রভু 'কাচ' সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ কাঁচলি পাট শাড়ী অলংকার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥

কল্পনা-বিলাস ইহাদের কাছে আশা করা যায় না, নৃত্যে অঙ্গসঞ্চালনের ছন্দশ্রী ইহাদিগকে মুগ্ধ করে না, ইহারা মুগ্ধ হয় নর্তকীর স্বাস্থ্যশ্রী ও যৌবনশোভায়। ইহাদের নিকটে সুপেয় বস্তু শরবত নহে, সুরা। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ইহারা রসানুভব করে না, রসবোধ করে বাগ্‌বিতণ্ডায়। স্নেহ প্রেম প্রভৃতির শান্ত ভাব নহে, কলহজাত জয়পরাজয়ের উত্তেজনাই ইহাদের কাম্য। ইহাদের হাস্যরস ভাঁড়ামি, করুণরস আর্তনাদ, বীররস আস্ফালন এবং প্রেমরস ইন্দ্রিয়সম্ভোগ। বড়ু চণ্ডীদাস যতই সুপণ্ডিত মার্জিতরুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হউন না কেন, তিনি তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, ইহাদের চাহিদা তাঁহাকে মিটাইতেই হইবে। এই চাহিদা মিটাইতেই তাঁহাকে রচনা করিতে হইয়াছে জনতা-সাহিত্য ধামালীকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ধামালীকাব্য ও জন-সাহিত্য বলিয়া মনে না হইতে পারে। ইহা সত্য যে, কাব্যের বিভিন্ন পালার ঐক্য-বিধায়ক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং কাব্যের মধ্যে কবির পৌরাণিক জ্ঞানের পরিচয় আছে। কাব্যের নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণ-রাধা এবং এই কাব্যে ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণজন্ম, কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার কাহিনী স্থান দেওয়া হইয়াছে। কাজেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আসলে পৌরাণিক কাব্য এবং বৈষ্ণবধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্যতম গোষ্ঠী-সাহিত্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টি সত্যদৃষ্টি নহে। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনীর দিক দিয়া অ-পৌরাণিক ও বৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী। এই বিরোধিতা কবির শাস্ত্রে অজ্ঞতার জন্য নহে, গ্রাম্য ও ইতর শ্রোতৃমণ্ডলীর খাতিরে কবির স্বেচ্ছাকৃত এই বিরোধিতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী ভাগবতাদি পুরাণে রাধার অনস্তিত্ব ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার কৃষ্ণপ্রিয়া কল্পনা ও বিশেষ করিয়া রাধার চন্দ্রাবলী নাম হইতে বুঝা যায়—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতেই কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এই পুরাণ-কাহিনীকে বিকৃত না করিয়া পারেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা আছে, কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী রাধা। কিন্তু পতি-পত্নীত্বের স্বাভাবিক সম্পর্ক জনগণের চিত্তে সাড়া জাগায় না। কাজেই কবি রাধার পত্নীত্বকে উপপত্নীত্বে পরিণত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাধা আইহনের (অভিমন্যু) পত্নী এবং পারিবারিক সম্পর্কে

কৃষ্ণের মাতুলানী এবং এই আইহন পুরুষত্বহীন। এই সকল অপূর্ব তথ্য পরিবেশন করিয়া কবি জনগণের মুখরোচক পারিবারিক ব্যভিচারের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে ইহার রাসলীলার কাহিনী গৃহীত হইয়াছে—ভাগবতের ন্যায় ইহাতে শরৎ রজনীতে রাস অনুষ্ঠিত হয় নাই; বসন্ত-রাস ও দিবা-রাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য। এইখানেই ইহার পুরাণ সম্পর্কের পরিসমাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুখ্য কাহিনীর সহিত পুরাণের সম্পর্ক নাই। মুখ্যকাহিনী হইতেছে—তাম্বুলখণ্ডে বড়ায়ির মারফত রাধাকে কৃষ্ণের তাম্বুলরূপ প্রণয়োপহার প্রেরণ, দানখণ্ডে শুল্ক আদায়ের ছলে কৃষ্ণ কর্তৃক অনিচ্ছুক রাধার উপর বলপ্রয়োগ, নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক নৌকা ডুবাইয়া জলমধ্যে রাধা-ধর্ষণ, ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে ইন্দ্রিয়বিলাসের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের বাহক বৃত্তি, হারখণ্ডে হার-অপহরণ, যমুনাখণ্ডে জলবিহার, বাণখণ্ডে রাধার প্রতি সম্মোহন-বাণ নিক্ষেপ, বংশীখণ্ডে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী-অপহরণ এবং রাধাবিরহ খণ্ডে রাধার নিদ্রার অবকাশে কৃষ্ণের মথুরা পলায়ন। এই সকল কাহিনী জনরঞ্জনার্থে কবি-কর্তৃক রচিত; ইহাদের সহিত পুরাণ-কথার কোন সম্পর্ক নাই। রাধাকৃষ্ণ-মিলনের কামদূতী বড়ায়ির পরিকল্পনাও অপৌরাণিক ও কবির স্বকপোলকল্পিত।

কবির দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ অপৌরাণিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবির শাস্ত্রানুগত্য, ঈশ্বরভক্তি, দেবমাহাত্ম্যে বিশ্বাস, সংসারবৈরাগ্য, আচারনিষ্ঠা, অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রিয়তা প্রভৃতি পৌরাণিক মনোবৃত্তি অনুপস্থিত। কবির পৌরাণিক চরিত্রে শ্রদ্ধা নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই, কৃষ্ণের ভগবত্তায় বিশ্বাসও নাই; এমনকি ধর্মাধর্মবোধ, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়ের নৈতিক আদর্শও নাই। এই কাব্যে অধ্যাত্মধর্ম অনুপস্থিত, মানবধর্মও পরাভূত; সামাজিক বৃত্তি ও অসামাজিক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিরই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। জনতার ইঙ্গিত অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণ ভূভার-হরণার্থে অবতীর্ণ হইবার ভান করিয়া ভূভার-বৃদ্ধি করিয়াছেন ও ধর্মসংস্থাপনের নামে দুর্বৃত্ততা মিথ্যাচার ও অসহায় নারীকে ধর্ষণ করিয়া ধর্মের সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। কবির যদি বিন্দুমাত্র কৃষ্ণভক্তি থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণচরিত্রে কেবল ইন্দ্রিয়পরতা, ক্রোধ,

প্রতিহিংসা প্রভৃতি ইতর প্রবৃত্তি দেখাইতেন না ; তৎপরিবর্তে সর্বজ্ঞতা, কারুণ্য, ভক্তবৎসলতা প্রভৃতি দেবগুণের বিকাশ দেখাইতেন। পৌরাণিক মনোবৃত্তি থাকিলে কবি কখনই পুরাণের ভক্তশিরোমণি দেবর্ষি নারদকে সার্কাসের ভাঁড়ের স্থায় উপহাসের পাত্র করিয়া তুলিতে পারিতেন না। দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বানরনাচ নাচিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"বামন শরীর মাকড়-বেশ", বেঙের মতো লাফাইয়াছেন, ঘন ঘন জিভ বাহির করিয়াছেন এবং বোকা ছাগলের ডাক ডাকিয়াছেন।[১] দিব্য শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষকে এইভাবে অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র করিয়া তোলা নিশ্চয়ই পৌরাণিক মনোবৃত্তি নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণের অধর্মাচরণ পুরাণ-সমর্থিত। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রাসলীলায় পরদার-গমন বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব-পদাবলীতেও কৃষ্ণের পরকীয়া-প্রেম প্রদর্শিত হইয়াছে ; ইহাতে যদি পৌরাণিকতার হানি ও বৈষ্ণবধর্মের অবমাননা না হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ক্ষেত্রেই বা তাহা হইবে কেন ? নারদ সম্বন্ধেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহুকাল হইতে কলহপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয় চরিত্ররূপে নারদের কল্পনা পুরাণ-সম্মত ; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে নারদকে অবলম্বন করিয়া হাস্য করার মধ্যে পুরাণ-বিরোধিতা কোথায় ? রাধার উপর কৃষ্ণের বলপ্রয়োগকেও একটা পৌরাণিক রূপ দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় যে—"ইহার আদ্যন্ত একটা বিশিষ্ট ধর্মীয় চেতনাপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে।"[২] "কবির প্রধান উদ্দেশ্য কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার পূর্ব-স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং বৈকুণ্ঠেশ্বরীর প্রেম লাভ। তাই আদ্যন্ত কৃষ্ণকে অবতার রূপে অঙ্কনের চেষ্টা করা হইয়াছে।"[৩] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে তাই "আদিরসাত্মক পুরাণকেন্দ্রিক আখ্যানকাব্য হিসাবে গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন।"[৪]

---

১ নাচ এ নারদ ভেকের গতি।
বিকৃত বদন উন্নত মতি॥
....
মিলে ঘন ঘন জীভের আগ।
রাখ কাছে যেন বোকা ছাগ॥

২ পৃঃ ৩৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ " ৩২৫ ঐ

৪ " ৩৩৭ ঐ

কিন্তু পুরাণ ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লিখিত ধারণা অবিবেচনাপ্রসূত ও হিন্দুভাববিরোধী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তথাকথিত 'ধর্মচেতনা'র বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। পুরাণেই আছে সত্যকার ধর্মবোধ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ধর্মের ভণ্ডামি। পৌরাণিক কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তবৎসল—"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ হৃদয়হীন প্রতিহিংসাপরায়ণ উৎপীড়ক ও কামুক। ইহাকে বৈকুণ্ঠেশ্বর বা বিষ্ণুর অবতার বলা হাস্যকর। পৌরাণিক ব্রজগোপী কৃষ্ণভক্তিস্বরূপিণী এবং রাধা আজন্মকৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণময়জীবিতা 'হ্লাদিনী'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা অবৈধপ্রেমবিমুখী, কৃষ্ণদ্বেষিণী ও ধর্ষিতা গোপকন্যা; ইহাকে লক্ষ্মীর অবতার বলা মর্মান্তিক পরিহাস। পৌরাণিক রাসলীলায় ভক্তবাঞ্ছাপূরণ ও প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনই মুখ্য, সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রহিয়াছে প্রেমহীন করুণাহীন অবাঞ্ছিত নারীধর্ষণ। ইহাকে 'লীলা' বলা ব্যঙ্গ মাত্র। দেবর্ষি নারদ পুরাণে সদানন্দ ও কৌতুকপ্রিয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হইয়াছেন কৌতুকের পাত্র। দেবর্ষিকে 'বোকা ছাগে' পরিণত করায় হাস্য নহে, বিরক্তিরই সৃষ্টি হয়, ইহা রসিকতা নহে, উৎকট অরসিকতা। মোটের উপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'পুরাণকেন্দ্রিক আখ্যান-কাব্য' নহে, পুরাণের ছদ্ম আবরণে তাৎকালিক নারীধর্ষণেরই মর্মান্তিক আখ্যায়িকা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পৌরাণিক কাব্যরূপে চিন্তা করার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা কবির বাস্তবপন্থী মনোবৃত্তি ও কাব্যের বস্তুতান্ত্রিকতা। পুরাণকাহিনীর পাত্রপাত্রী—বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ-রাধাকে অবলম্বন করিয়া অলক্ষ্যে একটি অলৌকিক কুহেলিকামণ্ডিত সৌন্দযজগৎ বিরাজ করে। এই সৌন্দর্যলোকের নাম কল্পলোক বা ভাব-বৃন্দাবন। এই জগৎ রূপকথার জগতের ন্যায় স্বপ্নপুরী বা রোমান্সের জগৎ। এই জগতে ত্রুটিবিচ্যুতি নাই, শ্রীহীনতা নাই, জীবনের তুচ্ছতা বা ক্ষুদ্রতা নাই। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার এই কল্পজগতে রূঢ় সত্যের অনুসন্ধানী আলো এমনভাবে ফেলিয়াছেন যে সৌন্দর্যসঞ্চারী ছায়া সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে, আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে, পৌরাণিক মহিমার দ্বারা আবৃত মনুষ্যসমাজের সত্তা একেবারে অনাবৃত হইয়া বীভৎস রূপ ধারণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পৌরাণিক কল্পলোকের রাধাকৃষ্ণের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে যাত্রাদলের রঙমাখা সঙ্‌সাজা রাধা-কেষ্ট। বাস্তব দৃষ্টি

প্রশংসনীয় একমাত্র বাস্তব উপন্যাসে, অতি-লৌকিক পুরাণে নহে। সেখানে বাস্তবতা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। যে কৃষ্ণ কংসাসুর বিনাশের জন্য আস্ফালন করিতেছেন, অতিলৌকিক শক্তিতে কালীয়দমন করিতেছেন এবং নিজেকে বহুগুণিত করিয়া রাসলীলায় ষোল শত গোপীর সহিত বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ রিয়ালিস্টিক হইলে চলিবে কেন? কাব্যমাত্রেই সৌন্দর্যের বিধি মানিয়া চলিতে বাধ্য। বাস্তব কাহিনীর কাব্যেও বাস্তবতার দোহাই দিয়া পুরীষ-ত্যাগের বর্ণনা চলে না। সে ক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাস পৌরাণিক কাহিনীকে বস্তুতান্ত্রিক কাব্যের বিষয় করিয়া সৌন্দর্যের দাবিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ ইতর ভাষায় শ্রীরাধাকে 'ছিনারী'[১] ও 'শ্যালী'[২] সম্বোধন করিতেছেন, প্রহার করিয়া যমালয়ে পাঠাইবার[৩] ভয় দেখাইতেছেন এবং ব্রজসুন্দরীগণের পরস্পরের মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া শাস্তি দিতে চাহিতেছেন—"মুণ্ডে মুণ্ডে ডুলায়া মারিব তোহ্মা হেলে।" রাধাও কম নহেন, রীতিমত ঘুষি তুলিয়া বলিতেছেন—"মাগু কিলে কিলাইয়া মারিব তোহ্মা বাটে"। তাছাড়া নারায়ণের অবতার শ্রী'বৈকুণ্ঠেশ্বর' নৌকাখণ্ডে রাধাকে নৌকায় পাইয়া "হিঅ হিঅ" (হেঁইও) বলিয়া দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অভিপ্রায় সিদ্ধির উল্লাসে পরম উৎসাহে চিৎকার করিয়া গান ধরিয়াছেন—"হেহে লহে লহে"[৪]। এইগুলি উৎকট গ্রাম্যতা ও অসঙ্গতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ইহাতে পৌরাণিক কাহিনী শ্রীভ্রষ্ট ও অপৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তববাদিগণের স্মরণ রাখা কর্তব্য—মাটির তুচ্ছতা স্বর্গে দেখা দিলে মাটি স্বর্গ হয় না, স্বর্গই মাটি হইয়া যায়। অতিরিক্ত বাস্তবতা সৃষ্টির ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পৌরাণিকতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার আধ্যাত্মিক মহিমার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।)

---

১ 'ছিনারী' পামরী নাগরী রাধা দিকে পাতসি মায়া। [ছিনারী=নাক-কাটা বেশ্যা]

২ নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে 'শালী'। [মাউলানী=মাতুলানী]

৩ তবে আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর।

৪ যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ,
হেহে লহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ,
হেহে লহে লহে॥

মনোবৃত্তিতে বড়ুচণ্ডীদাস আধুনিক যৌনতাত্ত্বিকের সগোত্র। তাঁহার কাছে দেহাতীত প্রেম মিথ্যা ও কামগন্ধহীন আসক্তি অসম্ভব। ছলে বলে কৌশলে যৌনমিলনের ফলেই দেহ-লালসার উৎপত্তি এবং দেহ-লালসার পরিণতি নরনারীর পরস্পর মানস আসক্তিতে। ইহাই প্রেম। প্রেমের এইপ্রকার 'বায়োলজিক্যাল' ধারণা জনতার মনোমত বলিয়া বড়ুচণ্ডীদাস কৃষ্ণধর্ষিতা রাধার মনে কৃষ্ণবিদ্বেষ ও ঘৃণাভাবের পরিণতি দেখান নাই, কৃষ্ণাসক্তিরই বিজয় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আত্মার ধর্ম কীভাবে ক্রমশঃ দেহধর্মের কাছে পরাভূত হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-চরিত্র তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকের মতোই রাধার জীবনে দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন। তাম্বুল খণ্ডে ও দান খণ্ডে কৃষ্ণকে রাধা শত্রুরূপে দেখিয়াছে এবং কৃষ্ণেব যৌনমিলনের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কৃষ্ণ কর্তৃক বলপ্রয়োগের সময়ে রাধা হাহাকার কবিয়া আর্তনাদ করিয়াছে। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড ও বৃন্দাবন খণ্ডে বারংবার ধর্ষিতা হইয়াও আত্মিক শক্তির জন্য রাধা দেহসুখের নিকটে আত্মসমর্পণ করে নাই বরং যথাসাধ্য কৃষ্ণের প্রতিকূলতাই করিয়াছে, কিন্তু বাণ খণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক সম্মোহন বাণ নিক্ষেপের ফলে রাধার হইয়াছে আত্মিক পরাজয়। রাধা লালসার বশীভূত হইয়াছে এবং এই লালসা বংশীখণ্ডে মানস আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহারই চূড়ান্ত পরিণতি দেখানো হইয়াছে কৃষ্ণকর্তৃক রাধা-প্রত্যাখ্যানে। রাধার কৃষ্ণ-সম্পর্কের আরম্ভ যেমন হাহাকারে, কৃষ্ণ-সম্পর্কের পরিসমাপ্তিও তেমনি হাহাকারে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্থূল-রুচি গ্রাম্য জনতার কাছে উপভোগ্য আদিরসাত্মক কাব্য, কিন্তু ভদ্ররুচিসম্পন্ন দরদীর কাছে করুণরসের কাব্য এবং একটি মর্মান্তিক ট্রাজেডি। সত্য বলিতে কি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার প্রেম অসুন্দর ও অস্বাভাবিক বলিয়াই অত্যন্ত করুণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অস্বাভাবিক ধর্ষণ ও সম্মোহন বাণের অভিচার-ক্রিয়ার পথে রাধার মনে মিলনেচ্ছা জাগিয়াছে। তৎপূর্বে রাধা স্বেচ্ছায় আত্মদান করে নাই। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণের নৌকা ডুবাইবার কালে রাধা কৃষ্ণের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছে বটে কিন্তু প্রেমাবেগে নহে, প্রাণভয়ে। এ-মিলনে সত্যকার সৌন্দর্য নাই। শেষে সম্মোহন বাণে যখন রাধার মনে প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে,

তখনও তাহা সুন্দর স্বাভাবিক হইতে পারে নাই, কারণ এই প্রেম একতরফা—কৃষ্ণের প্রেমের দ্বারা পরিপুষ্ট নহে। রাধা-বিরহ পালায় কৃষ্ণ রাধাকে উপভুক্ত বারবনিতার মতো ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছে, কাজেই রাধার খেদোক্তিতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে সত্যকার বিরহের প্রেমবেদনা বলা চলে না, তাহার মধ্য হইতে ঘৃণিতা, পরিত্যক্তা ও পদদলিতা অনাথার করুণ আর্তনাদই শোনা যায। পরিত্যক্তা হইবার প্রাক্কালে কৃষ্ণেব পদপ্রান্তে লুন্ঠিতা বাধা আর্তস্বরে বলিয়াছে—

আমুগতী ভকতী 'আনাথি' আহ্মি নাবী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পবিহরহ মুরাবি। [আনাথি = অনাথিনী]

পরিত্যক্তা হইবার পর হাহাকার করিয়াছে—

এ ধন যৌবন বডাযি সবই অসাব।
ছিণ্ডিআ পেলাইবোঁ গজমুকুতাব হাব॥
মুছিআ পেলাইবোঁ মোয়ে শিসেব সিন্দুর।
বাহুব বলয়া মো কবিবোঁ শংখচুর॥…
'আনাথ' করিয়া মোক কাহ্নাঞি পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাস গাএ॥

—এই 'আনাথি' ও 'আনাথ' শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ। বাধা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাপ্রেমের গৌরব নহে, দীনতাই প্রকাশিত হইযাছে।

পাপিষ্ঠ চরিত্রকে নায়কেব আসনে বসাইবাব অতি-আধুনিক পদ্ধতিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণকে কবি ভগবান বলিয়া প্রচাব করিলেও তাঁহার কৃষ্ণের মধ্যে কেবল পাশবিক্ প্রবৃত্তিরই স্ফুবণ দেখা যায়। ধর্মজ্ঞানশূন্য মিথ্যাবাদী আস্ফালনপটু প্রতিহিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর কামুক এই কৃষ্ণ। তাঁহার চরিত্রে প্রেম তো নাই-ই, দয়া মমতা ক্ষমা প্রভৃতি ভদ্র মনোবৃত্তিরও চিহ্নমাত্র নাই। ইনি ছল, বল, কৌশল অবলম্বন করিয়া অসহায় দুর্বল নারীর উপর বারংবার বীভৎস অত্যাচার করিয়াছেন। ভক্ত সমালোচকের মতে—"কৃষ্ণ লক্ষ্মীর অবতার রাধার সংসার-চৈতন্য বিলুপ্ত করিয়া তাঁহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।"[১] ইহাই নাকি কৃষ্ণের অমানুষিক অত্যাচারের

১ পৃঃ ৩৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

কৈফিয়ৎ! বর্বরোচিত উৎপীড়ন ব্যতীত যেন লক্ষ্মীচেতনা জাগ্রত করিবার অন্য উপায় ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণচরিত্রে গুণমুগ্ধতা দূরে থাকুক, রূপমুগ্ধতারও স্থান নাই। রাধাকে স্বচক্ষে দেখিবার ইহার প্রয়োজন হয় না, রাধার যৌবনের কথা কানে শুনিয়াই ইনি ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অনুভব করেন এবং কামদূতী বড়ায়ির শরণাপন্ন হন। পরিশেষে চিরন্তন প্রবঞ্চক লম্পটের মতো এই কৃষ্ণ রাধাব চরম সর্বনাশ করিয়া উপভুক্তাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, ছিন্নলতিকার মতো পদপ্রান্তে পতিতা কৃষ্ণাশ্রয়-কাঙালিনী ক্রন্দনরতা রাধাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন না—

এ বেসি জানিল ভৈল কলি অবতার।
সবজন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার॥
কমণ ঝগড়া রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো॥
দূতী দিঞা পাঠায়িলেঁ। গলার গজমোতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ।—'আহ্মে আবালি সতী'॥

[আবালি=আবাল্য]

এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিয়া রাখ নওলী যৌবন॥

—এইভাবেই কৃষ্ণ-চরিত্রের ভগবত্তার প্রকাশ হইয়াছে এবং 'গোআলিনী' রাধার 'লক্ষ্মীচেতনা'র উদ্বোধন করা হইয়াছে! এই প্রত্যাখানের বজ্রাঘাতেই কাহিনীর প্রকৃত পরিসমাপ্তি।[১]

কৃষ্ণের উপযুক্ত কামদূতী কুট্টিনী হইতেছে বড়ায়ি। ইহার আকৃতি যেমন বীভৎস, প্রকৃতিও তদনুরূপ। কোটরগত চক্ষু, লম্বিতস্তনী, গলিতদন্তা, পলিতকেশা, কঙ্কালসার প্রেতিনীমূর্তি এই বৃদ্ধা। কিন্তু বার্ধক্যজনিত ধর্মবুদ্ধির কোন উন্মেষ ইহার মধ্যে নাই; বড়ায়িকে আত্মীয়-জ্ঞানে রাধার রক্ষণার্থে

১ কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাবর্জন কাহিনীর পরে কবি সম্ভবতঃ জনতার অনুরোধে শেষবারের মতো বড়ায়ির দ্বারা কৃষ্ণকে অনুনয় করাইয়া রাধাব সহিত লোকদেখানো অনিচ্ছাকৃত মিলন দেখাইয়াছেন। এই গ্লানিপূর্ণ অস্বাভাবিকতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত রাধার নিদ্রার সুযোগে কৃষ্ণ মথুরা পলাইয়া বাঁচিয়াছেন এবং কাহিনীরও ইতি হইয়াছে।

নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু রক্ষক হইয়াও ভক্ষকের কাজ করিতে ইহার দ্বিধা হয় নাই। রাধাকে কৃষ্ণ স্বচক্ষে দেখেন নাই, বড়ায়িই কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপযৌবন বর্ণনা করিয়া তাহার লালসা উদ্রিক্ত করিয়াছে এবং বুঝাইয়াছে—

আষোড় যোড়ন আঙ্কে করিবারে পারি।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী॥

বৃদ্ধ হইলেও তাহার প্রতিহিংসা সাংঘাতিক। (কাম-প্রস্তাবে রাধার নিকটে অপমানিতা হইয়া প্রতিশোধগ্রহণার্থে কৃষ্ণের সহিত তাহার ষড়যন্ত্র দ্রষ্টব্য।) বৃদ্ধা হইলেও তাহার কামুকতা ঘুচে নাই; কৃষ্ণের দ্বারা রাধা-ধর্ষণ দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছে এবং তাহার অবচেতন মনের কাম-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। তাহার মনের কামপ্রবৃত্তির জন্যই যমুনাখণ্ডে নিজে উলঙ্গ হইয়া অন্যান্য গোপীকে উলঙ্গ হইতে বলিয়াছে এবং কৃষ্ণকে বস্ত্রহরণে সাহায্য করিয়াছে। ইহার জন্য কৃষ্ণও বড়ায়িকে পরিহাস করিয়াছে—

আল বড়ায়ি
সাত পাঁচ সখিজন লঞা।
জলেত নাম্বিলী লাঙ্গট হঞা॥ ল॥

বড়ায়ি কৃষ্ণেরই নারী-সংস্করণ। তথাপি কৃষ্ণের তুলনায় বড়ায়ির কতকটা মনুষ্যত্ব আছে; শেষ পর্যন্ত তাহার নারী-হৃদয়কে সে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। বাণখণ্ডে বাণাহত রাধার দুর্দশায় তাহার পাষাণহৃদয় গলিয়াছে ও কৃষ্ণকে দয়া করিতে অনুরোধ করিয়াছে। এইখানেই বড়ায়ি কৃষ্ণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আসলে বড়ু চণ্ডীদাস সৌন্দর্যরসিক গীতি-কবি নহেন, সত্যনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। চরিত্র-চিত্রণই তাঁহার মুখ্য কাজ। তিনি সাহিত্য-ধর্মে আধুনিকযুগের ঔপন্যাসিকদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার দৃষ্টি বাস্তবপন্থী ও মিষ্টিসিজমের বিরোধী। তিনি নারীচরিত্রের রহস্যবেত্তা ও লম্পট চরিত্রাঙ্কনে সুনিপুণ। তিনি দরদীও বটেন, অসহায় ধর্ষিতা নারীর মর্মভেদী হাহাকার-প্রকাশ ও তদ্দ্বারা পাঠকচিত্তে করুণা-উৎপাদন তাঁহার হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। এই হৃদয়বত্তার জন্যই গ্রন্থমধ্যে তিনি জনতার দাবি কতকটা অগ্রাহ্য করিয়া কামায়ন-বিরোধী রাধা-বিরহ না লিখিয়া পারেন নাই। হৃদয়বত্তার জন্যই

তিনি তাৎকালিক নারীধর্ষণের চিত্রকে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। জনতার কবি হইয়া জনতার মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছিল এবং বারংবার কাব্য-কাহিনীকে লালসার সুরায় সিক্ত করিতে হইয়াছিল—ইহা তাঁহার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়াই তিনি পৌরাণিকতার তুলসীপত্রে কামায়নের কদর্যতাকে কথঞ্চিৎ ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও পরবর্তী বঙ্গসমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করে নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গুণবত্তা সত্ত্বেও অশ্লীলভাবের জন্য বঙ্গ-সমাজ ইহাকে 'উরগক্ষত অঙ্গুলি'র ন্যায় বর্জন করিতে দ্বিধা করে নাই। বাঙ্গালী বহুকাল যাবৎ বড়ু চণ্ডীদাসকে ভুলিয়াছিল। এই ভুলিয়া থাকা বাঙ্গালীর অকৃতজ্ঞতার ফল নহে, ইহাকে বাঙ্গালী-সমাজের উন্নাসিকতা বা নৈতিক গোঁড়ামি বলিলে ভুল হইবে। জানা উচিত, আর্টের নামে দুর্নীতি-প্রচার সভ্য মনোবৃত্তি নহে এবং সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রবর্তন সৌন্দর্যবোধ ও ভদ্রতাবোধের বিরোধী; কোন সভ্যসমাজ তাহা বেশীদিন সহ্য করে না। একমাত্র অশ্লীলতার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠক-সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া আছে, নচেৎ অন্যান্য দিক দিয়া ইহা যে প্রাচীন বাংলার উৎকৃষ্ট ও অমর সৃষ্টি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নেপথ্য-বার্তা

গ্রন্থ-পরিচিতি ও চণ্ডীদাস-সমস্যা

'বাসলী-সেবক' বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি সন ১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের দ্বারা আবিষ্কৃত হয় এবং ১৩২৩ সালে উঁহারই সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বসন্তরঞ্জন বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে পুথিটি সংগ্রহ করেন। দেবেন্দ্রনাথ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশ-জাত। আবিষ্কৃত পুথিটি তুলোট কাগজে লিখিত ও আদ্যন্ত খণ্ডিত। পুথির লিখিত শেষ পাতা নাই, অথচ অলিখিত শাদা পাতা কয়েকটি শেষে আছে।

গ্রন্থের নাম, কাল ও পুথি-নকলের তারিখ নাই। পুথিটির মধ্যে একটি ছোট রসিদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে—শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন নামে এক ব্যক্তি ১০৮৯ সালে (১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের (শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনীর?) ষোলটি পাতা মহারাজের নিকটে লইয়া গিয়াছিল এবং যথাসময়ে ফেরত দিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়—মহারাজ হইতেছেন বনবিষ্ণুপুরের রাজা, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন রাজকর্মচারী এবং পুথিটি রাজার পুথিশালায় রক্ষিত ছিল। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য অনুমান করিয়াছেন—পুথির নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল ও আবিষ্কৃত পুথিটির অনুলিখনের কাল সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিপি-বিচারে সিদ্ধান্ত করেন—পুথিটি ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ও সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে ইহা ১৪৫০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে লেখার তারিখ ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন পুথির কাগজের প্রাচীনতা সন্দেহ করেন এবং পুথির মধ্যে প্রাপ্ত রসিদের তারিখ সম্বন্ধেও সংশয় প্রকাশ করেন, তাছাড়া কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দ, বিশেষ করিয়া 'মজুরি' ও 'মজুরিয়া' শব্দের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার ধারণায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে লেখা হয় নাই।"[১] তবে মূলকাব্য "ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা হইয়াছিল।"[২] মণীন্দ্রমোহন বসু বিদ্যাপতির রচনার উপরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব দেখাইয়া বলিতে চান—বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিরও পূর্ববর্তী এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন "ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।"[৩] অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের* ধারণা—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিখানি আদ্যন্ত জাল, ইহা উনবিংশ শতকে মাইকেল মধুসূদনের পরে রচিত—"কারণ বইতে মাইকেলী ভাষা আছে, যথা 'আদেশিব'—আদেশ করিব।" তাছাড়া "ইহাতে প্রায় ১৪০টি আধুনিক যুগোচিত শব্দ

১ পৃঃ ১০৯ বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড,

২ পৃঃ ১০৭ ঐ, ৩ পৃঃ ২৫৭ বাঙ্গালা সাহিত্য ১ম খণ্ড

* ইনি প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের সাড়ে ছয়খানি বিখ্যাত গ্রন্থকে জাল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আছে।” বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে সর্ববাদিসিদ্ধান্ত এখনও কিছু হয় নাই, তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের ধারণা—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পূর্ব প্রাচীন কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায়—রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী, রাধা লক্ষ্মীর অবতার ও রাধার একমাত্র সহচরী বৃদ্ধা বড়ায়ি; এই প্রকার ধারণা চৈতন্য-পরবর্তী যুগে সম্ভব নহে। চৈতন্য-পরবর্তীকালে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, রাধাই মূল হ্লাদিনী, লক্ষ্মী তাঁহার অংশাবতার এবং ললিতা বিশাখাদি সমবয়সী গোপী রাধাসখী—এই ধারণাই প্রচলিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের আবিষ্কারের ফলে পণ্ডিতমহলে চণ্ডীদাস-সমস্যার উৎপত্তি হয়। চণ্ডীদাস নাম বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে নূতন নহে। ১৫৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণব-তোষণী' গ্রন্থে কাব্য-শব্দের ব্যাখ্যায় কাব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে “চণ্ডীদাসাদির” 'দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া চৈতন্য-ভাগবতাদি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে চৈতন্যদেবের চণ্ডীদাসের কাব্য-আস্বাদন ও দানলীলার অভিনয়ের কথা বলা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে ইহার মধ্যেই 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ড' আছে এবং ইহা চণ্ডীদাস-উপাধিক এক কবির রচনা। প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদাবলীতে এই দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড পালা নাই। সুতরাং একদল পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যপূর্ববর্তী কালে রচিত এবং চৈতন্যদেবের দ্বারা আস্বাদিত। এই সিদ্ধান্ত হইতেই মতভেদের সূচনা হয়। ভক্ত বৈষ্ণবেরা আপত্তি করিয়া বলেন—বড়ুচণ্ডীদাসের অশ্লীল কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভুর আস্বাদ্য হইতে পারে না। পদাবলীই মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, ইহাই ভক্তগণের বিশ্বাস; কিন্তু এই বিশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ চণ্ডীদাসের পদাবলীর কোন সুপ্রাচীন পুথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠে—চণ্ডীদাসের জন্মভূমির প্রশ্নে। বীরভূমের নান্নুর ও বাঁকুড়ার ছাতনা দুইটি গ্রামই চণ্ডীদাসের জন্মভূমিত্বের দাবি করে। আরও সমস্যার কথা, নান্নুরের সরস্বতী ও ছাতনার চণ্ডী উভয়েরই নাম বাশুলী এবং কৃষ্ণকীর্তনের কবি ও পদাবলীর কবি উভয়েই বাশুলীর সেবক বলিয়া পরিচিত। কাজেই প্রশ্ন উঠে—(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ও পদাবলীর কবি একই, না পৃথক ব্যক্তি? অর্থাৎ চণ্ডীদাস এক না একাধিক? (২) একাধিক চণ্ডীদাস হইলে আদি চণ্ডীদাস কে?

(৩) চৈতন্যদেব কাহার রচনা আস্বাদন করিতেন? (৪) কোন বাশুলী চণ্ডীদাসের উপাস্যা? (৫) একসঙ্গে দুই জেলার দুটি পৃথক গ্রাম চণ্ডীদাসের জন্মভূমি হয় কিরূপে? (৬) চণ্ডীদাসের সহজিয়াসাধন ও সাধন-নায়িকা রামী ধোপানী সম্বন্ধীয় প্রবাদ আছে। এই রামী কোন্ চণ্ডীদাসের সঙ্গিনী? এই সকল প্রশ্নের সর্ববাদিসম্মত উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে রামী ধোপানী সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে—রামী-কাহিনী অমূলক ও সহজিয়াদের কল্পিত, এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। চণ্ডীদাসের জন্মভূমি ও দেবীপূজা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ছাতনার পক্ষপাতী; তিনি মনে করেন—"বাশুলীর সম্পর্ক বিশেষভাবে বড়ু চণ্ডীদাসেরই"[১] এবং নান্নুরের মূর্তি "কিছুতেই বাশুলী (চণ্ডী) নহে।"[২] অপরপক্ষে চণ্ডীদাস-পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন—"বীরভূম জেলার নান্নুরে অবস্থিত বাশুলীর উপাসকের পক্ষে শুধু চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদসমূহ রচনা করা সম্ভব। কেননা ঐ বাশুলী তন্ত্রোক্ত দ্বিভুজা খড়্গখেটক ধারিণী মুণ্ডমালিনী নহেন, পরন্তু চতুর্ভুজা বীণাবাদিনী বিশালাক্ষী। তিনি বৈষ্ণব না হইলেও উগ্র শাক্ত ছিলেন না।"[৩]

চণ্ডীদাস কয়জন? এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণা—বড়ু চণ্ডীদাসই একমাত্র চণ্ডীদাস, প্রথম যৌবনে ইনি অসংযত, তাঁহার প্রথম যৌবনের দেহ-বিলাসের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; কিন্তু পরিণত বয়সে ইনিই সুসংযত, ইঁহার তখনকার রচনা পদাবলী প্রেমসঙ্গীত। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন—পদাবলীর চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্তী এবং কৃষ্ণকীর্তনের বড়ু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও একাধিক ব্যক্তি। দীন চণ্ডীদাসের পদ অপেক্ষাকৃত নীরস এবং একটি ধারাবাহিক আখ্যায়িকার অংশ, অপর পক্ষে দ্বিজচণ্ডীদাসের পদ স্বতন্ত্র ও সরস। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লার বিচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন —"(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনও স্থানে (পদাবলীতে উক্ত) দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন

---

১ পৃঃ ১০৪ বিচিত্র সাহিত্য (১ম খণ্ড)

২ পৃঃ ১০৫ পাদটীকা ঐ।

৩ ভূমিকা পৃঃ ২৮৵ চণ্ডীদাসের পদাবলী (সাহিত্য পরিষৎ)

চণ্ডীদাস নাই। (২) সর্বত্র 'গাএ' বা 'গাইল' আছে, কোথাও 'ভণে' 'কহে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (৩) ভণিতা কখনও উপান্ত চরণে হয় না। (৪) বড়ু-চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। (৫) বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোনও সখী বা শাশুড়ী-ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বড়ায়ি ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধন করেন নাই। (৬) শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা নহেন। (৭) বড়ুচণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোন সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। (৮) বড়ুচণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম-অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চারিস্থলে পিরীতি শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৯) বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণ-অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। (১০) শ্রীকৃষ্ণকীতনে রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নহেন। (১১) অধিকন্তু বড়ুচণ্ডীদাসের নিকটে ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলিব কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ুচণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের তাহাতে সন্দেহ থাকে না।"[১] শ্রীযুক্ত শহীদুল্লার ধারণা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসই দুইজন—দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। "দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করিয়াছেন, যেমন বড়ুচণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই রচনা করেন না'ই। দীন, দ্বিজ চণ্ডীদাসের মধ্যে এই পার্থক্য তাঁহাদের রচিত পদগুলি সম্বন্ধে একটি দিগ্দর্শনীর কাজ করিবে।"[২]

অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'বড়ু' এবং 'দীন' এই দুই চণ্ডীদাসকে স্বীকার করেন। ইহারা যথাক্রমে চৈতন্যদেবের পূর্বে ও পরে আবির্ভূত, 'বড়ু' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ও 'দীন' পদাবলীর কবি। মণীন্দ্রবাবু মনে করেন—দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীই কোন কোন পুথিতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়াছে মাত্র। মণীন্দ্রবাবুর সুস্পষ্ট ধারণা—"মহাপ্রভু বড়ুচণ্ডীদাসের পদই আস্বাদন করিতেন।"[৩]

১ পৃঃ ৩৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৬০

২ পৃঃ ৪৯ ঐ ৩ পৃঃ ১৯০ বাঙ্গালা সাহিত্য ১ম খণ্ড

যিনি আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অশ্লীল বলিয়া বর্জন কবিবেন, ইহা মণীন্দ্রবাবুর মতে সম্ভব নহে; বরং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাকৃত ভাবকে অ-প্রাকৃত করিয়া উপভোগ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। মণীন্দ্র বসুর ন্যায় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও চৈতন্য-পরবর্তী দীন ও দ্বিজকে এক চণ্ডীদাস বলিয়া মনে করেন। তিনি বর্ধমানের বনপাশ গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাসেব এক পুথিতে নূতন কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ পদ পান এবং অনুমান করেন যে—দীন চণ্ডীদাস উৎকৃষ্ট কবি; উৎকৃষ্ট দ্বিজ-চণ্ডীদাসী পদগুলি হয়ত দীন চণ্ডীদাসেরই রচনা; ঐগুলিকে দীন চণ্ডীদাসী আখ্যায়িকা কাব্যের পদেব ফাঁকে ফাঁকে বসাইয়া দিলে বেমানান হয় না। ফলে দীন ও দ্বিজ এক চণ্ডীদাস হইয়া যায়।

চণ্ডীদাসগণের সংখ্যা-নির্ণযে শ্রীযুক্ত সুকুমাব সেন চরমপন্থী। তিনি একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসকেই স্বীকাব কবেন এবং পদাবলীব চণ্ডীদাসেব অস্তিত্বেই সন্দেহ পোষণ করেন। "১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে সঙ্কলিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীব 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসেব কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই।"[১] তৎকালে পদাবলী-বচয়িতা চণ্ডীদাসেব অস্তিত্ব-হীনতাই ইহার সম্ভাব্য কাবণ। অন্ততঃপক্ষে তৎকালে চণ্ডীদাসেব পদাবলী জন-সমাজে প্রচলিত হয় নাই। সুকুমার বাবুর ধারণা—"সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাবম্ভ হইতে বাঙ্গালা দেশে চণ্ডীদাসের নাম ও মাহাত্ম্য বিশেষ করিয়া প্রচার কবা হয়, ইহাব জন্য তান্ত্রিক নিবন্ধকেরাই দায়ী।"[২] "চণ্ডীদাস ফ্যাশন প্রবর্তিত হওয়ায় শুধু যে চণ্ডীদাস ভণিতায় নূতন পদ রচিত হইতে লাগিল এমন নহে, পুবাতন কবিদিগেব উৎকৃষ্ট পদগুলি চণ্ডীদাস-ভণিতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য কীর্তনীয়ারাই বেশী। এই কারণেই নরহরি সরকার, লোচন দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, নিত্যানন্দ দাস, রামগোপাল দাস ইত্যাদি কবির ভাল ভাল পদ পরবর্তীকালে পুথিতে ও কীর্তনীয়ার মুখে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।"[৩] লক্ষ্য করিতে

১ পৃ: ১২৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সং)

২ ঐ

৩ পৃ: ১২৬ ঐ

হইবে, কেবল সুকুমারবাবু নহেন, বৈষ্ণবপদাবলী-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ও প্রচার করিয়াছেন—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলি কাহারও লেখা নহে, এগুলি জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায় শেখর প্রভৃতির রচনা এবং কীর্তন-গায়কগণ ভণিতা বদলাইয়া চণ্ডীদাসের নাম দিয়াছেন।)

চণ্ডীদাস-সমস্যার আলোচনায় কিন্তু শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের মত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার ধারণা—কবি চণ্ডীদাস এক, দুই বা তিন নহে, বহু। এক যুগে প্রসিদ্ধ কবির এই বিশেষ নাম পরবর্তী যুগে সাধারণ উপাধিতে পরিণত হওয়ার ফলেই এই বহুত্ব সম্ভব হইয়াছে। অনন্ত বা বড়ু, দ্বিজ, দীন, রসিক, দীনক্ষীণ, তরুণী-রমণ প্রভৃতি কবিগণের চণ্ডীদাস উপাধি দেখিয়া চণ্ডীদাস-নামক আদি কবিটিকে অস্বীকার করা সঙ্গত নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের নামেই প্রমাণ যে চণ্ডীদাস তাঁহার নাম নহে, উপাধিমাত্র, এবং তৎপূর্বে চণ্ডীদাস নামক একজন বিখ্যাত কবিই বর্তমান ছিলেন। বিমানবাবুর ধারণা—বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং প্রকৃত চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব কবি। এই মূল চণ্ডীদাস পদকার। ইহার পদে চৈতন্য-প্রভাব সম্ভব নহে। প্রচলিত পদ-সংগ্রহ পুথিগুলির মধ্যে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যেই এই চণ্ডীদাসের কিছু কিছু পদ প্রচ্ছন্ন আছে। এই পদকে চিনিবার উপায়ও আছে। "প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের পদে কোথাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা নাই, রাধা কৃষ্ণকে ভজন করেন, এরূপ ইঙ্গিতও নাই।"[১] "ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদনজ্বালা নাই।"[২] "প্রত্যেকটি ভণিতায় নায়িকার ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোথাও বা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা তিরস্কার করা হইয়াছে, কোথাও বা নায়িকার চাতুরীকে প্রশংসা করা হইয়াছে।"[৩] পদগুলি 'উজ্জ্বল নীলমণি'র দৃষ্টান্ত নহে। 'ক্ষণদা গীত চিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের কোনো পদ নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু এই গ্রন্থ রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলা-বিষয়ক পদ-সংগ্রহ। চণ্ডীদাস প্রধানতঃ আক্ষেপানুরাগের কবি, এই প্রকার পদ নিত্যলীলার পক্ষে অসঙ্গত, সেইজন্য পদসংগ্রহকর্তা চণ্ডীদাসের পদ বাদ দিয়াছিলেন। এই বাদ দেওয়ার জন্য চণ্ডীদাসের

১ ভূমিকা পৃঃ ৫০ চণ্ডীদাসের পদাবলী ২ ভূমিকা পৃঃ ৫১ ঐ

৩ পৃঃ ৫০ ঐ.

অস্তিত্বকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিমানবাবু একুশখানি প্রাচীন পুথি এবং পাঁচখানি মুদ্রিত চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থ অবলম্বনে ১২০টি পদ চৈতন্ত-পূর্ব মূল চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। এইগুলির ভাষা আধুনিক সন্দেহ নাই, তবে ভাবে যে উল্লিখিত লক্ষণগুলি বজায় আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এইখানে বলা যাইতে পারে, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-আস্বাদিত পদের নমুনারূপে নিম্নের চারিচরণ উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়—

হায় হায় প্রাণসখি কিনা হৈল মোরে।
কাহ্নু প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে॥
রাত্রিদিন পোড়ে প্রাণ সোয়াস্থ্য না পাঙ্।
যাঁহা গেলে কাহ্নু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ॥

—এটি নিঃসন্দেহে চৈতন্য-পূর্ব যুগের একটি চণ্ডীদাসীয় পদের অংশ। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে এই পদ দেখা যায় না; সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, এটি সম্ভবতঃ বড়ু চণ্ডীদাসেরই একটি স্বতন্ত্র রচনা। কিন্তু এই অনুমান যে অসঙ্গত, তাহার প্রমাণ—পদের 'প্রাণসখি' শব্দ। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা কখনই বড়াই ছাড়া কোন সখীকে স্বীকার করে না, বৃদ্ধা বড়াই তাহার 'প্রাণসখী' হইতে পারে না (শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পঞ্চম যুক্তি দ্রষ্টব্য)। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয়—বড়ু ছাড়াও একজন প্রেমের কবি চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্বযুগে ছিলেন, এই পদাংশটি তাঁহারই রচনা। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন কিছু দিন হইল উল্লিখিত চারিচরণের সহিত চণ্ডীদাস-ভণিতা যুক্ত অবশিষ্ট আরও ছয়টি চরণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পদে উল্লিখিত চারি চরণের পরে আছে—

হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরি হৈল কালা॥
অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস বলে ধনি এমতি না বল॥

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে সম্পূর্ণ পদটি বীরভূম জেলার

মুড়ামাউ গ্রামের বঙ্কদাস কীর্তনীয়ার বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছে; তথাপি নলিনীকান্ত ভট্টশালী হরেকৃষ্ণবাবুর এই আবিষ্কারকে 'সন্দেহজনক' ও 'সঙ্কট-ত্রাণ আবিষ্কার' বলিয়া কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। হরেকৃষ্ণবাবুর আবিষ্কার অকৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত হইলে বিমানবাবুর মত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান এ-পর্যন্ত হয় নাই, এবং অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নানাকারণে বঙ্গদেশে প্রকৃত প্রাচীন পুথি সুদুর্লভ। যতদিন না প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ চণ্ডীদাস-পদাবলীর অকৃত্রিম প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইতেছে, ততদিন চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় আনুমানিক থিয়োরির ও পণ্ডিতী বিতণ্ডার যথার্থ পরিসমাপ্তি আশা করা চলে না।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঁচালী*

জন-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার সর্বজনীনতা। সেদিক দিয়া পূর্বে-আলোচিত ধামালী-কাব্যকে শ্রেষ্ঠ জন-সাহিত্য বলা চলে না। ধামালী-কাব্য পল্লীসাহিত্যই বটে এবং কোন ধর্মসম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগতও নহে, তথাপি তাহা সর্বসাধারণের আস্বাদ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ধামালী-কাব্য অবৈধ রসের রসিক একশ্রেণীর তরুণের সাহিত্য। অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাহা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের পক্ষে বিরক্তিকর এবং অপরিণতমতি কিশোর-কিশোরীর সর্বনাশকারী। ভ্রাতা-ভগিনী বা পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে লইয়া একত্র ধামালী-কাব্য শ্রবণ কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সেকালে বাংলার পল্লীবাসী

---

*কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বেই জ্ঞাতব্য যে—কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন প্রাচীন পুথি এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্তমানে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার কতটুকু কৃত্তিবাসের রচনা বলা কঠিন। উহার মধ্যে সম্ভবতঃ বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে। সেইজন্য কেহ কেহ মনে করেন—যতদিন না খাঁটি কৃত্তিবাসী পুথি আবিষ্কৃত হইতেছে, ততদিন কৃত্তিবাসী রামায়ণের আলোচনা নিষ্ফল। বলা বাহুল্য, সাহিত্যজগতে এই মতের কোনই মূল্য নাই। ব্যক্তি-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই মত প্রযোজ্য, কিন্তু প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য সত্যকার ব্যক্তি-সাহিত্য নহে, প্রধানতঃ জন সাহিত্য। জন-সাহিত্যের অধিকাংশই জনগণের রচনা হইয়া থাকে। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্য দুইটিও কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নহে, এমন কি এক যুগেরও সৃষ্টি নহে। তথাপি ব্যবহারিক সুবিধার জন্য রামায়ণকে বাল্মীকি-রচিত ও মহাভারতকে ব্যাস-রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতের ক্ষেত্রেও ঐরূপ কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ধরিয়া লইতে হইবে। আদি ও অকৃত্রিম বাল্মীকি ও ব্যাসের রচনা কবে আবিষ্কৃত হইবে, সেই আশায় বর্তমান সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের সাহিত্যিক আলোচনা স্থগিত বা পরিত্যক্ত হয় নাই। ভাবতে কবির মূল্য অপেক্ষা কাব্যের মূল্যই অধিক। রামায়ণ ও মহাভারতের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যাঁহারা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষার আধুনিকতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন এবং ভাষার নজিরে সাহিত্যকে প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাঁহাদের জানা উচিত —মৃত-কাব্যই প্রাচীন ভাষার শবাধারে অপরিবর্তিত 'মমি' হইয়া বিদ্যমান থাকে; কিন্তু যে সকল কাব্য পাঠকজীবনের সহচর হইয়া বাঁচিয়া আছে, যুগে যুগে তাহাদের ভাষা-কলেবর পরিবর্তিত হয়। ভাষা দেখিয়াই কাব্যকে অর্বাচীন বলা অযৌক্তিক।

তাহা নহে, ভাষালালিত্যে ছন্দোঝঙ্কারে উহা দ্বিতীয় বৈষ্ণব পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য—বারমাস্যার ন্যায় রামায়ণে জনপ্রিয় 'রায়বার' বর্ণনার সমাবেশ। কৌতুককর রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি বা বাদ-প্রতিবাদ হইতেছে রায়বারের বৈশিষ্ট্য। রামায়ণের বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া রায়বার রচনা দেখা যায়। অঙ্গদ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ এমনকি কালনেমি ও শূর্পণখারও রায়বার রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অঙ্গদ রায়বারই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ফকির রাম, খোসাল শর্মা, বামনারায়ণ প্রভৃতি কবি অঙ্গদ রায়বারের মধ্যে রামায়ণ-কথাকে জোরালো করিবার জন্য হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

অঙ্গদকো অঙ্গ দেখি সব রাথস পাতিল মায়া।
শত শত রাঙণ হোকে বয়ঠে ধরকে অদ্ভুত কায়া॥
অঙ্গদবীর জো অঙ্গ তাকায়ে সবকোই রাঙণ ঝুণ্ড।
সব কোই বিশ হাত বিশারদ বিসস্ত নয়ন দশমুণ্ড॥

--ফকির রাম

লঙ্কা মোস্কা দেক্কে অঙ্গদ পালটু ফিরকে আয়ে।
মগন হোকে নাচে অঙ্গদ রামকা দরশন পায়ে॥
বীরাসনমে বৈঠে প্রভুজি সামনে গাণ্ডি বাণ।
দক্ষিণ তরফমে ভাই লছমন বামে জাম্ববান॥

—খোসাল শর্মা

হিন্দী ব্যবহারের জন্য খোসাল শর্মার রায়বার "খোট্টা রায়বার" নামে পরিচিত। অন্যান্য রায়বারে কিন্তু হিন্দীর সংস্পর্শ নাই। যথা—
কালনেমির রায়বার—

(বায় দেখ) ঘর পোড়াটা মরুক বেটা মায়া পাত গা তুমি।
সরোবরে স্নান করিতে যাবে কুম্ভিরিণী;
(ছলা করে) পাঠায়ে দিবে হুঁশার হবে (কি) কইব তোমার কাছে।
দেখছি ভালে তোর কপালে রাজপাট্টা আছে॥

—কাশীনাথ

কুম্ভকর্ণের রায়বার—

কুম্ভকর্ণ বলে তারা থাকে কোন ঠাঁই।
রাবণ বলে ঘর দ্বার তার বাপের কালে নাই॥
কুম্ভকর্ণ বলে তারা ব্রহ্মচর্য করে।
রাবণ বলে সে নয় তারা রক্ত বস্ত্র পরে॥
কুম্ভকর্ণ বলে তবে কোনো রাজার বেটা।
রাবণ বলে সে নয় তার মাথায় আছে জটা॥

—কবিচন্দ্র

শূর্পণখার রায়বার—

(মাগি তখন)	মোহিনী হল্য	রূপ ধরিল	মোহিতে রামের মন।
	রূপের ছান্দে	মণি চন্দ্রে	আলো করিল বন॥···
(মোর)	বাসনা গেছে	বসিতে কাছে	হইব তোমার নারি।
	চান্দ মুখখানি	দিন রজনী	দেখিব নয়ান ভরি॥

—অজ্ঞাত কবি

এইরূপ বহু কবির রচনা স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গে লীন হইয়া গিয়াছে—ইহাই অনেকের ধারণা। তবে কৃত্তিবাসী প্রাচীন পুথির আবিষ্কার না হইলে এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ সম্ভব নহে। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, মূল কৃত্তিবাসে তরণীসেন প্রভৃতির রামভক্তির কাহিনী এবং রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ব্যাপার ছিল না, এগুলি বৈষ্ণব-শাক্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। ইহাও অনুমান মাত্র। যাঁহারা কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীগুলির মূল উৎস সন্ধান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মণীন্দ্রমোহন বসু ও পূর্ণচন্দ্র দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে গুণরাজ খান বা মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ইহারাই বাঙ্গালীর অনুবাদ-শক্তির প্রথম সফলতার নিদর্শন। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর এই প্রথম অনুবাদ-কীর্তিকে কেহ কেহ কৃত্রিম ফরমায়েসী প্রচেষ্টা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন,—বাংলা রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত নাকি মুসলমানী উৎসাহে ও সুলতানী কৃপায় উদ্ভূত। "মুসলমান সম্রাট ও সম্রান্ত ব্যক্তিদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল।...হিন্দুদের ধর্ম আচার ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদেব পরম কৌতূহল হইল...গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।"[১] শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনও লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী পণ্ডিত কবির সম্মাননা গৌড়ের দরবারের বিশিষ্ট রীতি হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের একটি প্রধান উৎস খুঁজিতে হইবে গৌড়ের রাজদরবারে।"[২] কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন কারণ নাই। বলদর্পী বিজয়ী জাতি কখনও পরাজিত জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারে না। বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার দিনে বহুদেববাদী পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্ম-গ্রন্থ একেশ্বরবাদী মুসলমানের কাছে আদরণীয় হইবে—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহার উপর বিধর্মী সুলতান হিন্দুর কাব্য নহে, নাটক নহে, এমনকি স্মৃতি-শাস্ত্র বা চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে, একেবারে তাহার ধর্ম-গ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন—ইহা অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক। ভুলিলে চলিবে না—পাঠান-বিজয়ের বহু পরে মোঘল আমলে যখন হিন্দুমুসলমানে সম্প্রীতি দেখা গিয়াছিল এবং হিন্দু রাজকুমারীরা মোঘল হারেমে পত্নীত্বের অধিকার পাইয়াছিল, সেই কালেও হিন্দুর উদারতম ধর্মশাস্ত্র উপনিষদকে ফারসী ভাষায়

১ পৃঃ ১১৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

২ পৃঃ ৬৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় সং

অনুবাদ[১] করার অপরাধে সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারাশিকোহ্ মুসলমান-সমাজে 'কাফের' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং 'কাফের' হওয়ার অজুহাতেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।[২] এইরূপ ক্ষেত্রে গোঁড়া পাঠান সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ্[৩] অথবা অন্য কোন সুলতান মালাধর ও কৃত্তিবাসকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাছাড়া কবিদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক যদি প্রকৃত সুলতান হইতেন, তাহা হইলে মালাধরের ভাগ্যে কেবল একটি সামান্য উপাধি (গুণরাজ খান) ও কৃত্তিবাসের ভাগ্যে একটি 'পাটের পাছড়া' (উত্তরীয়) মাত্র জুটিত না। খেতাবের সহিত প্রচুর ভূসম্পত্তিও লাভ হইত, এবং তবেই সুলতানী মর্যাদা রক্ষা পাইত। কবিদ্বয় কোন হিন্দু জমিদারের উৎসাহ পাইয়াছিলেন, ইহা হওয়াই সম্ভব। তবে ভারতবর্ষ অতিশয়োক্তির দেশ, এ-দেশের কবির কল্পনায় ভূম্যধিকারিমাত্রই 'আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর', 'মহারাজাধিরাজ', এবং সুলতান মাত্রই—'দি-ইন্ দুনিয়ার মালিক'। এরূপক্ষেত্রে উৎসাহদাতা গ্রাম্য জমিদারও যে গৌড়েশ্বররূপে বর্ণিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি! উৎসাহদাতা 'গৌড়েশ্বরের' নাম সর্বসাধারণের কাছে উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই কবিদ্বয় উহা প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুশাস্ত্রানুবাদের তাগিদ প্রকৃতপক্ষে বাহির হইতে আসে নাই। বাহিরের প্রেরণায় নহে, সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রয়োজনে স্বাভাবিক-ভাবেই বাঙ্গালীর অনুবাদ-চর্চা হইয়াছে। প্রয়োজন আন্তরিক বলিয়াই বাঙ্গালীর প্রাচীন অনুবাদ-সাহিত্য সজীব ও সত্য বস্তু। ধামালী-কাব্যের প্রতিক্রিয়াতেই প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ ও ভাগবতের বঙ্গীয় কলেবর গ্রহণ সম্ভব

---

১ "In his (Dara's) thirst for pantheistic philosophy he had studied the Hindu Vedanta...with the help of a band of 'Pandits' he had made a Persian version of the Upanishads." P. 271 History of Aurangzeb (Jadunath Sarkar)

২ The pliant theologians in the Emperor's pay signed a decree that Dara deserved death on the ground of infidelity and deviation from Islamic orthodoxy." P. 544 Ibid

৩ সুকুমার সেন ও অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ইনিই মালাধরের উৎসাহদাতা।

হইয়াছে। পাঠান রাজত্বের প্রথম দিকে দেখা যায়, বঙ্গপল্লীর আসর বিভিন্ন প্রকার ইতর ও অশ্লীল ধামালী নাট-গীতের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। এই ধামালী-কাব্য রচিত হইয়াছিল প্রাগার্য জীবনের আদিমতা অবলম্বন করিয়া, এবং সেইজন্য ইহা রস-পরিবেশনচ্ছলে হিন্দুর নৈতিকতা ও দেব-মহাত্ম্যকে ধুলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল; শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ সকলেই হইয়াছিলেন লাঞ্ছিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই প্রমাণ যে গীতা-উদ্গাতা কৃষ্ণ কামুক ধর্মজ্ঞানহীন নিষ্ঠুর নারীধর্ষকরূপে ধামালী-কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছিলেন ও দেবর্ষি নারদ পরিণত হইয়াছিলেন 'বোকা ছাগে'। তাৎকালিক শিব-ধামালীতে মদনভস্মকারী শিবও যে কোচ-রমণীতে আসক্ত বৃদ্ধ লম্পটরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার চিহ্ন থাকিয়া গিয়াছে পরবর্তী মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ও শিবায়নে। জন-কবিগণের এইপ্রকার ইতর রসিকতা ও বিদ্রূপের কশাঘাতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের ধর্ম-শরীর হইয়া উঠিয়াছিল ক্ষতবিক্ষত। আহত ধর্ম-চেতনা সেইজন্য মাথা না তুলিয়া পারে নাই। হিন্দু ভদ্র-সমাজ তাই প্রাকৃত জনসাধারণের সম্মুখে হিন্দু পুরাণের মহিমা ও প্রকৃত রূপ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত অনুবাদের মূলে রহিয়াছে ভদ্রসমাজের সেই আন্তরিক প্রয়োজনবোধ। কৃত্তিবাস ও মালাধর রাজকীয় সম্মানের বা সম্পত্তির কৃত্রিম লোভে নহে, সত্যকার সামাজিক কল্যাণবোধে ও ধর্মীয় প্রয়োজনবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই[১] অনুবাদ করিয়াছিলেন রামায়ণ ও ভাগবত। আদি অনুবাদক কৃত্তিবাস ছিলেন ব্রাহ্মণ, কাজেই 'অনুবাদ-কার্যে ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা'-রূপ দীনেশচন্দ্রের থিয়োরির কোন প্রমাণ হয় না।[২]

---

১ মালাধর বসু স্বীকার করিয়াছেন যে—"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥…
গাহিতে গাহিতে লোক পাইবে নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥

২ অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

—এই অনুবাদ-বিরোধী শ্লোক অর্বাচীন রচনা মাত্র। ইহা শাস্ত্রানুবাদের পূর্বে নহে, পরেই রচিত।

রামায়ণ অনুবাদ ও ভাগবত অনুবাদের পার্থক্য আছে। রামায়ণ অনুবাদেও হিন্দুধর্মের প্রকৃত অভাব দূরীভূত হয় নাই। রামায়ণ করিয়াছে আসলে সাহিত্যিক রসায়ণের বিশোধন-ক্রিয়া। ইহা বঙ্গীয় জনসাধারণকে ধামালী-কাব্যের আদিম মদিরার পরিবর্তে আর্য সংস্কৃতির মধুর আস্বাদ প্রদান করিয়াছে এবং আদিম জনচিত্তের করিয়াছে পরিমার্জনা। কিন্তু ইহাতে সাহিত্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও ধর্মীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই—লাঞ্ছিত দেব-চরিত্রের অঙ্গ-মার্জনা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন যে কৃষ্ণকলঙ্ক প্রচার করিয়াছে, তাহার 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' প্রয়োজন। রামায়ণের দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব সমাজের মনোবেদনা তাই মালাধর বসুর ভাগবত-অনুবাদে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরাভূত কৃষ্ণমহিমা মালাধরের গ্রন্থে আবার বিজয়ী হইয়া অনুবাদ-গ্রন্থের "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নাম করিয়াছে সার্থক।

মালাধরের অনুবাদ সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে, বারোটি স্কন্ধের মধ্যে মাত্র দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ, তাহাও সারানুবাদ মাত্র। যথাসম্ভব সংক্ষেপে কৃষ্ণের জন্ম হইতে তনুত্যাগ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলার সামগ্রিক পরিচয় প্রদানই মালাধরের উদ্দেশ্য। সেইজন্য কবি মূল কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক বিবেচনায় ভাগবতের কয়েকটি উপকাহিনী বাদ দিয়াছেন, দার্শনিক আলোচনারও বর্জন বা সংক্ষেপণ করিয়াছেন, এবং হরিবংশাদি অন্যান্য পুরাণ হইতে অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া কাব্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। ফলে শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইয়া উঠিয়াছে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র কাব্য। সমুদ্রোপম বিশাল ভাগবতের সমগ্র অনুবাদ করিয়া কবি যে তাৎকালিক অশিক্ষিত জনতাকে শুনাইতে বসেন নাই, অথবা মূল ভাগবতের আড়ম্বরপূর্ণ ও অলংকারবহুল পণ্ডিতী বাক্-চাতুর্য ক্ষীণপ্রাণ সাধারণ বাঙ্গালীর উপর চাপাইয়া দেন নাই, এজন্য রসিক-সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে "কাব্যকলা-নৈপুণ্য প্রকাশের অবকাশ থাকিলেও কোন চেষ্টা নাই"[১], এবং "মালাধর প্রধানতঃ ভক্ত—তাঁহার কবিত্ব শক্তি তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে।"[২] কিন্তু এইপ্রকার ধারণা অসম্যক্ বিবেচনার ফল। কেবল

১ পৃঃ ১২৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় সং (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ)—সুকুমার সেন

২ পৃঃ ৫১৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়ের বর্ণনে নহে, বর্জনে ও নির্বাচনে দক্ষতা, পরিমিতিবোধ ও শ্রোতৃ-অনুযায়ী বাক্-সংযমও উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। মূল ভাগবতের ক্লাসিক্যাল আলংকারিকতা যে বাঙ্গালীর রোমান্টিক মনোধর্মের অনুকূল নহে এবং উহার ভারমন্থর ভাষার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিত্ব যে বাঙ্গালী প্রাণোচ্ছলতার পক্ষে অসঙ্গত, তাহা রসিক কবি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি বর্ণনার আক্ষরিক অনুবাদে নহে, প্রধানতঃ কাহিনীপ্রবাহ অব্যাহত রাখিতেই শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভাগবতের এক-একটি শ্লোকের গাঢ়-সন্নিবিষ্ট সমগ্র কারুকার্য বাংলা পয়ারের দুই চরণের মধ্যে ভাষান্তরিত করা শুধু সুকঠিন কেন, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। নিম্নের দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই মালাধরের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে—

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধা তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥ ১০।২০।১৪

[ব্রাহ্মণ-পঠিত না হওয়ায় বেদ যেমন কালহত হয়, তেমনি পথগুলি অসংস্কৃত ও তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় সন্দেহজনক হইয়া পড়িল।]

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার, জম্ব্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ, শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥
১০।৩০।৯

[হে পরার্থে-জাত বৃক্ষরাজি, চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অপর যাহারা যমুনোপকূলে বর্তমান আছে, তোমরা সকলে (কৃষ্ণবিহনে) আত্মরহিতা আমাদিগকে কৃষ্ণের গমনপথ দেখাইয়া দাও।]

—ইহাদের প্রথমটির অনুবাদে মূলার্থ সম্ভবতঃ অর্থ-সৌন্দর্যের জন্যই বিকৃত করা হইয়াছে।

দুইদিকে বন পড়ি পথ আচ্ছাদিল।
বেদ না জানিয়া যেন দ্বিজ নষ্ট হৈল ॥

—ইহাই মালাধরের অনুবাদ। দ্বিতীয়টির অনুবাদ কবি করেন নাই। কারণ মাত্র চৌদ্দটি অক্ষরের দুইটি ক্ষুদ্র পয়ার-চরণের পক্ষে এখানে মূল বর্ণনার গুরুভার দুর্বহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মোটের উপর, ভাগবতের ন্যায় বিশাল ও সুকঠিন কাব্যের অনুবাদে মালাধরের কাছে অত্যধিক আশা করা অসঙ্গত।

সেইজন্ত মালাধরের অনুবাদে যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, তাঁহার কবিত্ব নাই ও তাঁহার রচনা কোনোখানে কবিতা হইয়া উঠে নাই—এরূপ ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। প্রকৃতপক্ষে মালাধর হইতেছেন ভক্ত-কবি এবং তাঁহার কবিতা ভক্তিমূলক। তাঁহার ভক্তি সজীব ও সত্যবস্তু। উহা সকাম নহে, ভোগমুখী নহে, তাহা নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি; তাহার একদিকে জগৎ-বৈরাগ্য, অন্যদিকে সত্যকার কৃষ্ণাসক্তি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সমস্ত কাহিনীর মধ্যে মালাধরের এই শ্রদ্ধা-ভক্তির ফল্গু অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে অনুবাদের নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব নহে, কবির ব্যক্তিগত সজীব সক্রিয় চিত্তই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। রাসলীলার পূর্বে যখন কৃষ্ণ গোপীদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন গোপীদের উত্তরের মধ্যে কেবল ভাগবতকারের ভাব নহে, কবির নিজের জীবনার্তিও প্রকাশ পাইয়াছে—

শিশুকাল হৈতে সেবি তোমার চরণ।
তবু না করিলে দয়া শ্রীমধুসূদন॥······
অণুক্ষণ তোমা বিনা আন নাহি মনে।
জাগিতে ঘুমাতে তোমা দেখিয়ে নয়নে॥ ··
তোমার চরণ চিন্তি ঝাঁপ দিব জলে।
জন্মান্তরে পাই যেন তোমার পদ তলে।

রুক্মিণীর কাছে যখন কৃষ্ণ নিজেকে নির্ধন, নির্গুণ বলিয়া রহস্য করিয়াছেন, তখন মালাধরই রুক্মিণীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

নির্ধন পুরুষ তুমি বল কি কারণে।
তোমা পদরজে কোটি লক্ষ্মীর জনমে॥
নির্গুণ নির্লেপ তুমি সংসারের সার।
লোকহিত কারণে তোমার অবতার॥

মূল ভাগবতে নাই এইরূপ বহু স্থলেও তিনি কৃষ্ণ-বন্দনা করিতে ছাড়েন নাই। মালাধরের যজ্ঞপত্নী ব্রাহ্মণীগণ ভাণ্ডীর বনে কৃষ্ণকে বলিয়াছে—

তুমি স্বামী তুমি পুত্র তুমি বন্ধুজন।
তুমি ইষ্ট তুমি মৈত্র দেব নারায়ণ॥

বলা বাহুল্য, সত্যকার আত্মনিবেদন ও ভক্তিপ্রকাশের জন্য দৃষ্টান্তগুলি কবিতা-ই হইয়া উঠিয়াছে।

মালাধর সত্যকার সৌন্দর্যপ্রিয় কবি ছিলেন বলিয়াই ভাগবতের পূর্ণতায় অনুমাত্র অভাব বা সামান্যতম অসঙ্গতি সহ্য করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণের চারুনাদিনী মুরলীকে ভাগবতকার উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বাঙ্গালী কবির কাছে অসহ্য। মালাধর দেখাইয়াছেন—

বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে॥
যমুনার কূলে যবে বংশী দেই সান। [সান—সংকেত]
ফিরিয়া যমুনা নদী বহয়ে উজান॥
কদম্বের তলে যবে বংশী নাদ দিল।
তা শুনি ময়ূরপক্ষী নাচিতে লাগিল॥

এই ময়ূর হইতেছে কবি-চিত্ত।

অসঙ্গতি-পূরণের অপর প্রচেষ্টা—যশোদা-সম্ভাষণ। ভাগবতে এই ব্যাপার নাই। কিন্তু মাতৃস্নেহের ব্যর্থতা হৃদয়বান বাঙ্গালী সহ্য করিতে পারে না। রামায়ণে বাঙ্গালী কবি বনবাস-প্রত্যাগত রামচন্দ্রকে দিয়া কৈকেয়ী-সম্ভাষণ করাইয়া ছাড়িয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও মালাধর হারামণি কৃষ্ণকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া পুত্র-বিরহিণী যশোদার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়াছেন। অভিমানিনী জননীর উক্তি মালাধরের কবি-শক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—

কেম্‌তে পাসরিলে বাপু সেই বৃন্দাবন।
কেম্‌তে পাসরিলে তুমি গোপগোপীগণ॥
কেম্‌তে পাসরিলে তুমি গোকুল নগরী।
কেম্‌তে পাসরিলে সেই গোবর্দ্ধন গিরি॥
কেম্‌তে পাসরিলে তুমি নদী সে যমুনা।
কেম্‌তে পাসরিলে বাপু আমা দুই জনা॥
এত বলি যশোদা কান্দে কৃষ্ণ করি কোলে॥
সর্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥

এখানেও যে কবির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণকে অলৌকিকরূপে দেখানো হইয়াছে; তাঁহার কার্য-কলাপ অধিকাংশই অতি-লৌকিক। ইনি মুরলীধারী নটবর নহেন, মাধুর্যসর্বস্ব নহেন, ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ও ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের মিলিত বিগ্রহ—

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বনমালা ধরে।
নারায়ণ মূর্তি দেখি দেব গদাধরে॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ মুকুট শোভে শিরে।
গলায় কৌস্তভমণি বলয়া দুই করে॥
সুবর্ণ অঙ্গুরি সাজে গলে বনমালা।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন উদয় ষোল কলা॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র উদ্ধার করিয়াছেন, গিরিগোবর্ধন ধারণ করিয়াছেন, নিমেষ মধ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার জীর্ণ কুটীরকে ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজপুরীতে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন, সুদর্শনচক্রে শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুবধ করিয়াছেন, এমনকি রাসলীলাকালে বাঞ্ছাকল্পতরু রূপে গোপীদিগের কামনা অনুযায়ী নিজেকে বহুগুণিত করিয়াছেন। এই সকল ও অন্যান্য অলৌকিক কাণ্ড ভাগবত হইতে গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অনুবাদক যদি ভক্ত কবি না হইতেন, তাহা হইলে এই সকল ঘটনা বর্ণনার মধ্যে মধ্যে অবিশ্বাস ও উপহাসের তিক্ততা ফুটিয়া উঠিত এবং ঘটনাগুলি বাজিকরের প্রতারণার ন্যায় মনে হইত। কিন্তু কবির গভীর ভক্তির গুণে এইগুলি অপূর্ব গাম্ভীর্যে ও বিশালতায় সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন রাসলীলায়—

যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়েন গদাধর।
এক গোপী এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দর॥
মুকুতার মাঝে যেন শোভিছে প্রবাল।
নীলমণি গাঁথা যেন কনকের মাল॥

কবির গভীর কৃষ্ণভক্তি রাসলীলাকে ইতর হইতে দেয় নাই, আদি রসকেও দাস্যভক্তির মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে—

সরস্বতী গোপরামা রসেতে চতুর।
ধরিয়া প্রভুর পায় পরায় নূপুর॥

আপন নূপুর রাঙ্গা পায়ে পরাইল।
প্রভুর চরণ লৈয়া বুকে আরোপিল ॥

সমগ্র গ্রন্থের অন্তশ্চারিণী এই ভক্তির জন্যই চৈতন্যদেব পরবর্তীকালে কবিপুত্র বসু রামানন্দকে বলিয়াছিলেন—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥

—চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেবের উল্লেখিত চরণটি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে একবার গ্রন্থারম্ভে নির্ঘ্যটন বন্দনায় কবির নিজমুখে ও আর একবার রুক্মিণীহরণের পূর্বে রুক্মিণীদেবীর মুখে (২০২০ পংক্তি) উক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণবিজয় সবপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। ইহাতে পরমতে অসহিষ্ণুতা বা পরধর্মবিদ্বেষ নাই। কৃষ্ণের নিরাকার ব্রহ্মরূপও ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে—"নাহি রূপ, নাহি মূর্তি ব্রহ্ম কলেবর"[১] পরবর্তী যুগের বৈষ্ণবীয় শাক্ত-বিদ্বেষের চিহ্নও ইহাতে নাই। কেবল গোপীদিগের কাত্যায়নী পূজায় নহে, স্যমন্তক মণির জন্য সুড়ঙ্গপথে কৃষ্ণ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় রুক্মিণীকে লইয়া দেবকীদেবীও ইহাতে চণ্ডীপূজা করিয়াছেন—

একমনে চিন্তে দেবী চণ্ডিকা ভবানী।
বিপদনাশিনী দেবী হরের ঘরণী ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
দুর্গতিনাশিনী দেবী বিপদভঞ্জন ॥
পুত্রদান দেহ মোরে আন গোবিন্দাই।
তোমার প্রসাদে শোক-সাগর এড়াই ॥ ২৩২০

১ পংক্তি ৫০৬৭, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, এবং—"নির্লেপ নির্গুণ আমি আনন্দস্বরূপ।
ভক্ত লাগি দেহ ধরি পরমকৌতুক ॥ ৫৫২৮

মালাধরের শিবভক্তিও দ্রষ্টব্য। তিনি কৃষ্ণকে দিয়া বলাইয়াছেন—"যেই হরি সেই হর বলয়ে সংসার"[১]। দেবভক্তির সহিত ব্রাহ্মণভক্তিও ইহাতে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কৃকলাসের কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ যদুবীরগণকে ব্রাহ্মণের ধনাপহরণে মহাপাতক ও কঠোর দণ্ডভোগের কথা বলিয়াছেন। এমনকি কৃষ্ণের বুকে পদাঘাত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভৃগুর উপরেও কবির অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। তিনি দেখাইয়াছেন—কৃষ্ণের নিরভিমানতা, অক্রোধ ও সত্ত্বগুণ পরীক্ষা করিবার জন্যই কৃত্রিম কোপে ব্রাহ্মণ এই নাটকীয় কাণ্ড করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত বহু নীতি-উপদেশ, ধর্মতত্ত্ব, পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকাদির কাহিনী ইহাকে উৎকৃষ্ট পুরাণে পরিণত করিয়াছে। উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর সন্নিবেশের জন্য শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রায় গীতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভক্ত বিচার এবং অবধূতের চতুর্বিংশতি গুরু কাহিনী, বর্ণাশ্রম ধর্মতত্ত্ব, কাম-ক্রোধাদি রিপুজয়ের উপায়, অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের প্রণালী প্রভৃতির আলোচনা ইহাকে অপূর্ব গুরুত্ব দিয়াছে। ভক্তি-সাধকের পক্ষে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। নারায়ণের কিরূপ মূর্তি কেমন করিয়া ধ্যান করিতে হয়, কেমন করিয়া সাধকের চক্ষে ভগবানের অঙ্গ-সকল একে একে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে এবং ভক্তের মন কীভাবে নারায়ণের পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া ও সর্বাঙ্গ অতিক্রম করিয়া শ্রীমুখের হাস্যে গিয়া সমাধিমগ্ন হইয়া যায়, এই সকল গুহ্য সাধন-প্রণালী প্রকাশ করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় আধ্যাত্মিক গুরুর কার্যই করিয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়—ভগবানের অচিন্তনীয় মহাশক্তি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া থাকেন, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ।

---

১ পংক্তি ৪৭৯২

মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামের অধিবাসী মালাধর বসু বঙ্গসাহিত্যের চৈতন্য-পূর্ব কবিগণের অন্যতম। শ্রীসুকুমার সেনের মতে ইনি ১৪৭৩-৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ('গোবিন্দ-বিজয়' মতান্তরে 'গোবিন্দ-মঙ্গল') রচনা করেন। কবি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

কবি কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই এই গৌড়েশ্বরের নামটি গোপন রাখিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, কবির পোষ্টা খুব সম্ভব বর্ধমানের মহারাজা বা অন্য কোন হিন্দু জমিদাব। অতিশয়োক্তিপূর্ণ কবি-প্রশস্তির লক্ষ্যার্থকে উপেক্ষা করিয়া ও বাচ্যার্থের উপর গুরুত্ব দিয়া ঐতিহাসিকগণ ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—এই 'গৌড়েশ্বর' একজন পাঠান সুলতান। দীনেশচন্দ্রের ধারণা—"মালাধর বসু গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ হইতে গুণরাজ খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।"[১] অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—এই গৌড়েশ্বর সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহা (১৪৫৯-১৪৭৪) বলিয়া মনে করি।"[২] "যুসুফ শাহার রাজ্যারম্ভের কবি এক বছর আগে কাব্য রচনা শুরু করিয়াই ভণিতা দিতেছেন—গুণরাজ খান।"[৩] দীনেশচন্দ্রের মতের সমর্থক মণীন্দ্রমোহন বসু এবং সুকুমার বাবুর মতেব সমর্থক শ্রীযুক্ত অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় যে সুপ্রাচীন গ্রন্থ তাহার অন্যতম প্রমাণ—জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের উল্লেখ রহিয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখা যায়, স্বয়ং চৈতন্যদেব এই কাব্যের প্রশংসা করিয়া কবি-পৌত্র রামানন্দ বসুকে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ায় এবং বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র

১ পৃঃ ১৫৫ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং) ২ পৃঃ ১২৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং)
৩ ঐ—পাদটীকা

রূপে আদৃত হওয়ায় বৈষ্ণবসমাজে অবশ্যপাঠ্য ছিল; সেইজন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায় কালেকালে ভাষা-কলেবর পরিবর্তন করিয়াছে। সেই কারণে ইহারও প্রাচীন পুথি দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গসাহিত্যে অসংখ্য কৃষ্ণমঙ্গল রচিত হইয়াছে, কিন্তু কোনো কালেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় অনাদৃত হয় নাই; বরং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বহু অংশ অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলে গৃহীত হইয়াছে। জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তীকালে ইহাতে ভাগবতবিরোধী বহু কাহিনী প্রক্ষিপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানলীলা, নৌকালীলা, ভারখণ্ড প্রভৃতি দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এইগুলি প্রক্ষিপ্ত। এমনকি ইহাতে ভাগবত-বহির্ভূত শ্রীরাধার কথাও প্রবেশ করিয়াছে। কোনো কোনো স্থলে আকস্মিক-ভাবে শ্যামাদাস বলিয়া এক ব্যক্তির ভণিতা দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই শ্যামাদাসই প্রক্ষেপ-কর্তা।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও প্রয়োজনীয় উপাদান গৃহীত হইয়াছে। ইহার দ্বাবিংশ অবতারের বর্ণনা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে এবং পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার দান ও যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের কাহিনী ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে গৃহীত। ইহার যদুবংশ-ধ্বংসের কাহিনী ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ হইতে গৃহীত কাহিনীও আছে। সদ্যপ্রসূত শিশুকৃষ্ণকে নন্দালয়ে লইয়া যাইবার সময় একটি শৃগাল যমুনাপার হইয়া বসুদেবকে পথ দেখাইয়াছিল, কৃষ্ণ বসুদেবের হাত হইতে যমুনাজলে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং যশোদার শিশুকন্যাকে শিলাতে আছাড় মারিবার সময়ে কংসের হস্তচ্যুত হইয়া আকাশে উঠিয়া গোকুলে কংসহন্তা পুরুষের আবির্ভাবের সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিল—এ সকল কথা ভাগবতেও নাই, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশেও নাই; ভবিষ্য পুরাণ হইতেই সম্ভবতঃ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরাধাকে গ্রহণ করা হইয়াছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে। তাছাড়া প্রক্ষিপ্ত দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতির উৎস সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের অংশ দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হারাধন দত্তের সংগৃহীত পুথি অনুসারে

রাধিকানাথ দত্তের দ্বারা প্রথম মুদ্রিত হয়। নন্দলাল বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা-যুক্ত ইহার অপর একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতের কোন কোন শ্লোকের সহিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পয়ারের সাদৃশ্য বর্তমান, তাহার একটি তালিকা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনুসরণে বঙ্গসাহিত্যে ভাগবতের বহু অনুবাদ রচিত হইয়াছে। এইগুলির অধিকাংশেরই নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু চব্বিশ জন অনুবাদকের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', দ্বিজমাধব, গোবিন্দ আচার্য ও কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', দৈবকীনন্দন কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' ও দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' সুবিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে রঘুনাথ, দ্বিজমাধব ও গোবিন্দ আচায শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। অনুবাদক হিসাবে রঘুনাথই সর্বশ্রেষ্ঠ; তিনি যতদূর সম্ভব মূলের শ্লোকার্থ অব্যাহত ও অবিকৃত রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার রচনা সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ়, গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাছাড়া অনেকেই ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন। রঘুনাথ সেক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বারোটি স্কন্ধের অধিকাংশ অধ্যায়ের সারাংশ ভাষান্তরিত করিয়াছেন। রঘুনাথই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রথম প্রচারক। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র দেখাইয়াছেন—ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্" (১১।৫।৩২) শ্লোকের লক্ষ্য যে গৌরাঙ্গদেব, তাহা সর্বপ্রথম জীবগোস্বামী নহে, রঘুনাথই 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'তে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। রঘুনাথ ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকেরা প্রায় সকলেই দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি অ-ভাগবতীয় কৃষ্ণ-লীলার মিশ্রণে ভাগবত অনুবাদ রসায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাছাড়া কেবল বাংলাভাষা নহে, মধ্যে মধ্যে পদরচনায় ব্রজবুলিও ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য গোবিন্দ আচার্যের কাব্যে ব্রজবুলির স্পর্শ নাই। দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিশেষ কবিত্বপূর্ণ। কবিশেখরের গোপালবিজয়ে কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে পুনরাগমন ও গোপগোপীগণের সহিত পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে রাধার দুঃখের 'বারমাস্যা'

বর্ণিত হইয়াছে। মাধব আচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস স্বরচিত 'কৃষ্ণমঙ্গলে' কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বর্ণনায় অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে কৌরবপত্নীদিগকে বিবস্ত্র করিয়া দিয়া আপনার গাত্রদাহ প্রশমিত করিয়াছেন—"নগ্ন হইয়া সভা দিয়া রমণী পালায়।"

মালাধর হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত সাহিত্যের ধারা ঊনবিংশ শতকের দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কেবল কথকতা নহে, কৃষ্ণযাত্রার ভিত্তিও শ্রীমদ্‌ভাগবত। কিন্তু "বঙ্গসাহিত্যে ভাগবতের সবচেয়ে বড় দান—শ্রীকৃষ্ণের বংশীর আহ্বান ও মথুরার আহ্বান।"[১] ইহাকে ভিত্তি করিয়াই পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

---

১ পৃঃ ২১৭ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (তৃতীয়াংশ)—কালিদাস রায়

সপ্তম অধ্যায়

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত

উদ্দেশ্যমূলক প্রচার-সাহিত্যেব প্রবর্তন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রচার-সাহিত্যের মধ্যেই সাহিত্য-সাধনার পুরাতন ধারা প্রথম পরিবর্তিত হয়; উহা ভাবের ক্ষেত্র হইতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বাংলায় প্রচার-সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ—শ্রীচৈতন্যের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তন। চৈতন্য-পূব বঙ্গসাহিত্যের মূলে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের উত্তেজনা ছিল না। প্রশান্ত-চিত্ততাব ফল বলিয়া উহা হইয়াছিল ভাবমূলক রস-সাহিত্য। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণে কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধি বা উদ্দেশ্যমূলকতা দেখা যায না। কবি-কল্পনার আনন্দ পরিবেশনই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। চর্যাপদাবলী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য বটে কিন্তু জিগীষাজাত বা প্রচারধর্মী নহে। সন্ধ্যাভাষায় আত্মগোপনের প্রয়াসই ইহাব প্রচার-বিমুখতাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেই বঙ্গসাহিত্যের জীবনসমস্যামুক্ত প্রশান্তভাবের অবসান ঘটে—তাহাকে নামিয়া আসিতে হয় জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের আবিভাবে সামাজিক বিপ্লব স্মরণীয়। প্রাচীন হিন্দু রীতি ও আদর্শের প্রবল বিরোধিতা করিয়া চৈতন্যধর্ম আবির্ভূত হয়। স্মার্ত-ধর্মের বিধি-নিষেধ ও অনুষ্ঠান-প্রিয়তা এবং হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ইহা প্রবল প্রতিবাদ করে। তৎফলে প্রচলিত ধর্মের সহিত নব্য বৈষ্ণবধর্মেব সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষের জন্যই বৈষ্ণবধর্মে আত্মপ্রচার ও দিগ্বিজয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রচারকার্যের প্রধান অবলম্বন হইতেছে সাহিত্য। বৈষ্ণবেরা সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচারকার্য সুরু করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টাতেই বঙ্গসাহিত্যে প্রচার-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত এই প্রকার সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া রচিত বলিয়া চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত ঠিক রস-সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। রচনায় ইতস্তত কিছু কিছু

কবিত্বের নিদর্শন থাকিলেও মূলতঃ ইহাদিগকে কাব্য বলা সঙ্গত নহে। প্রকৃত কাব্য বাগ্‌যুদ্ধের অনুপযোগী। অপরের মত পরিবর্তন করাইতে হইলে কল্পনার আশ্রয় লইলে চলে না, যুক্তি ও বুদ্ধি-কৌশলেরই প্রয়োজন হয়। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সাহিত্য-রচনার প্রচলিত প্রথা-অনুসারে ইহারা ছন্দোবন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই মাত্র, নচেৎ অন্য কোন দিক দিয়া তাঁহাদের রচনাকে কাব্যশ্রী-মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্পষ্টই দেখা যায়—তাঁহাদের পংক্তির অন্ত্য মিল প্রায়ই কষ্টার্জিত ও অস্বাভাবিক, ভাষা কথ্য গদ্য, বাক্য-বিন্যাস গদ্যোচিত সহজ সরল, দৃষ্টিভঙ্গীও প্রয়োজনাত্মক। গ্রন্থে কাব্যোচিত বক্রোক্তি, তির্যক প্রকাশ-কৌশল অথবা অলংকার-বাহুল্যের পরিচয় নাই; বিষয়বস্তু ভাবাবেগে চালিত নহে, বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির দ্বারাই পরিচালিত। লেখকেরা ভুলিয়া যান নাই যে, প্রচলিত হিন্দুধর্মের ত্রুটি নির্দেশ করিতে হইবে, বিরোধী মতের নিন্দা ও স্বমতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে হইবে। সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের অবসান ও বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠাকে ধ্রুবলক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ উদাসীন নির্লিপ্ত কবি এবং "চৈতন্যচরিতামৃতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই।"[১] কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজও একজন প্রচারক এবং নিতান্ত নিরীহ প্রচারক নহেন। বৃদ্ধ হইলেও তিনি তেজস্বী যোদ্ধা। মুখে যতই নিরভিমান দীনতার[২] ঘোষণা করুন না কেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁহার কিছুমাত্র দৈন্যবোধ, সমদৃষ্টি বা সহিষ্ণুতা নাই। তিনি চৈতন্য-মতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি-মাত্রকেই পাষণ্ডী, দৈত্য ও অসুর বলিয়া প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই—"চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য করি মানি",[৩] চৈতন্য-মত ব্যতীত অন্য মত সবই মিথ্যা বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন[৪], এবং জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীদিগকে

---

১ পৃঃ ৩১৯ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

২ "পুরীষের কীট হইতে মুঞি যে লঘিষ্ঠ।"—চৈঃ চঃ আদি—৫,

৩ ঐ আদি ৮,

৪ "চৈতন্য গোসাঞি যেই কহে সেই মত সার। আর যত মত সেই সব ছারখার॥" ঐ মধ্য.২৫

'অস্পৃশ্য' 'অদৃশ্য' (অদর্শনীয়) ও 'যমদণ্ডী' বলিয়া ঘৃণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—"শ্রীবিগ্রহ না মানে সেই ত পাষণ্ডী। অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥"[১] এমন কি তিনি মুসলমান কাজিকে দিয়া স্বধর্মের নিন্দা করাইয়া কবুল করাইয়াছেন—"আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার-সহ নয়"[২]। চৈতন্য-চরিতামৃতেই বৌদ্ধ, শাঙ্কর ও মাধ্ব সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করিতে বারংবার চেষ্টা করা হইয়াছে।[৩] বস্তুতঃ বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস উভয়েই বুঝিয়াছিলেন—প্রচারক্ষেত্রে আদর্শ বৈষ্ণব 'তৃণাদপি সুনীচ' বা 'তরোরপি সহিষ্ণু' হইতে গেলে ধর্মপ্রচারকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রয়োজনসিদ্ধিব জন্য উভয়কেই সুকৌশলে সাবধানে বুদ্ধির পথেই চলিতে হইয়াছে, কাব্যের রসানন্দের পথ গ্রহণ করিলে তাহাদের প্রচারকার্য সার্থক হইত না।

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত কেবল যে যথার্থ কাব্য হয় নাই, তাহা নহে, সত্যকার জীবনী-গ্রন্থও হয় নাই। "শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যের 'রেনেশাঁস' বা নবজাগরণ ঘটিযাছে", চৈতন্য-সাহিত্যে "বাস্তবজীবনের জয়গান হইযাছে" অথবা "চৈতন্য আবির্ভাবে বাঙ্গালীর মনে ইতিহাস-চেতনার জাগরণ ঘটিযাছে"—এরূপ অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে চৈতন্য-সম্বন্ধে সত্যকার ঐতিহাসিক বহু কাহিনী থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ দুইটির কোনটিকে প্রকৃত চৈতন্য-জীবনী বলা চলে না। বাস্তব জীবনের মূল্য স্বীকার ও উপভোগ জীবনী-সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। ইহাদের মধ্যে সেই মনোভাবেরই একান্ত অভাব। চৈতন্য-ভাগবতে 'ভাগবতত্ব' থাকিলেও 'চৈতন্যত্ব' অপরিস্ফুট এবং চৈতন্য-চরিতামৃতে 'অমৃতাংশ' থাকিলেও 'চরিতাংশ' উপেক্ষিত। দুইটি গ্রন্থেই চৈতন্য-জীবন উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার। চৈতন্য-জীবনের যতটুকু অংশ ধর্মপ্রচারের অনুকূল, কেবল ততটুকুই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত বর্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ধর্মই তাঁহাদের কাছে বড় হইয়াছে। সেইজন্য

১ মধ্য—৬,

২ আদি—১৭

৩ মধ্য—৬ষ্ঠ ও ৯ম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে পাঠকদিগের নানা জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। সংসারজীবনে উপার্জনহীন ভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য কীভাবে সংসার প্রতিপালন করিতেন? তাঁহার অধ্যাত্মচেতনা আকস্মিক না জন্মগত? তাঁহার মনে সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দ্বন্দ্ব ছিল কিনা? জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবৎ-প্রেম তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ হইলে তিনি একাধিকবার বিবাহ করিয়াছিলেন কেন? সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করিয়া তিনি সহায়সম্বলহীনা বিধবা মাতা ও পরিত্যক্তা পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ও শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল কিনা? পরধর্ম-বিদ্বেষী মুসলমান রাজশক্তি কীভাবে তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্য ও সংকীর্তন-মূলক ধর্মপ্রচার সহ্য করিয়াছিল? তাঁহার কাজিদলনের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল? যে চৈতন্য নারী-সম্ভাষণের জন্য ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যই শেষে নিত্যানন্দকে জোর করিয়া বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন কেন? কীভাবে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল? এই প্রকার বহু প্রশ্ন সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পূর্ণ নীরব। প্রকৃত চৈতন্য-জীবনী লিখিতে বসিলে তাঁহারা প্রশ্নগুলির সদুত্তর না দিয়া পারিতেন না।

চৈতন্যভাগবতকার ও চৈতন্যচরিতামৃতকার সত্যকার মানুষ চৈতন্যকে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রচারেই ব্যস্ত হইয়াছেন। “কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা” চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এ-কথার মূল্য তাঁহারা কার্যতঃ স্বীকার করেন নাই। ধর্মান্ধতায় তাঁহাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছিল; তাহা না হইলে বুঝিতে পারিতেন—কেবল ধর্মবীর রূপে নহে, কর্মবীর রূপেও শ্রীচৈতন্য বাংলার যুগন্ধর পুরুষ। শ্রীচৈতন্যের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও কর্মকৌশল, তাঁহার জাতীয়তাবোধ, তাঁহার সংগঠন-শক্তি, উদ্ভাবনী প্রতিভা, সংঘ-পরিচালনা-দক্ষতা, এমন কি দূরদর্শিতা, বৈপ্লবিক চিন্তা প্রভৃতি ব্যবহারিক গুণপনায় বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাসের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের অধিকাংশ কার্যকে তাঁহারা অত্যন্ত স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়—শ্রীচৈতন্য ধর্মপ্রচারের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র পুরীধামে জীবনের শেষাংশ কাটাইয়াছেন অথবা গোস্বামিগণকে স্থায়িভাবে বৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহাতে

বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেবল তীর্থ-প্রীতি ও তীর্থ-উদ্ধারের উদ্দেশ্যই দেখিয়াছেন, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ধর্মপ্রচারে এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবকেন্দ্র ও বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনে শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের আচণ্ডালে প্রেম বিতরণই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশিষ্ট অহিন্দু বাঙ্গালীর এক বিশাল অংশকে মুসলমানধর্মের কবল হইতে রক্ষা করিয়া হিন্দুসমাজকে শক্তিশালী করিবার যে পরিকল্পনা চৈতন্যদেব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহারা কেহই তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। নগর-কীর্তনে হরি হরি বলিয়া নাচিলেই বিষয়াসক্ত জনসাধারণ হঠাৎ ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক হইয়া পড়িবে, ইহা শ্রীচৈতন্যও বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, বিধর্মী রাজশক্তির পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সংঘশক্তির প্রয়োজন এবং নগর-কীর্তনের ভাবোন্মত্ততার দ্বারাই একতা-স্থাপন ও শক্তি-প্রয়োগ সম্ভব। কাজি-দলন বৃত্তান্ত এই সংঘশক্তি প্রয়োগেরই একটি দৃষ্টান্ত। চৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবসমাজের গঠন-কর্তা, নেতা ও পরিচালক রূপে দেখিলে তবেই চৈতন্য-জীবনের বহু অংশ বুঝা যায়। যে-চৈতন্য 'জন-সংঘট্ট' বা জনতা-সঙ্গ সাধারণতঃ এড়াইয়া চলিতেন, সেই-চৈতন্যই রথযাত্রার সময়ে জন-সমুদ্রের সম্মুখে সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত সমবেত কণ্ঠে গগনভেদী হরিনাম সংকীর্তন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। শ্রীচৈতন্যের প্রচার-কৌশল ও সংঘ নেতৃত্বের দিক দিয়াই এই ঘটনার যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব। ধর্ম-জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শের দিক দিয়া চৈতন্যদেবের কার্যকলাপে যে যে অসঙ্গতি দেখা যায়, কর্ম-জীবনের ব্যবহারিক দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায়—তিনি সংঘ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই সেগুলি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা—চৈতন্য-চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যের কর্ম-জীবনই উপেক্ষা করিয়াছেন, সেইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসী রূপেই পরিচিত হইয়া আছেন, তাঁহার কর্মময় জীবন অন্ধকারেই থাকিয়া গিয়াছে। ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য।

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত ভক্তি-প্রচারাত্মক গ্রন্থ বটে কিন্তু ইহাদের প্রচার-পদ্ধতি শাণ্ডিল্য সূত্র, নারদ-ভক্তিসূত্র প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের অনুসারী নহে। ভক্তি প্রচার হইয়াছে পুরাণের ভঙ্গিতে কাহিনীর মধ্য দিয়া। প্রচারিত

ভক্তিরও নূতনত্ব আছে। এই ভক্তি সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক, ইহা আসলে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি ভক্তি বা ব্যক্তি-পূজা। ভুলিলে চলিবে না, স্মার্ত হিন্দুধর্মের সহিত বিবাদে এই ভক্তি-প্রচারের জন্ম। কাজেই ইহার পক্ষে সংকীর্ণ ও অনুদার হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে শিব কালী সূর্য প্রভৃতি যে-কোন ইষ্টমূর্তিকে ঈশ্বররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখাইয়াছেন—শ্রীচৈতন্য স্বয়ং মুরারী গুপ্তকে তদীয় ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রকে পর্যন্ত ভক্তি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য-১৫)। একমাত্র পূজা ও ভক্তির পাত্র হইতেছেন স-পার্ষদ শ্রীচৈতন্য। প্রচার করা হইয়াছে—শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ঈশ্বর এবং পার্ষদগণ সকলেই এক একজন অবতার। অবশ্য একথা সত্য যে, হিন্দুশাস্ত্রে অধ্যাত্মপথের সহায়ক গুরুর মধ্যে ঈশ্বরের যোগশক্তিব অস্তিত্ব স্বীকার করা বা গুরুকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভক্তি করার কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস সেরূপ ভক্তি প্রচার কবেন নাই। বরং বৃন্দাবনদাস অন্যান্য ধর্মগুরুর ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন।[১] বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস উভয়েরই বক্তব্য—শ্রীচৈতন্যকে ধর্মগুরু ভাবিলে ভুল হইবে, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও উপাস্য, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার ও তাহার পার্ষদদের কাযাবলী সমস্তই অলৌকিক লীলা, মানবীয় বুদ্ধি বিচারের ঊর্ধ্বে—"অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্বোধ" (চৈঃ চঃ আদি ১৭)। যাহাবা ইহা বিশ্বাস করিবে না বা তর্ক করিবে, তাহারা নরকে যাইবে—

তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার॥ (চৈঃ চঃ আদি ১৭)

বৃন্দাবন দাস দেখাইযাছেন—জ্ঞানের প্রশংসা করাব অপরাধে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ অদ্বৈতকে চৈতন্যদেব মাটিতে ফেলিয়া প্রহার করিয়াছেন,[২] কিংবা নগর-কীর্তনে বাধা দেওয়ার জন্য তিনি কাজির বাডীতে আগুন দিয়া প্রতিশোধ লইতে বলিয়াছেন।[৩] এ সকলই প্রভুর আনন্দ-লীলা; এ-সকল ঘটনায়

১ উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব। লওয়ায় "ঈশ্বব আমি"—মূলে জরদ্গব॥ চৈঃ ভাঃ মধ্য-২৩

২ পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥ ঐ মধ্য-১৯

৩ প্রভু বলে—অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর॥ পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে। ঐ মধ্য-২৩

মহাপ্রভুর চরিত্র সমালোচনা করার অধিকার কাহারও আছে বলিয়া বৃন্দাবন দাস কল্পনা করিতে পারেন নাই। বৃন্দাবন দাস প্রচার করিতে সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই যে—অদ্বৈত প্রভু যদি সুরাপানে আসক্ত হন, তাহা হইলেও তিনি পূজ্য ও ভক্তির পাত্র।[১] নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধেও এই প্রকার উক্তির প্রচলন আছে।[২] রামানন্দ রায়ের সহিত সাধ্য-সাধন নির্ণয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখাইয়াছেন—জ্ঞান-মিশ্র ভক্তির অপেক্ষা জ্ঞান-শূন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই নির্জ্ঞান ভক্তিরই অপর নাম ব্যক্তি-পূজা। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের প্রচারের ফলেই বাঙ্গালী সমাজে ব্যক্তি-পূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

ভগবত্তা বলিতে জনসাধারণের ধারণা অলৌকিক শক্তিমত্তা। সেইজন্য চৈতন্যভাগবতে ও চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের বহুবিধ অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সাড়ম্বরে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের দ্বারা বরাহ-মূর্তি গ্রহণ, চতুর্ভুজ মূর্তির বা ষড়ভুজ মূর্তির প্রকাশ, সুদর্শনচক্র ব্যবহার, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে সলিলশয্যায় শয়ন, হস্তিযূথ সরাইয়া একা শক্তি-প্রয়োগে জগন্নাথের রথ চালনা—এই প্রকার বহু অতিপ্রাকৃত কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবিশ্বাসী ও নিন্দাকারীর ঐহিক ও পারত্রিক বহুপ্রকার শাস্তির চিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছে। এইভাবে প্রধানতঃ ভীতি-উৎপাদনের সাহায্যে জনসাধারণের মনে চৈতন্য-ভক্তি উদ্রেকের চেষ্টা করা হইয়াছে। তাছাড়া প্রীতি-উৎপাদনের চেষ্টাও হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের অহেতুক করুণা প্রচার করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—চৈতন্যদেব শুধু যে কুষ্ঠরোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি জীব-উদ্ধারে অবতীর্ণ এবং পতিত-পাবন। তিনি নদীয়ার প্রকট লীলায় আচণ্ডাল শূদ্র ও মহাপাপিষ্ঠকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং অপ্রকট নিত্যলীলায় এখনও উদ্ধার করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও উদ্ধার করিবেন।[৩] খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগের প্রচার-পদ্ধতির

১ মদিরা যবনী যদি ধরয়ে অদ্বৈতে॥ তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি। ঐ অন্ত্য-১০

২ যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

৩ অদ্যাপিহ নিত্যলীলা করে গৌর রায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

সহিত বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রচার-পদ্ধতির মোটামুটি সাদৃশ্য আছে।

বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েই ধর্মপ্রচারক বটেন, কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে দেখা যায়—উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও প্রচারভঙ্গীতে পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাস হইতেছেন সাহিত্যিক ও বিশেষ করিয়া কবি। তিনি যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ-প্রয়োগে বিপক্ষকে জয় করিতে চান না। তৎপরিবর্তে নিজের চৈতন্য-ভক্তি অপরের মনে সঞ্চার করিয়া তাহাকে চৈতন্য-ভক্ত করিয়া তুলিতে চাহেন। অপরপক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দার্শনিক পণ্ডিত—তাঁহার ভাবাবেগও অল্প। তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি ব্যাখ্যাগত ও বিশ্লেষণমূলক। তিনি চৈতন্যতত্ত্বকে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, বহু শাস্ত্রপ্রমাণে বিপক্ষমতের ত্রুটি নির্দেশ করেন এবং স্বমতের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনদাস নব্যবৈষ্ণবধর্মের সবল তরুণ যোদ্ধা—প্রতিপক্ষকে উগ্রভাবে আক্রমণ ও নিন্দাবাদ করেন কিন্তু কৃষ্ণদাস হইতেছেন বৃদ্ধ প্রচারক—তিনি প্রতিপক্ষকে উলূক, কাক, ভেক, উষ্ট্র প্রভৃতি উপমায় ব্যঙ্গ করেন, নিন্দা করেন, কিন্তু তাঁহার ভাষায় কোন উগ্রতা নাই।[১] বৃন্দাবনের প্রচার জনসাধারণের জন্য, কৃষ্ণদাসের প্রচার শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজকে লক্ষ্য করিয়া। বৃন্দাবনের আবেদন সাময়িক, তীব্র ও মর্মস্পর্শী কিন্তু কৃষ্ণদাসের আবেদন দূরবিস্তারী ও গভীর ধ্যানের ফল, যদিও তাহা অনুত্তেজক ও অপ্রমত্ত। 'সর্বদেবতার অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ' ইহা বুঝাইতে বৃন্দাবন দাস দেখাইয়াছেন—শিবভক্ত রাবণকে শিব রামের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই, বলরাম-ভক্ত হইয়াও দুর্যোধন কৃষ্ণ-বিরোধিতার জন্য নিহত হইয়াছে এবং কৃষ্ণ-ভক্তেরই শেষ পর্যন্ত জয় হইয়াছে। এক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বুঝাইয়াছেন যে ঐশ্বর্য অনিত্য ও নিকৃষ্ট, সকল দেবতাই ঐশ্বর্যময়, একমাত্র কৃষ্ণই আনন্দময় বা প্রেমময়; সেইজন্য কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। এইভাবে প্রচার-পদ্ধতির পার্থক্য আদ্যন্ত দেখা যায় এবং ইহা হইতে বুঝা যায়, তাৎকালিক প্রচারক হিসাবে বৃন্দাবনদাসই সম্ভবতঃ অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু চিরন্তন প্রচারক হিসাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

---

১ উলূকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ, (১।৩)। অসসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে, (২।৮) অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ, (১।৫)। তা সবার বিজ্ঞাপাঠ ভেক কোলাহল (১।৮)

বৃন্দাবন দাসের কবি-শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে চৈতন্যচিত্র-অঙ্কনে। তাঁহার ভক্তিই কবিত্বের মূল। শ্রীচৈতন্যকে তিনি দেখিয়াছেন ভক্তির ভাব-জগৎ হইতে। তাই তিনি সাধ্যমত সাংসারিক কোন ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে দেখাইতে সাহস করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলায় তাঁহার দুরন্তপনা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি প্রায়ই সাধারণ বালকোচিত নহে, তুচ্ছ নহে—ভাগবতের কৃষ্ণলীলার ভাবে পরিকল্পিত ; সুতরাং অলৌকিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। তিনি সকল সময়ে একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। তিনি মনে-প্রাণে চৈতন্যদাস। চর্মচক্ষে চৈতন্যচন্দ্রকে দেখিতে পান নাই বলিয়া তাঁহার ক্ষোভের সীমা নাই। তিনি মানসচক্ষে শ্রীচৈতন্যের যে রূপ ধ্যান করেন তাহা হইতেছে শৃঙ্গার-বেশ—

জ্যোতির্ময় কনকবিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি হরি বলে শ্রীবদনে॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব-অঙ্গে তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥ মধ্য—২৩

কাহিনীর মধ্যে বৃন্দাবন যখনই সুযোগ পাইয়াছেন—শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা এবং সেই সঙ্গে নিজের ভক্তিকে প্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। চৈতন্যদেব গঙ্গাস্নান করিতেছেন, তাহাতে—

গঙ্গার বাঢ়িল প্রভু পরশে উল্লাস।
আনন্দে করয়ে দেবী তরঙ্গ প্রকাশ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করয়ে জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগ সেবী॥ মধ্য—২

শ্রীচৈতন্যের কাছে কলা-খোলা-বিক্রেতা শ্রীধর বর প্রার্থনা করিতেছে, তাহার প্রার্থনার মধ্যে বৃন্দাবনের কণ্ঠই ধ্বনিত হইয়াছে ; তাহার ভক্তি বৃন্দাবনেরই ভক্তি—

যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সনে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউ তান চরণ যুগল॥ মধ্য—৯

বৃন্দাবন দাসের শ্রীবাস যেভাবে চৈতন্য-সম্ভাষণ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় বৃন্দাবন দাসের মধ্যে লিরিক কবির বৈশিষ্ট্য ছিল। এই রচনাটিকে অনায়াসে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের কবিতা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়—

আজ মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ।
তোমা হেন প্রভু মোর হইল সাক্ষাৎ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হৈল পরকাশ॥
আজি মোর জন্মকর্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার॥
আজি মোর নয়ন ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি যার শ্রীচরণ সেবে রমা॥ মধ্য—১৩

বৃন্দাবন দাসের ঔপন্যাসিক শক্তি চরিত্রাঙ্কন-দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে নিত্যানন্দ চিত্রণে। যদিও বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দকে সঙ্কর্ষণ বলরামের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তথাপি তিনি নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের ন্যায় দূরবর্তী ভাবলোক হইতে দেখেন নাই, সাংসারিক নিকট সম্বন্ধের মধ্য দিয়া দেখিয়াছেন। কাজেই নিত্যানন্দের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে বৃন্দাবন দাস কোন সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তির পাত্র কিন্তু নিত্যানন্দ প্রেমের পাত্র। পিতা যেমন স্নেহহাস্যে পুত্রের দুরন্তপনা উপভোগ করেন, বৃন্দাবন দাস তেমনি নিত্যানন্দের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বা দুর্বলতা অনুভব করেন নাই, বরং অধিকতর রসানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। চৈতন্যভাগবতে যবন হরিদাস অদ্বৈতের কাছে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে ভয়ানক

অভিযোগ করিয়াছেন। এইখানে দেখা যায়, নিত্যানন্দ চরিত্র বিশিষ্ট এবং তাহাতে মানবিকতা সুস্পষ্ট। নিত্যানন্দ—

বরিষায় জাহ্নবীয়ে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে ছাওয়াল দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥
সেই সে করয়ে কর্ম যে যুকত নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে মোরে বিবাহিয়ে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে "মহেশ" বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ তাহা দুহি খায়॥ মধ্য—১৩

বৃন্দাবন দাস দেখাইয়াছেন—স্বয়ং চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে এই প্রকার দুরন্তপনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং শ্রীবাসের বাড়ীতে সংযতভাবে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন—"চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।" ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে 'শ্রীবিষ্ণু' বলিয়া নিরীহ ভালো মানুষটির অভিনয় করিয়াছেন এবং চৈতন্যের উপরেই পাল্টা অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন—

আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মতো তুমি কারো না বাসিবা॥ মধ্য—১১

কিন্তু চৈতন্য চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই নিত্যানন্দের মূর্তি অন্যরূপ—

আনন্দে না জানে বাহ্য কোন কর্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥
জোড়ে জোড়ে লাফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গ বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥…
অহর্নিশ বাল্যভাবে বাহ্য নাহি মানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন পানে॥ মধ্য—১১

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের রস-কোন্দল চৈতন্যভাগবতের একটি বাস্তব ও উপভোগ্য চিত্র—

অদ্বৈত বোলয়ে 'অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন জন তোকে আনিল ডাকিয়া॥

দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্তাইলি কেনে।
'সন্ন্যাসী' বলিয়া তোরে বোলে কোন জনে ॥…
নিত্যানন্দ বোলে "আরে নাঢ়া বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ। পাছে দেখাও প্রতাপ ॥
আরে বুঢ়া বামনা! তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত মত্ত ঠাকুরের ভাই ॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ॥ মধ্য—২৪

বৃন্দাবন দাসের অপর দিক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁহার গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের পরিপূরক। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যার অভাব ছিল, চৈতন্যচরিতামৃতের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। তত্ত্ব-জগতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের দান অতুলনীয়। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্বরূপ দামোদর, মুরারী গুপ্ত, কবি কর্ণপূর, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবসাধকদিগের ধ্যান ও সাধনাজাত জ্ঞানকে মধুকরের মতো আহরণ করিয়া অপূর্ব মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। কেবল বৈষ্ণব-সাহিত্যের নয়, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত। এই গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি নূতন করিয়া জন্মলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মানব-মূর্তি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে স্থলে দেখা গিয়াছে অলৌকিক সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক মূর্তি। চৈতন্যভাগবতে যে সকল প্রশ্নের মোটামুটি সমাধান করা হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামৃতে নূতন করিয়া বিস্তারিত সূক্ষ্মভাবে ও গভীরতর ভাবে আবার তাহাদের আলোচনা ও সমাধান করা হইয়াছে। বৃন্দাবন বলিয়াছেন, ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় গীতার প্রতিজ্ঞা অনুসারে সংকীর্তন প্রচারের দ্বারা ধর্মসংস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস দেখাইলেন "এহো বাহ্য", আরও গূঢ়তর কারণ আছে। বাহ্য প্রয়োজনে নহে, কৃষ্ণের নিজস্ব আনন্দ আস্বাদনের প্রয়োজনেই চৈতন্যরূপে রাধা-দেহে কৃষ্ণের অবতরণ। চরিতামৃতের কৃষ্ণ বলিতেছেন—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম-রস আস্বাদিতে বিবিধ প্রকার ॥

রাধা ভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ আদি—৪

এই রাধা-ভাবের অর্থই সাধক-ভাব। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রধানতঃ ঐশ্বর্যপূর্ণ গুরুভাব বা ঈশ্বরভাব দর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু সে-স্থলে কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের মধ্যে দর্শন করিলেন এবং প্রচার করিলেন প্রধানতঃ মাধুর্যপূর্ণ সাধকভাব। সেইজন্য চৈতন্যচরিতামৃত হইয়া উঠিয়াছে বৈষ্ণবীয় সাধক জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও অধ্যাত্মশাস্ত্র। চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের যে মূর্তি প্রধানভাবে অঙ্কন করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী রাধামূর্তি—

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ আদি—৪

কৃষ্ণদাস দেখাইয়াছেন—রাগানুগা ভক্তির চরমাবস্থা মহাভাব এবং মহাভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশের নাম "মাদন"। এই মাদন-তত্ত্বকে চৈতন্যজীবনে রূপায়িত করিয়া প্রদর্শন কৃষ্ণদাস কবিরাজের অমরকীর্তি। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত মাদনভাবের উৎপাদক তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের প্রতিটিকে মিলাইয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবন গঠন করিয়াছেন। তৎফলে চৈতন্য দেব হইয়া উঠিয়াছেন পূর্ণাঙ্গ ভক্তিতত্ত্বের রূপময় বিগ্রহ। তত্ত্বানুযায়ী জীবন গঠিত হইয়াছে, জীবনানুযায়ী তত্ত্বের প্রকাশ অস্বীকৃত হইয়াছে। এই চৈতন্য-বিগ্রহ ঐতিহাসিকের কাছে কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু যুগে যুগে সাধকের কাছে ইহা পরম আদরণীয় সত্য বস্তু।

দার্শনিক চিন্তার জগতে চৈতন্যচরিতামৃতের দান অল্প নহে। স্পষ্টভাষায় কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম প্রচার করিয়াছেন, ভুক্তির ইচ্ছার ন্যায় মুক্তির ইচ্ছাও বর্জনীয়—"মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান"। চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে পঞ্চম বর্গ বা পুরুষার্থ হইতেছে প্রেম। এই প্রেম কাম নহে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম" এবং এই প্রেম—"বাহে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়" "বিষামৃতে একত্র মিলন"। ইহা কৃষ্ণদাসেরই নূতন বাণী। বৈধী ভক্তি অপেক্ষা অহৈতুকী রাগানুগা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ঐশ্বর্য নহে মাধুর্যই ঈশ্বরের স্বরূপ, "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ"—প্রভৃতি বহু দার্শনিক তত্ত্ব

চৈতন্যচরিতামৃত হইতেই জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তরমূলক বিচারে সাধ্যসাধন তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের ক্রমোন্মেষ-তত্ত্ব রূপ গোস্বামীর 'ভক্তি রসামৃত-সিন্ধু'তে থাকিলেও, তাহার প্রচারের জন্য দায়ী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তত্ত্বের শুধু প্রচার নহে, তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও কৃষ্ণদাস অল্প চেষ্টা করেন নাই। বিনা প্রমাণে কোন তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই—নানা শাস্ত্র হইতে যথোপযুক্ত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রচারিত তত্ত্বকে সমর্থন করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস অন্যূন ৭৫টি সংস্কৃত আকর গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় শাস্ত্রবিচারের প্রবর্তন কৃষ্ণদাসেরই দান। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, কৃষ্ণদাসের শাস্ত্রবিচার নিরপেক্ষ আদর্শ বিচার নহে—তাঁহার বিচার প্রচারকের বিচার, তাঁহার যুক্তি স্বপক্ষ সমর্থনে একদেশদর্শী যুক্তি মাত্র। তিনি যত সহজে অদ্বৈতবাদ, মাধ্বমত ও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন অত সহজে ঐগুলি খণ্ডনীয় নহে। প্রতিপক্ষের মুখে দুর্বল যুক্তি বসাইয়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত বলিয়া প্রচার করিবার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার কৃতিত্ব নহে—তাঁহার কৃতিত্ব চৈতন্য-বাণী ব্যাখ্যায়। চৈতন্যধর্মের ব্যাখ্যাতা হিসাবেই তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন।

[চৈতন্যচরিতামৃতে প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিচয় এই অধ্যায়ের 'পরিশিষ্টে' প্রদত্ত হইল।]

নেপথ্য বার্তা

চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাবলী

মহম্মদীয়, খ্রীষ্টান, বা বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মও প্রবর্তক নিষ্ঠ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম। এই জাতীয় ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ধর্মপ্রবর্তকের ভগবত্তা স্বীকার। বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম এই জাতীয় ধর্মের চূড়ান্ত রূপ। মহম্মদ, খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা প্রতীক মাত্র, কিন্তু শ্রীচৈতন্য পূর্ণ-প্রকাশিত স্বয়ং

ঈশ্বর। এই ভগবত্তা-প্রচারের জন্যই বিশেষ সাম্প্রদায়িক সাহিত্যরূপে বৈষ্ণবীয় চরিতগ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গে সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনা কখনই জাতীয়চেতনায় পরিণত হয় নাই। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি চরিত-গ্রন্থ আসলে গোর্খ-বিজয় প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থেরই সগোত্র। ইহাদিগকে জাতীয় রেনেশাঁস বা নবজীবনের ফল বলা বা জাতীয় কাব্য রূপে দেখার কোনো হেতু নাই।

শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই তাঁহার ভগবত্তা প্রচারিত হইতে থাকে। প্রথম প্রচারক অদ্বৈত আচার্য। ইনি পুরীধামে প্রকাশ্যভাবে সংকীর্তন করিয়াছিলেন—

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥ চৈঃ ভাঃ ৩-১০

চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, একজন ভক্ত বৈষ্ণব স্বরচিত সংস্কৃত নাটকের নান্দীতে পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহকে শ্রীচৈতন্যেরই দারুময় জড়-প্রকৃতি' বলিয়া প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই।[১] চৈতন্য-প্রশস্তিমূলক এই নাটকটি স্বয়ং চৈতন্যদেবকে শুনাইতে কবি নীলাচলে স্বরূপ দামোদরের নিকটে গিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের বিখ্যাত 'অনর্পিত চরীং চিরাৎ' শ্লোকেও শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রচারিত হইতে দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা স্থায়িভাবে প্রচারের জন্য চৈতন্য-মাহাত্ম্য-বিষয়ক বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই চৈতন্য পার্ষদ মুরারী গুপ্ত 'কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' কাব্য, কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেন 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং স্বরূপ দামোদর চৈতন্যবন্দনা বা কড়চা রচনা করেন। এইগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের ধারণা—ভগবত্তা প্রচারে চৈতন্যদেবের সম্মতি ছিল না, "তিনি নিজের প্রশংসা সহ্য করিতেন না।"[২] কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। চৈতন্যদেবের সত্যকার সমর্থন বা প্রশ্রয় না পাইলে তাঁহার পার্ষদবর্গ তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ করিতে সাহস করিতেন না। বলা

১ বিকচকমল নেত্রে শ্রীজগন্নাথ সংজ্ঞে কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতি জড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫

২ পৃঃ ৩১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম সং)

বাহুল্য, অহমিকার জন্ম নহে, ধর্মপ্রচার ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার জন্যই চৈতন্যদেব এই প্রচারে মৌন সম্মতি দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাহার পার্ষদ ও ভক্তগণ সম্বন্ধে বহুগ্রন্থই রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িকস্বার্থে যেগুলি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়াছিল সেইগুলিই রক্ষিত হয়। চৈতন্য-বিষয়ক সংরক্ষিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান গ্রন্থগুলি হইতেছে—বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, চূড়ামনি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়, গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল।

নিত্যানন্দের উৎসাহে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' বাংলায় লেখা প্রাচীনতম চৈতন্যমাহাত্ম্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানির নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল', পরে কবি কর্ণপূর[১] ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি মোহন্তগণ বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়া বর্ণনা করায় গ্রন্থখানির নাম হয় 'চৈতন্যভাগবত'। এ সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে' বলা হইয়াছে—

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥

কেহ কেহ বলেন—বৃন্দাবনের কাব্যের মতো লোচন দাসের কাব্যের নামও 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল ; সেইজন্য বৃন্দাবনের নাতা নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয়া 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল জানা যায় নাই। সুকুমার সেনের মতে "আনুমানিক ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।"[২]

আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডে যথাক্রমে পনের, সাতাশ ও দশ অধ্যায়ে চৈতন্য-ভাগবত রচিত। আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের গয়া হইতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত, মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত ও অন্ত্যখণ্ডে নীলাচলে গুণ্ডিচাযাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করেন নাই। অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী দেনুড়ে একটি পুথিতে অন্ত্যখণ্ডের অতিরিক্ত তিন অধ্যায় পাইয়া উহাকে

১ "বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাস বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্যতস্তং সমাবিশৎ॥" গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

২ পৃঃ ৩২০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং)

চৈতন্যভাগবতেরই অংশ বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে যে ঐগুলি কৃত্রিম ও অর্বাচীন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাংলায় চৈতন্য-মাহাত্ম্য-গ্রন্থাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণিত না থাকায় গোস্বামিগণের নির্দেশে কৃষ্ণদাস তাঁহাব গ্রন্থে অন্ত্যলীলাসমেত সমগ্র চৈতন্যলীলা প্রকাশ করেন। 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাসের জন্ম ১৪৯৬ ও মৃত্যু ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে। চৈতন্যচরিতামৃতেরও রচনাকাল অজ্ঞাত। সুকুমাব সেন অনুমান করিয়াছেন—"১৫৬০-৮০ খ্রীষ্টাব্দ রচনাকালের সীমা ধরিলে অন্যায় হইবে না"।[১]

কৃষ্ণদাসের কাব্যেরও আদি, মধ্য, অন্ত্য তিনটি লীলা; আদিতে সতেরো, মধ্যে পঁচিশ ও অন্ত্যে কুড়ি পরিচ্ছেদে কাব্য বচিত। প্রতি লীলার শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের সূচী-তালিকা নির্দেশ চৈতন্যচরিতামৃতের বৈশিষ্ট্য। আদি-লীলায় মহাপ্রভুর বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাহিনী, মধ্যলীলায় তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে নীলাচলে অবস্থান এবং অন্ত্যলীলায় তাঁহার শেষ জীবন বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃত বৃন্দাবনে রচিত হয় এবং প্রচারার্থে শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়। পথে বনবিষ্ণুপুরে দস্যুদল ভ্রমক্রমে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতও লুণ্ঠন করিয়া লয়। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দে লিখিত আছে যে পুস্তক লুণ্ঠনের সংবাদে কৃষ্ণদাস শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন ও তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পরে অবশ্য শ্রীনিবাসের চেষ্টায় গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের ধারণা—"এই কাহিনী সমর্থন-যোগ্য নয়।"[২]

চৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গসাহিত্যে প্রথম 'গেয়' নহে, 'পাঠ্য' গ্রন্থ। ইহা বৈষ্ণব সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ এবং সর্ব-শাস্ত্র-সার-সংগ্রহ গ্রন্থ। সপ্তদশ শতকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার একটি সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চূড়ামণি দাসের একটি খণ্ডিত চৈতন্য-মাহাত্ম্য

---

১ পৃঃ ৩৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (২য় সং)

২ পৃঃ ৩৪৮ ঐ

কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার ইতিহাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'ভুবনমঙ্গল' নামে ইহাকে পরিচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশের সময়ে নাম দেন 'গৌরাঙ্গবিজয়'। সুকুমারবাবুর ধারণা—"১৫৪২ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গৌরাঙ্গবিজয় রচিত হইয়া থাকিবে।"[১] অবশ্য পুথিখানি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে লেখা।

চূড়ামণির কাব্যে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ নাই, আছে 'নাচাড়ি' ও 'শিকলি' অর্থাৎ দীর্ঘ ত্রিপদী ও পয়ার। তন্মধ্যে পয়ার ছত্রই সংখ্যায় বেশী।

চূড়ামণি নিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশেই গ্রন্থ রচনা করেন।

'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থে চৈতন্যদেব, মাধবেন্দ্রপুরী ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন কথা বলা হইয়াছে। ঝারিখণ্ডে মাধবেন্দ্রপুরীর তপস্যা, শান্তিপুরে নবদ্বীপে মাধবেন্দ্রের আগমন, শিশু-চৈতন্যকে দর্শন, এবং নিত্যানন্দের পিতৃগৃহের ও বাল্যজীবনের কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যের বাল্যক্রীড়ার কথা, তাঁহার গৃহের বর্ণনা, তাঁহার সহিত নিত্যানন্দের পত্র-ব্যবহার, নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-যাত্রা, গৌরাঙ্গ-মিলন ও নবদ্বীপ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন, গঙ্গাহরি পণ্ডিতের ছাত্রত্ব, ও পরে একজন অতিথি সন্ন্যাসীর সহিত নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যাওয়া প্রভৃতি নূতন নূতন সংবাদ দেখা যায় গৌরাঙ্গবিজয়ে।

চূড়ামণি দাসের কাব্যে কোন তত্ত্বকথা নাই, মহাপ্রভুর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের বর্ণনা নাই, কবি স্বাভাবিক বিশ্বাসে মহাপ্রভুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। গৌরাঙ্গবিজয়ে অঙ্কিত আখণ্ডল আচার্যের চিত্র রিয়ালিস্টিক ও উপাদেয়।

'গোবিন্দদাসের কড়চা' হইতেছে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী গোবিন্দ কর্মকারের স্মৃতিলিপি। ইহার বর্ণনীয় বিষয় চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-বিজয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত-বংশীয় জয়গোপাল গোস্বামী এই কড়চাখানি প্রকাশ করেন। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ-প্রকাশে বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] [illegible] পড়িয়া যায়। কারণ এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর [illegible] উহার

---

১ [illegible] সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ([illegible])

বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের শক্তির সীমাবদ্ধতা দেখানো হইয়াছে—হাজিপুরে কেশব সামন্তকে ভক্তি প্রদানের চেষ্টা সার্থক হয় নাই। তাছাড়া তাঁহার অসাম্প্রদায়িক দেব-দেবীভক্তিও দেখানো হইয়াছে, "না করিবে অন্যদেব নিন্দন বন্দন"—এই নীতি রক্ষিত হয় নাই। বলা বাহুল্য ইহাতে চৈতন্যদেবের মানবিক মহত্ত্ব বর্ধিত হইলেও তাঁহার ভগবত্তা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে, বৈষ্ণবধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠতাও প্রমাণিত হয় নাই। সেইজন্য এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। ১৩৪২ সালে প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য' গ্রন্থে মৃণালকান্তি ঘোষ খোলাখুলিভাবেই বলেন—'কড়চার সবটাই জয়গোপাল গোস্বামীর লেখা'। ঢাকা হইতে শ্রীবিপিন বিহারী দাশগুপ্ত একটি ইংরেজি পুস্তিকায়[১] দেখাইবার চেষ্টা করেন যে পুথিখানি আদ্যন্ত জাল। তিনি দেখাইয়া দেন কড়চায় 'জানালা' শব্দের প্রয়োগ আছে, ইহা পর্তুগীজ শব্দ, ষোড়শ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; তাছাড়া কড়চাতে 'রসাল কুণ্ড' ও পূর্ণনগরের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র জর্জ রাসেলের নামানুসারে 'রাসেল কোণ্ডা' (রসাল কুণ্ডা?) নগর পত্তন হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীতে শুধু যে 'রসাল কুণ্ডা' ছিল না তাহা নহে, পূর্ণনগর (পুণা নগর) ছিল না, ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। কাজেই 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' মোটেই অকৃত্রিম নহে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনও মনে করেন পুথিটি জাল। কড়চায় শ্রীচৈতন্য কর্তৃক সত্য বাঈ প্রভৃতি বারবণিতাব উদ্ধার সুকুমারবাবুর মতে বিশ্বাস্য নহে। তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য "বারনারীদের কাছে স্যালভেশন আর্মির নেতা হইয়া ছিলেন"[২], "ইহার রহস্য কি তবে আধুনিক গুরুগিরির সাফাই?"[৩]

অপরপক্ষে ইহাও চিন্তনীয় যে জয়গোপাল গোস্বামী প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ও অধুনাবিস্মৃত ভৌগোলিক নামগুলি কড়চায় লিখিলেন কিরূপে? পন্থগুহা, নান্দীশ্বর, নাগপঞ্চ নদী, দেবলেশ্বর, চোরা নান্দীবন প্রভৃতি নাম কোন সাধারণ ভূগোল, ম্যাপ বা গেজেটিয়ারেও পাওয়া যায় না। এইগুলিও কি জয়গোপালের স্বকপোলকল্পিত বা উদ্ভাবিত? তাছাড়া জাল গ্রন্থ রচনায় জয়গোপালের স্বার্থ কি? জয়গোপাল ভালোভাবেই জানিতেন যে এদেশে

১ Govinda Das's Kadcha, a Black Forgery. ২ পৃ: ৩৭০ বা-সা-ই (৩য় সং)

৩ পৃ: ২৭২ বা-সা-ই (২য় সং)

প্রাচীন ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশের দ্বারা অর্থ বা খ্যাতিলাভ সম্ভব নহে। জয়গোপাল অদ্বৈতবংশের ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁহার পক্ষে শ্রীচৈতন্যকে লইয়া ছেলে-খেলাও সম্ভবপর নহে, ভানুসিংহ বা চ্যাটার্টনের ন্যায় চাঞ্চল্য ও রহস্য সৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। চৈতন্য-বিদ্বেষে নহে, চৈতন্য-ভক্তির জন্যই মহাপ্রভু-সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার সংবাদ সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার উদ্দেশে তিনি নিজে অর্থব্যয় করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। জয়গোপালকে জালিয়াত মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করিয়াছেন —"গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুথি সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া গোবিন্দদাসের কড়চা নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[১] মোটের উপর প্রকৃত রহস্যভেদ এখনও হয় নাই।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' উপেক্ষিত চৈতন্যচরিতের অপর দৃষ্টান্ত। গোবিন্দ দাসের কড়চার মতো অতোখানি না হইলেও কিছু পরিমাণে অসম্প্রদায়িকভাবে এই গ্রন্থ রচিত। ইহাতে বৈষ্ণবীয় রীতি—গুরু, কৃষ্ণ ও চৈতন্যের বন্দনা না করিয়া হিন্দুরীতি অনুসারে গণেশ বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে; গ্রন্থ পাঠের ফল কৃষ্ণভক্তি বা চৈতন্যকৃপার পরিবর্তে সাংসারিক কল্যাণ ও পুণ্যলাভ বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যকাহিনী যথেষ্টরূপে অলৌকিক করা হয় নাই, শ্রীচৈতন্যের নৃত্যকালে পায়ে ক্ষত হওয়ায় ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় লৌকিকভাবে তাঁহার দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি বৈষ্ণবসমাজে অমার্জনীয় অপরাধ। তথাপি বৈষ্ণবদিগের অবজ্ঞাসত্ত্বেও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এ-যাবৎ টিকিয়া আছে, তাহার কারণ জয়ানন্দ গোবিন্দ কর্মকারের মতো সাধারণ অখ্যাত বৈষ্ণব নহেন, তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগদাধর ঠাকুরের অনুগৃহীত এবং সুবিখ্যাত অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। অবশ্য একথা সত্য যে, জয়ানন্দ না ছিলেন কবি, না ছিলেন দার্শনিক, তাহার গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলেও সাহিত্যিক মূল্য নাই। গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে লিখিত। ইহার রচনাকালও জানা নাই, তবে চৈতন্যভাগবতের পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

---

১ পৃঃ ৪২৪ চৈতন্যচরিতের উপাদান

লোচনদাসের রচিত চৈতন্যমঙ্গল ইতিহাসসম্মত না হইলেও বৈষ্ণব-সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে অত্যন্ত সমাদরের বস্তু হইয়া আছে। লোচনদাস শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকারের শিষ্য। বৈষ্ণবসমাজে নরহরি 'গৌর-পারম্য'-বাদ বা 'নদীয়া-নাগর' ভাবের প্রবর্তন করেন। লোচনদাসের গ্রন্থ সেই ভাবেরই কাব্য-রূপ। গৌর-পারম্যবাদে বলা হইয়াছে স্বয়ং কৃষ্ণও উপাস্য নহেন, গৌরাঙ্গই একমাত্র উপাস্য, এই গৌরাঙ্গ আবার সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য নহেন, গৃহী গৌরাঙ্গ। সন্ন্যাসী চৈতন্য পূর্ণ হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণতম হইতেছেন গৃহী ও শৃঙ্গার-বেশী গৌরাঙ্গ। গৌবাঙ্গ 'নদীয়া-নাগব' এবং ভক্তেরা 'নদীয়া-নাগরী'। ভক্তের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হইতেছে ব্রজগোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের রমণীমনোহব রূপ, কটাক্ষ হাস্য, হাব-ভাব বর্ণনা করিয়া লোচনদাস অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন। লোচনের কাব্যে নদীয়ার কুলবধূগণ গৌরাঙ্গ-দর্শনে নিজেদের সতীধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন—"রসালসে আবেশে লোলি পড়ে গোরাপাশে গরগর কামে উনমতা।" লোচনের চৈতন্যমঙ্গল আদ্যন্ত দেবলীলা মাত্র, তাহাতে ঐতিহাসিকতার চিহ্ন নাই—তাহা আগাগোড়া চমৎকাব রোমান্টিক কাব্য।

পরিশিষ্ট

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

চৈতন্যচরিতামৃতে যে দার্শনিক মতবাদ দেখা যায় তাহার নাম অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। সংস্কৃত ভাষায় বচিত 'ষট্-সন্দর্ভ' গ্রন্থে জীব গোস্বামী প্রথম ইহা প্রচার করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, এই তত্ত্ব স্বয়ং শ্রীচৈতন্য রূপ সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে জীব গোস্বামী ইহা শিক্ষা করিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক রূপ দান করেন। বঙ্গদেশে ইহার প্রথম প্রচারকর্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ভারতীয় আস্তিকদর্শনের অন্তর্গত। বেদের প্রামাণ্য,

জীবের জন্মান্তর, আত্মার অবিনাশিতা, কর্মানুসারে জীবের অধোগতি বা ঊর্ধ্বগতি, বন্ধন ও মুক্তি, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়—এই সকল মৌলিক ভারতীয় ধারণাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াই এই মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মতো ইহাও ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্পর্ক এবং জীবের মুক্তির উপায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়ে নিজস্ব মত ব্যক্ত করিয়াছে। ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত ভাগবত মতের অন্তর্গত একটি বিশেষ মতবাদ।

ভাগবত-ধর্মের আদর্শ অনুসারে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের মূল ভিত্তি জ্ঞান নহে—ভক্তি। উপনিষদে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ-তত্ত্ব ও ভেদ-তত্ত্ব এবং তদনুযায়ী জ্ঞান ও ভক্তি উভয়বিধ মতবাদেরই অনুকূল সূত্র আছে। তন্মধ্যে জ্ঞানের অনুকূল "সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" প্রভৃতি সূত্র সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া এবং ভক্তির অনুকূল "রসো বৈ সঃ", "দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ অক্ষবাৎ পরতঃ পরঃ", "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি সূত্র অবলম্বন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভক্তিমূলক তত্ত্ব হিসাবে এই মতবাদ ভাগবতকেই উপনিষদের প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ভাগবত মতের খণ্ডনকারী জ্ঞানবাদী বেদান্ত ব্রহ্মসূত্রকে যথাসাধ্য অস্বীকার করিয়াছে।

বৈষ্ণব-সমাজে বাদ-প্রতিবাদমূলক দার্শনিক গ্রন্থ রচনার দ্বারা জ্ঞান-বিচারকে উপাদেয় করিয়া তোলা ধর্মাদর্শ-বিরোধী। নির্জ্ঞান ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদর্শ—'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।' তথাপি বৈষ্ণবেরা বুঝিয়াছিলেন—ভাগবত মতের প্রধান প্রতিপক্ষ শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে যুক্তি-তর্কে পরাস্ত না করিতে পারিলে বৈষ্ণবধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। তাই ঠিক ধর্মের জন্য নহে, সংঘের জন্যই জীব গোস্বামীর ষট্-সন্দর্ভ রচনা। শঙ্কর-মতই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ।

উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর প্রচার করিয়াছিলেন—ব্রহ্ম গুণাতীত জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি বাক্য মন ও বুদ্ধির অতীত। একমাত্র সুষুপ্তিতে ও নির্বিকল্প সমাধিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। স্বরূপে ব্রহ্মের কাছে জীবও নাই জগৎ নাই—তিনি অদ্বিতীয়। অথচ

কোনো অজ্ঞাত কারণে ব্রহ্ম নিজেকে অজ্ঞানী ও বদ্ধজীব বলিয়া কল্পনা করেন, তখনই তাঁহার কাছে বহুজীব ও জগৎ প্রকাশিত হয়। জীব-রূপ ব্রহ্মেরই কায়-ব্যূহ। জীব-রূপে ব্রহ্ম নিঃশেষিত বা সীমাবদ্ধ হন না। জীবরূপ সত্ত্বেও তিনি স্বরূপেও অবস্থান করেন। জীব অজ্ঞানের বশে ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দর্শন করে, অজ্ঞানের বশে কর্ম করে, কর্মফলে তাহার সুখ দুঃখ প্রাপ্তি ও জন্মান্তর গতি হয়। কিন্তু তাহার কর্ম, কর্মফল সুখদুঃখ জন্মান্তর—সমস্তই অজ্ঞান বা মায়ার ক্রিয়া এবং এই মায়া রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় একটা ভ্রান্তি মাত্র। ভ্রান্তি বলিয়াই তাহা অনিত্য, তাহার ক্ষয় ও জীবের অন্তর্লীন জ্ঞানের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। জীবের অজ্ঞান-ক্ষয়ের লক্ষণ তাহার মুমুক্ষুত্ব। এই অবস্থায় জীব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আত্মানুসন্ধান করে—'নেতি' অর্থাৎ "আমি ইহা নই" এইরূপ বিচার করে। ইহার ফলে জীবের জ্ঞানোদয় হয়, ক্রমশ মন, অহঙ্কার বুদ্ধির লয় হয়, জগৎ রূপেরও বিলয় ঘটে। জীব শেষ পর্যন্ত নিজেকে ব্রহ্মরূপে বুঝিতে পারে। ইহাই জীবের মুক্তি।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ উল্লিখিত শঙ্কর-মতের প্রবল প্রতিবাদ। ইহার বিচার-পদ্ধতিও অভিনব। ইহা কেবল জ্ঞানীর বিচার নহে—কবির বিচার. ইহাতে কেবল শুষ্কবুদ্ধি নহে, সুন্দর চিত্র ও প্রতীকের সাহায্যে সরস কাব্য-কৌশলকেও অবলম্বন করা হইয়াছে ; ফলে তত্ত্ব-বিচারও রসায়িত হইয়াছে।

তত্ত্বের দিক দিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শঙ্করমতের ন্যায় 'নাস্তি'-বাদী নহে, 'অস্তি'-বাদী। ইহা শুধু ব্রহ্মের সত্যতা নহে, প্রতিটি জীবের সত্যতা, এমনকি জড়জগতের সত্যতাও স্বীকার করিয়াছে। এই মতবাদে ব্রহ্ম নহে—পরব্রহ্ম বা ভগবানই মূল তত্ত্ব। শঙ্করমতের নির্বিশেষ অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম হইতেছেন ভগবানেরই অঙ্গকান্তি বা 'তনুভা'। ভগবান মনুষ্যাকৃতি, সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দময়, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। পূর্ণত্বের জন্য তাঁহার কোন সংকল্প নাই। সেইজন্য তিনি সৃষ্টিও করেন না, বিনাশও করেন না, অর্থাৎ তাঁহাতে রজ, তমোগুণ নাই কেবল শুদ্ধ সত্ত্বগুণই আছে। ভগবানের গুণ ও শক্তি শঙ্করমতের ঈশ্বরের গুণ ও শক্তির ন্যায় অনিত্য ও মায়িক বস্তু নহে—সেগুলি অলৌকিক অমায়িক ও নিত্যবস্তু। সৎ-চিৎ-আনন্দ তাঁহার স্বরূপের বৈশিষ্ট্য। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ

প্রকাশ আনন্দে ও মাধুর্যে। তাঁহার মাধুর্যময় মূর্তি—দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্তি, এবং ঐশ্বর্যময় মূর্তি—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি। প্রেমভক্তি বা আনন্দের উপাসনা না করিয়া কেবল সৎ-চিৎ-শক্তির উপাসনা বা জ্ঞান ও কর্মের সাধনা করিলে কৃষ্ণমূর্তি দর্শন সম্ভব নহে। তাঁহার আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—দিব্যনারীরূপিণী রাধা-মূর্তিতে। রাধাই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী। ইনি কৃষ্ণের পরকীয়া-ভাবের নায়িকা। রাধাকৃষ্ণের বিহারক্ষেত্র অলৌকিক গোলোকধাম। অপরপক্ষে নারায়ণের স্বকীয়া পত্নী লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের লীলা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ধাম বৈকুণ্ঠে। পরব্রহ্মের এইরূপ মানবীয় প্রেমলীলা মোটেই কবি-কল্পনা নহে, রূপক নহে। ইহা যে সত্য তাহার প্রমাণ—ভাগবত। ভাগবতে বর্ণিত ব্যাপার মিথ্যা হইতে পারে না।

যেমন সৎ-চিৎ-আনন্দ ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি, তেমনি তাঁহার বহিরঙ্গ শক্তি হইতেছে মায়া। মায়া ভগবৎ-সত্তার অন্তর্নিহিত ধর্ম নহে। ভগবান যেন সূর্য, অন্তরঙ্গ শক্তি যেন জ্যোতির্মণ্ডল এবং মায়া যেন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্যজ্যোতি। মায়া বিশ্বজগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী শক্তি। শঙ্কর-মতের ন্যায় মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে, সত্যবস্তু। ভগবৎ-শক্তি বহিরঙ্গ হইলেও মিথ্যা হইতে পারে না। সেইজন্য মায়াসঞ্জাত জগৎও সত্য, শঙ্কর-মতের জগতের ন্যায় কাল্পনিক ও অনিত্য নহে। তবে জগৎ সত্য হইলেও নিরপেক্ষ নহে, ভগবৎ-সাপেক্ষ। প্রলয়ের পরেও জগৎ সূক্ষ্মভাবে ভগবানের মধ্যে থাকে। মায়া শুধু সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী নহেন, ইনি মোহিনী, ইহলোকে ভগবানের লীলাপ্রকাশের জন্য ভগবানের নিত্যদাস জীবকে সংসার-মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। জীবের দুর্দশায় ভগবানের করুণা প্রকাশ পায়, ভগবৎ-কৃপায় জীবের মায়াবন্ধন শিথিল হয় ও জীব ভগবদ্‌ভক্তে পরিণত হয়।

বহিরঙ্গ শক্তি হিসাবে মায়া গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য অলৌকিক ধাম ত্যাগ করিয়া ভগবান নামিয়া আসেন এবং ইহলোকে মায়াশক্তির আশ্রয়ে 'পরমাত্মা' রূপ গ্রহণ করিয়া প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া প্রবেশ করেন। ইহারই প্রতীক-মূর্তি সংকর্ষণ। এই পরমাত্মার রূপের মধ্য দিয়াই জীবের সহিত ভগবৎ-স্বরূপের সংযোগ রক্ষা হয়। জড়জগৎও এই সংকর্ষণ বা পরমাত্মার পরোক্ষ সৃষ্টি। পরমাত্মার শক্তিতেই

শক্তিমতী হইয়া মায়া প্রত্যক্ষভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি হয় না, পরমাত্মাই মায়াপ্রভাবে জড়জগৎরূপে পরিণত হন।

জীব ভগবানেরই ক্ষুদ্রতম শক্তি। ভগবানের সহিত ইহার ভেদ সামর্থ্যগত। সেইজন্য অণুমাত্রায় হইলেও ভগবানের স্বরূপ শক্তি—সচ্চিদানন্দত্ব জীবের মধ্যে বর্তমান আছে। তাছাড়া জীব ভগবানের বহিরঙ্গ-শক্তি মায়ারও অধীন। জীবের মধ্যে ভগবানের এই উভয় শক্তির অস্তিত্ব আছে বলিয়া জীবকে বলা হয় ভগবানের তটস্থ-শক্তি। জীব বহু, পৃথক পৃথক দেহে আবদ্ধ ও প্রত্যেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। জগতের ন্যায় জীবেরও স্বাধীন সত্তা আছে, তবে এই স্বাধীনতা ভগবৎ-ইচ্ছার দ্বারা সীমাবদ্ধ। জীবের ইচ্ছা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বাধীন হইলেও ভগবৎ-ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না। জীব পরমাত্মারই পৃথক পৃথক অংশ। সেইজন্য মায়াবদ্ধ হইলেও মায়ামুক্ত হইবার ইহার যোগ্যতা আছে। ভক্তির দ্বারা জীব এই যোগ্যতা অর্জন করে। মুক্তি অর্থে জীবের মায়া-মুক্তি মাত্র, ভগবানের মধ্যে জীবের বিলয় নহে। অংশের পক্ষে অংশী হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। জীব ভগবানের নিত্যদাস, শাস্ত্র-সঙ্গত বৈধীভক্তির সাধনায় জীব মায়ামুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারে এবং প্রেমভক্তির সাহায্যে গোলোকধামে প্রবেশাধিকার পায়। কৃষ্ণলীলায় রাধা-সখীত্বই জীবের চরম পরিণতি। জীব কখনই রাধা হইতে পারে না।

সচ্চিদানন্দত্বের দিক দিয়া ভগবানে ও জীবে অভেদ—অর্থাৎ শক্তিমানে ও শক্তিতে স্বরূপতঃ অভেদ, আবার সামর্থ্যের দিক দিয়া, মায়ার দিক দিয়া এবং জীব বা শক্তির পৃথক অস্তিত্বের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ অচিন্ত্যভাবে নিষ্পন্ন। সেইজন্য এই মতবাদের নাম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।

অষ্টম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী

ষোড়শ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ঘটনা বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক অভ্যুদয়। বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্বে পদাবলী রূপে চর্যা-কবিতা দেখা দিয়াছিল বটে কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার সহিত কোন দিক দিয়া তাহার তুলনা চলে না। চর্যা-কবিতার প্রকাশ ছিল সংকীর্ণ, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার বিকাশ অজস্র, বিপুল ও বিচিত্র। 'পদামৃতসমুদ্র' 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পদ-সংকলন গ্রন্থের আকৃতির বিশালতা হইতে কেবল নির্বাচিত পদের নহে, অনির্বাচিত পদের সংখ্যারও বিশালতা অনুমান করা যায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের হিসাবে—"আজ অবধি প্রকাশিত বৈষ্ণব গীতি-কবিতার সংখ্যা সাত-আট হাজারের কাছাকাছি হইবে, ভবিষ্যতে আরও দুই-চারি হাজার কবিতা আবিষ্কৃত হইতে পারে।"[১] এই সংখ্যাধিক্য বৈষ্ণব কাব্যের গৌরব—ইহা প্রাণ-প্রাচুর্য ও যৌবনশক্তির চিহ্ন। কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়াও বৈষ্ণব পদাবলী অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়। ইহার অন্তর্গত উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে এমন কাব্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেখা যায় না। এমন কি আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রকাব্য ব্যতীত অন্য কোন কাব্যই ইহাদের সমকক্ষ নহে। বৈষ্ণবীয় উৎকৃষ্ট পদগুলি ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলংকারে সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণাঙ্গ। পদগুলি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তও বটে—বাহিরের কোন প্রভাবে উৎপন্ন নহে। তাছাড়া ইহারা সম্পূর্ণ বঙ্গীয়—বাংলা দেশের, বঙ্গ-প্রকৃতির ও বাঙ্গালী চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস। বাঙ্গালী হৃদয়ের ভাবুকতা, সৌন্দর্যবোধ ও সুকোমল মাধুর্য নিঃশেষে প্রকাশিত হইয়াছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। আরও কয়েকটি গুণে বৈষ্ণব কবিতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বঙ্গীয় কবিতা হইতে স্বতন্ত্র; সেগুলি হইতেছে কবিচিত্তের বিশাল বিস্তৃতি, উন্মুক্ততা ও গভীরতা। বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যাত্ম সাধনার উপযোগী অথচ পূর্ণভাবে মানবীয়, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী-সাহিত্য অথচ অদ্ভুত-ভাবে সর্বজনীন, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই আস্বাদ্য। অতিরিক্ত ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা যুগচেতনা ইহাদিগকে দেশে ও কালে আবদ্ধ করে নাই।

---

১ পৃঃ ২৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় সং

বৈষ্ণব কাব্য-ভাণ্ডারে 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি অলংকারশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে আরও কয়েকটি পদ রচিত হইয়াছে দেখা যায়। এগুলির মধ্যেও মাধুর্য নাই, চাতুর্য আছে। এগুলিতেও কবি-কল্পনা শৃঙ্খল-বদ্ধ বিহঙ্গের মতো উড়িবার অভিনয় করিয়াছে মাত্র। তাহার ফলে না ফুটিয়াছে আনন্দ, না ফুটিয়াছে সৌন্দর্য। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে—এই প্রকারের পদগুলি বিশাল বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের উপেক্ষণীয় অংশ। এইগুলি পদাবলী রূপ পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক মাত্র, এই কলঙ্কে পূর্ণচন্দ্রের ভাস্বর মহিমা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না—"নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

নেপথ্য-বার্তা

পদাবলী-তথ্য

বৈষ্ণব পদ-কর্তা কবিগণ বঙ্গসাহিত্যে মহাজন বলিয়া পরিচিত। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন দেখাইয়াছেন—"পুরানো পদাবলী-সংগ্রহে অজ্ঞাতনামার রচনা 'মহাজনস্য' বলিয়া উদ্ধৃত হইত।"[১] এই বৈষ্ণবীয় সৌজন্য হইতেই বৈষ্ণব পদকর্তা মাত্রেরই 'মহাজন' উপাধি লাভ হইয়াছে। দীনেশ চন্দ্র সেন মোট ১৫৪ জন মহাজনের নাম করিয়াছেন; তন্মধ্যে মুসলমান কবি এগার জন এবং মহিলা কবি তিনজন। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ব্যতীত লোচন দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন দাস, যদুনন্দন চক্রবর্তী, প্রেমদাস, রায় বসন্ত, রায় রামানন্দ, রায় শেখর, বাসু ঘোষ, শশিশেখর, জগদানন্দ, বংশীবদন প্রভৃতি সুবিখ্যাত। ইঁহারা অধিকাংশই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের কবি এবং বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায় পদ-রচনায় সিদ্ধহস্ত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে বহু কবির রচনা মিশ্রিত আছে বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। (চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আলোচনার নেপথ্যে চণ্ডীদাস-সমস্যায় চণ্ডীদাসী পদাবলীর সমস্যাও আলোচিত

১ পৃঃ ৩৭৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (৩য় সং)

হইয়াছে।) তাহা ছাড়া বর্তমানে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থও বহু বাঙ্গালী পদকর্তার রচনা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। বিশেষ করিয়া রায় শেখরের অধিকাংশ পদ নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত বিদ্যাপতির নামে চালাইয়াছেন বলিয়া সতীশ চন্দ্র রায় অভিযোগ করিয়াছেন। 'বিদ্যাপতি-বিচার' প্রবন্ধে সতীশ চন্দ্র দেখাইয়াছেন—(১) রায় উপাধি বিদ্যাপতির হইতে পারে না, (২) বিদ্যাপতির পদে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত কোন তত্ত্বই থাকিতে পারে না, (৩) সখী-লীলায় কবির "অনুগা" অভিমান[১] চৈতন্য-পরবর্তী পদের বৈশিষ্ট্য, কাজেই 'অনুগা' ভাবের পদ বিদ্যাপতির হইতে পারে না। (৪) বিদ্যাপতির পদে রাধার শাশুড়ী জটিলা ও রাধার সখী ললিতার উল্লেখ থাকিতে পারে না। এইগুলি খাঁটি বিদ্যাপতির পদ নির্বাচনের কষ্টিপাথর। এইভাবে বিচার করিলে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত সুবিপুল পদসংগ্রহ হইতে বহু বাঙ্গালী কবির পদ পৃথক করা যাইতে পারে।

প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কয়েকটি পদকে অন্য কবির পদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়" পদটি নটবব দাসেব, "আমার বঁধুয়া আন বাডি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া" পদটি নরহবি দাস সবকারের। "সজনী ও ধনী কে কহ বটে" পদ লোচন দাসের, "কাহারে কহিব মনের বেদনা কেবা যাবে পরতীত"-পদটি রামচন্দ্র কবিরাজের। তাছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যেও পদ-বিপর্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া সুকুমার বাবুর ধারণা। "মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা, শুন শুন পরাণের সই" পদটি জ্ঞানদাসের হইতে পারে, বসু রামানন্দের হইতে পারে অথবা বলরাম দাসেরও হইতে পারে। 'পদামৃত-সমুদ্রে' ধৃত "কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি" পদটি চণ্ডীদাসের তো নয়ই, এমনকি নরহরি চক্রবর্তীরও নহে, ইহা নরহরি দাস সরকারের। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক "অপরূপ গোরা নটরাজ" পদটি গোবিন্দ দাসের বলিয়া প্রচলিত হইলেও আসলে বাসুদেব দত্তের। "তোমারে কহিয়ে সখি স্বপনকাহিনী" পদটি

---

১ শ্রীরাধার জন্য সখীগণের দৌত্য ও সেবাবৃত্তিই সখীর 'অনুগা'-বৃত্তি। যথা—

শেখর পহুপর মিলন যাই।

আবল নাগর ভেটল রাই॥

জ্ঞানদাস বা বলরাম দাসের নহে, বসু রামানন্দের। "মনের মরম কথা শুন লো সজনী" পদটি জ্ঞানদাসের নহে, অপর কোন পদকর্তার। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রাগাত্মিক পদাবলীর কবি, সুকুমার বাবুর মতে, বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রের শিষ্য শ্রী বড়ঠাকুর। 'পদামৃতসমুদ্র' সঙ্কলনকারী রাধামোহন ঠাকুরের মতে গোবিন্দ দাস কবিরাজ বিদ্যাপতিরই কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদকে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া পদগুলিতে নিজের এবং বিদ্যাপতির যুক্ত ভণিতা দিয়াছেন। কিন্তু সুকুমারবাবু দেখাইয়াছেন—বিদ্যাপতির পদের প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই পদগুলি গোবিন্দ দাস রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই কবি যুগ্ম ভণিতা দিয়াছেন, যথা "বিদ্যাপতি কহ, নিকরুণ মাধব, গোবিন্দ দাস রসপূর।"

যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নামে তেমনি গোবিন্দ দাস ও বলরাম দাসের নামে একাধিক দাবিদার দেখা যায়। আদি বলরাম দাস হইতেছেন নিত্যানন্দ-ভক্ত ও বর্ধমানের দোগাছিয়া গ্রামবাসী, এবং আদি গোবিন্দদাস হইতেছেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের বন্ধু গোবিন্দদাস কবিরাজ। জীবনের চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইনি শাক্ত ছিলেন এবং বৈষ্ণব হইবার বহুপূর্ব হইতেই বৈষ্ণব পদ রচনা করিতেন। অনেকে ইহাকে চৈতন্য-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বলিয়া মনে করেন। মাত্রাছন্দে ও ব্রজবুলিতে ইহার অধিকার ছিল অসাধারণ। ব্রজবুলি ভাষার আদি কবি যশোরাজ খান। ইহার 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর সহজই গোর' পদটি সুবিখ্যাত। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ ও পার্শ্বচরের মধ্যে মুরারী গুপ্ত, মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত, নরহরি দাস, বাসুঘোষ, বংশীবদন চট্ট, রামানন্দ বসু, রামানন্দ রায়, চৈতন্যদেবের জীবৎ-কালেই পদ রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের পরেই পদকর্তা হিসাবে জ্ঞানদাসের খ্যাতি সর্বাধিক। অনেকের ধারণা—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহুপদ জ্ঞানদাসেরই রচিত। ধামালী বা ছড়ার ছন্দে পদ রচনায় বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা কবি লোচনদাস। নদীয়া-নাগর ভাবের গৌর-পদাবলী রচনাতে লোচনদাস অনন্যসাধারণ।

শ্রীচৈতন্য জনসাধারণের মধ্যে পদাবলী প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি 'বহিরঙ্গ সনে' নাম সংকীর্তন করিতেন এবং "অন্তরঙ্গ সনে করে রস-আস্বাদন।" ইহার কারণ তিনি সম্ভবতঃ অধ্যাত্মচেতনাহীন জনসাধারণকে

রস-কীর্তন শ্রবণে অনধিকারী চিন্তা করিতেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে নাম-কীর্তন অপেক্ষা পদ-কীর্তনেরই অধিক প্রচার হয়। ষোড়শ শতকের শেষপাদে নরোত্তম দাসের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র সন্তোষ দত্ত খেতুরীতে ষড়্‌বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে এক বিরাট মহোৎসব করেন; উহাতে বিশাল বৈষ্ণব-সমাবেশ হয় এবং ব্যাপকভাবে পদাবলী কীর্তন হয়। ইহাতেই পদাবলীর উৎস-মুখ খুলিয়া যায় এবং পদাবলী কীর্তনে সমগ্র বঙ্গদেশে মুখরিত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ বৈষ্ণব পদাবলী সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যায়। "যত ছিল নাড়াবুনে, সব হল কীর্ত্তনে. কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল কর্তাল" এই ব্যঙ্গোক্তি সর্বসাধারণের মধ্যে পদাবলী কীর্তনের প্রচারের ব্যাপকতাই সূচিত করে।

অষ্টাদশ শতক হইতে পদাবলী-প্রবাহে ভাটা পড়িতে থাকে এবং উনবিংশ শতকে স্তিমিত হইয়া আসে। শাক্তপদাবলী, বাউল পদাবলী, ঢপ, পাঁচালী, কবিগান, তর্জা, টপ্পা প্রভৃতি সঙ্গীত আসিয়া বঙ্গদেশের বৈষ্ণব পদকীর্তনের আসর দখল করিতে থাকে। দেশের অবস্থা বুঝিয়াই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতেই বিভিন্ন যুগের পদ সংগ্রহ করিয়া সংকলন-গ্রন্থে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' গ্রন্থে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন কবির তিনশত পদ সংগ্রহ করেন। তাহার পর তৎশিষ্য নরহরি চক্রবর্তী 'গীত চন্দ্রোদয়ে' তিনশত তিরিশটি পদ রক্ষা করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর নরহরির পরে ৭৪৬টি পদ সংগ্রহ করিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম দেন 'পদামৃত সমুদ্র'। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কালে সংকলিত বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত গ্রন্থ; ইহাতে প্রায় ১৩০ জন কবির তিন হাজারের অধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। আধুনিক কালে সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে কালিদাস নাথের 'কীর্তন গীত রত্নাবলী' এবং সতীশচন্দ্র রায়ের 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পাশ্চাত্য দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচার-প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে দেখা যায়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বীমস্ সাহেব The Early Vaisnaba Poets of Bengal প্রকাশ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ারসনের বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ Chrestomathy প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন

কাব্যবিশারদ The Poets of Bengal গ্রন্থে কয়েকটি পদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কুমার, নন্দলাল দত্ত ও আলেকজাণ্ডার চ্যাপম্যান পদকল্পতরু হইতে ৪৮টি পদ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রকাশিত চ্যাপমান-রচিত Radha কবিতাটি বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক—

O thou of the milky breasts, out of the mist
Of Indian nights thou surely leaned and kissed
My mouth, or was this old sweet, lyric book
The Padakalpataru whose reading shook
My body ; so that quickly a passion grew
No words could still but thine, but one or two
Of thy words, Radha, could, if thou shouldest speak them
Offering kisses, and then I would let them keep thee.

—*Vaisnaba Lyrics Done into English Verse*

নবম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

যে গ্রন্থ শ্রবণে সাংসারিক মঙ্গল সাধিত হয় অথবা মঙ্গল-বিধায়ক ('মুশকিল-আসান'-কারী) দেবতার শক্তি-মাহাত্ম্য যে গ্রন্থে বর্ণিত হয় তাহার নাম মঙ্গলকাব্য। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতেছে এই মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর গ্রন্থাবলী। ইহাদের দ্বারাই প্রাচীন গ্রন্থের লাইব্রেরীর সর্বাধিক স্থান অধিকৃত হইয়াছে। ইহাদের কায়-সম্প্রসারণ বিস্ময়কর। আরব্য উপন্যাসের গল্পে কলসী-নিঃসৃত ধূমরেখা ক্রমশঃ বড় হইয়া দৈত্যের আকার ধারণ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের জন্মের ইতিহাসেও অনুরূপ ব্যাপার দেখা যায়। ইহাতে জনশ্রুতিমূলক ছোট ছোট কিংবদন্তী এবং মুখেমুখে প্রচলিত ব্রতকথা ক্রমশঃ ফুলিয়া ফাঁপিয়া দীর্ঘ ও দীর্ঘতর হইয়াছে। পল্লীগ্রামের নারীসমাজে প্রচলিত গ্রাম্য দেববিষয়ক গল্প ও ছড়া প্রথমে দেব-পূজার সময়ে কিছুক্ষণ পাঠ করিবার মতো কথা কবিতায় পরিণত হইয়াছে, তখন ইহার নাম হইয়াছে 'পাঁচালী'। এই পাঁচালী আবার শ্রোতৃমণ্ডলীর চাহিদা অনুসারে আটদিন, বারোদিন ও একমাস গাহিবার মতো ক্রমদীর্ঘ হইয়া কায়-সম্প্রসারণ করিয়াছে। স্ফীতাবস্থায় ইহার নাম হইয়াছে 'মঙ্গলকাব্য'। সুপরিণত মঙ্গলকাব্য হইয়া উঠিবার দৃষ্টান্ত নয়-দশটির অধিক নহে, কয়েকটি ব্রতকথা অর্ধপরিণত হইয়া পাঁচালীরূপেই থাকিয়া গিয়াছে। এই প্রকার অর্ধ-পরিণত রচনার দৃষ্টান্ত সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, সূর্যের পাঁচালী প্রভৃতি। পরিণতি-প্রাপ্ত ক্ষুদ্রকায় মঙ্গলকাব্য হইতেছে শিবায়ন, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি এবং বৃহৎকায় মঙ্গলকাব্য তিনটি—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল।

কেবল কায়-স্ফীতিতে নহে, কায়-বাহুল্যেও মঙ্গলকাব্য বঙ্গসাহিত্যে অসাধারণ। একই কাব্যের পুনঃপুনঃ রচনা প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যেই দেখা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন কমপক্ষে ৬২ জন কবির একই মনসামঙ্গল রচনার কথা লিখিয়াছেন। এ-যাবৎ সংগৃহীত মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে পৃথক পৃথক ভণিতায় পনেরখানি মনসামঙ্গলের, দশটি চণ্ডীমঙ্গলের ও সতেরটি ধর্মমঙ্গলের কাব্য পাওয়া গিয়াছে। এই সংখ্যাগুলি হইতেই

অনাবিষ্কৃত মঙ্গলকাব্যসমূহের সংখ্যা-বাহুল্য অনুমান করা যাইতে পারে। এইজন্য মঙ্গলকাব্য রচনায় সেকালের কবিদিগের রচনা-প্রতিযোগিতা এবং তৎফলে বাঙ্গালীর কবিশক্তির অপচয় হইয়াছে—এইরূপ ধারণা হওয়াই পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াই দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন—"পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের সূত্র।"[১]

মঙ্গলকাব্য-বিশেষের সংখ্যাবাহুল্য কিন্তু সত্যকার রচনা-প্রতিযোগিতার ফল নহে; কারণ নূতন গ্রন্থ অধিকাংশ স্থলেই পুরাতন গ্রন্থের নবসংস্করণ। এইগুলিতে কবির কোনো নূতন পরিকল্পনা বা সৃষ্টির চিহ্ন দেখা যায় না; পুরাতন গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনার অল্পবিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পুনর্লিখনেই নূতন কবির কৃতিত্ব। এত সহজে কবি-খ্যাতি-লাভ মঙ্গলকাব্য ব্যতীত অন্য কোথাও সম্ভবপর নহে। যেখানে প্রকৃত কবিশক্তিরই প্রমাণ নাই সেখানে তাহার অপচয়ের প্রশ্ন উঠে না।

একই মঙ্গলকাব্যের বহু পুনরাবৃত্তির কারণ বাঙ্গালী কবির 'পুচ্ছগ্রাহিতা'-প্রবৃত্তি নহে, প্রকৃত কারণ শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক প্রচলিত ভাষায় ইহার নব সংস্করণের চাহিদা। মাত্র একটি পল্লীর নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত গ্রামের এই চাহিদা। মঙ্গলকাব্যের এই চাহিদা ও জনপ্রিয়তার অনেকগুলি কারণ আছে। বাংলা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এইরূপ সর্বজনীনতা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় নিজের সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা ইহাতে দেখা যায় না। ইহাতে নূতন দেব-বিশেষের পূজা প্রবর্তনের গল্প আছে বটে কিন্তু পূজনীয় দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি করাই তাহার উদ্দেশ্য; মঙ্গলকাব্যের দেবতা সাধারণতঃ বঙ্গপল্লীর সর্বজনীন দেবতা—কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দেবতা নহে, তাহার সহিত সম্প্রদায়গত বিরোধ নাই, বরং প্রতি মঙ্গলকাব্যেই সর্বদেববন্দনা ও সর্বদেবভক্তি প্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল নষ্ট করা হইয়াছে। তথাকথিত 'শাক্ত' চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্য-বন্দনা[২] ইহার প্রমাণ। এমন কি মুসলমান পীর ও গাজীদিগের বন্দনাও

১ পৃঃ ১০৯ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

২ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল দ্রষ্টব্য

মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়।[১] তাছাড়া মঙ্গলকাব্য অধ্যাত্ম-গ্রন্থই নহে, লৌকিক গ্রন্থ। দেবলীলা থাকিলেও তাহার স্থান গৌণ, মানবজীবন-কাহিনীই মঙ্গলকাব্যের সত্যকার বর্ণনীয় বিষয়। এইজন্যই ইহা হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আস্বাদ্য। দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাব্য সহজ সরল ও সাধারণের বুদ্ধিগম্য, বৈষ্ণব-কাব্যের ন্যায় ইহা শিক্ষিত ও ইঙ্গিতজ্ঞ বিশেষ শ্রোতার জন্য রচিত নহে। অবশ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত দুই-একটি পণ্ডিতকে খুশী করিবার জন্য ইহাতে কবিগণ সময়ে সময়ে কয়েকটি উৎকট সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করেন, কিন্তু এ-গুলি গ্রন্থের অলংকরণ মাত্র, ইহাতে মূল বিষয় বুঝিতে জনসাধারণের অসুবিধা হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় দার্শনিকতা বা ভাবের দুরূহতা ইহাতে নাই—গায়কদিগকে 'আখর' সৃষ্টি করিয়া ভাব বা তত্ত্ব বুঝাইতে হয় না, ইহা মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। তৃতীয়তঃ মঙ্গলকাব্য ধামালী-কাব্যের ন্যায় অশ্লীল ও সমাজবিরুদ্ধ নহে, স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা-ভগিনী সঙ্গে লইয়া একত্র আসরে বসিয়া ইহা আস্বাদন করা সম্ভব। চতুর্থতঃ ইহা সত্যকার গান বা কবিতা নহে—ছন্দে-রচিত মানব-জীবন-কথা বা গল্প। ইহাই প্রাচীন বঙ্গের উপন্যাস-সাহিত্য। বলা বাহুল্য, কবিতা অপেক্ষা উপন্যাসের চাহিদাই চিরকাল অধিক।

দেবতাবিশেষের পূজা-প্রচার উপলক্ষ করিয়া জনতার মনোরঞ্জনই মঙ্গল-কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব কবি জনগণের ঊর্ধ্বে কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবি জনগণের অধীন। সেইজন্য প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই সাহিত্যিক দর্পণে জন-জীবনকে প্রতিবিম্বিত করিবার প্রয়াস দেখা যায়। কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে সেইজন্য বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, উৎসব-পার্বণ, বিবাহ-পদ্ধতি, ভোজন, শয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি অবান্তর অথচ জনপ্রিয় বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া বারমাস্যা, বাঙ্গালার রন্ধন-প্রণালী ও ভোজ্য-তালিকা, লোক-ঠকানো ধাঁধার অবতারণা ও উত্তর দান, নারীগণের পতিনিন্দা, নারীর বেশভূষা, টোপর-নির্মাণ, কাঁচুলী-চিত্রণ, বিশ্বকর্মার কৃতিত্ব, হনুমানের বীরত্ব ও নারীর সতীত্ব-পরীক্ষা প্রভৃতি জনগণের মুখরোচক

১ পীর পাথাম্বর বন্দো আছে যতগুলি।
যাঙ্গারণ গড়েতে বন্দিব পীরিমনালি॥ —রূপরামের ধর্মমঙ্গল

আলোচনা ও জনশ্রুতির অবতারণা প্রতি মঙ্গলকাব্যে অপরিহার্য হইয়াছে। তাছাড়া অপুত্রকের মুখদর্শনে আপত্তি, কনিষ্ঠ পুত্র কন্যা বা পুত্রবধূর অ্যাডভেঞ্চার ও সাফল্য, মৃতের পুনর্জীবনলাভ, সতীনারীর অলৌকিক শক্তি ও শেষ পর্যন্ত পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় প্রভৃতি রূপকথা-জগতের আদিম সংস্কারের দ্বারা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী মণ্ডিত হইয়াছে। প্লট-পরিকল্পনায় কবিগণ কিছুমাত্র স্বাধীনতা পান নাই, পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কাহিনীর যথাযথ অনুসরণ করিতে হইয়াছে। ঘটনাবিন্যাসেও দেববন্দনা ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হইতে আরম্ভ করিয়া নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ পর্যন্ত জনগণের ধারণা-সম্মত ক্রম অনুসরণে কবি বাধ্য হইয়াছেন। এই সকল লক্ষণ প্রমাণ করে, মঙ্গলকাব্য জন-সাহিত্যই বটে, কবি জনতার চাহিদা-সরবরাহকারী মাত্র। কবিরা নিজেরা হয়ত শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাদের রচনা জনসাধারণের জন্যই। মঙ্গলকাব্য আসলে জনগণেরই সম্পত্তি। সেইজন্যই দেখা যায়—মঙ্গলকাব্যের বহু পুথিতে লেখকের নাম নাই, রচনার সাল তারিখ নাই, একের পুথিতে মধ্যে মধ্যে অন্যের ভণিতাও চলিতেছে, একের ভাল ভাল পদ অপর কবি আত্মসাৎ করিতেছেন,[১] এবং এ সকল ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি নাই, সকলেই নিশ্চিন্ত। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্যের কবি—বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতিকে ব্যক্তি হিসাবে দেখা চলে না, বিশেষ কবি-গোষ্ঠীর মুখপাত্র রূপেই দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলকাব্য বাংলার জন-সাহিত্য বটে কিন্তু জাতীয় সাহিত্য নহে। কোন কোন অতি-উৎসাহী লেখক মঙ্গলকাব্যকে বাংলার জাতীয় কাব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।[২] কাহারো ধারণা—"ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।"[৩] কিন্তু জন-সাহিত্য মাত্রেই

১ "বরিশাল অঞ্চলে হরিদত্তের প্রচলিত (মনসামঙ্গলের) পদগুলি ক্রমে বিজয় গুপ্ত, পুরুষোত্তম প্রভৃতি কবিগণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন"—পৃঃ ২২৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

২ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে National Poetry কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনসামঙ্গলকে বাংলা দেশের সেই শ্রেণীর কাব্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।"

—ভূমিকা পৃঃ ৩৸৹ বাইশ কবির মনসামঙ্গল।

৩ পৃঃ ৫৪ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

শিশুমনের স্থায় অপরিণত মনের সাহিত্য ; কেবল শিশু-চরিত্র দেখিয়াই জাতীয় চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না, তেমনি অপরিণত মনের সাহিত্য কথনই জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। মঙ্গলকাব্যে যে সমাজ-জীবনের চিত্র ফুটিয়াছে, তাহা নিম্নস্তরের। অবশ্য ধনপতি সদাগর, চাঁদ সদাগর, রাণী রঞ্জাবতী প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চ সমাজের নরনারীকে মঙ্গলকাব্যের পাত্র-পাত্রী করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেছে উচ্চশ্রেণী সম্বন্ধে নিম্নশ্রেণীর ধারণা ; সত্যকার আভিজাত্য ও নাগরিক জীবন তাহাতে প্রকাশিত হয় নাই। মঙ্গলকাব্যের রাজার রাজ-মহিমা নাই, রাজা গ্রাম্য মোড়ল মাত্র, ইহার যুদ্ধ যাত্রাদলের যুদ্ধাভিনয়ের স্থায় হাস্তকর, ইহার সমুদ্র-যাত্রা সাত সমুদ্র তেব নদীতে ডিঙা ভাসাইবার রূপকথা মাত্র। জনসাহিত্যে সাধারণ জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রসার মাত্র থাকে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যে থাকে সুপরিণত সমাজ-জীবনের গভীরতা। বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালীর জাতীয় চবিত্র-বৈশিষ্ট্য যথা—হৃদয়বত্তা, ভাবপ্রবণতা, তীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক বুদ্ধি, কর্মফলে বিশ্বাস, তন্ত্রে আসক্তি, অনুষ্ঠান-প্রিয়তা, মাধুর্য-সাধনা প্রভৃতির প্রকাশ থাকিলে তবেই তাহাকে বাঙ্গালীব জাতীয় কাব্য বলা চলে। বলা বাহুল্য, মঙ্গলকাব্যে ইহার কিছুই নাই। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিচয়ও নাই। কোনো ভৌগোলিক আঞ্চলিক চিত্র বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইহাতে দেখা যায না, কৌলীন্য, অববোধ-প্রথা, সতীদাহ-প্রথা, গঙ্গাসাগবে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি বঙ্গীয় সমাজ-চিত্রও নাই, কোনো প্রচ্ছন্ন জাতীয় ইতিহাসও নাই। মুসলমানযুগেব বাঙ্গালীবা ধনপতি সদাগবেব মতো সমুদ্রযাত্রা করিয়া উপকূল-বাণিজ্য করিত এবং বাঙ্গালী নারী বেহুলার মতো নৃত্যপটীয়সী হইত ও বিধবা হইলে স্বামীব শবের সহিত নদীতে ভাসিয়া যাইত, কিংবা নারীবা রঞ্জাবতীর মতো পুত্রকামনায় প্রাণবলি দিত, অথবা লখাই বা ধুমসীব মতো নারীরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুরুষদের সহিত যুদ্ধ করিত—মঙ্গলকাব্য পাঠ করিয়া এইরূপ ধারণা করার কোনো যুক্তি নাই। মঙ্গলকাব্যের জগৎ অপরিণত মনের কল্পনা-বিলাস মাত্র। মঙ্গলকাব্যকে বাংলার জাতীয় ইতিহাস বলা চলে না।

হিন্দু-পুরাণের ভঙ্গিতে নূতন দেবতার পূজা-প্রচার মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-

অবতারণার উদ্দেশ্য। কাহিনীর পরিবেশেও পৌরাণিকতা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে; সেইজন্য মূল কাহিনীতে যথাসম্ভব প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যান এবং মন্তব্য সমর্থনের দৃষ্টান্ত হিসাবে বহু পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। তাই বলিয়া মঙ্গলকাব্যকে সত্যকার হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্য বলা চলে না। তাহার কারণ, মনসা, শীতলা, ধর্মঠাকুর, বাসুলী, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীতে পৌরাণিক দেবতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের অনার্যত্ব সুপরিস্ফুট।* যদিও শিব ও চণ্ডী মূলে আর্য-দেবতাই বটেন, কিন্তু তাঁহারা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তাঁহাদের আর্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পাপপুণ্য-চেতনা এবং কর্মফলে বিশ্বাস—পৌরাণিকতা ও আর্যত্বের কষ্টিপাথর। পাপের ফলে অধোগতি ও নরকযন্ত্রণা এবং পুণ্যের ফলে ঊর্ধ্বগতি ও স্বর্গসুখ—এই বিশ্বাসই আর্যদিগকে অনার্য হইতে পৃথক করিয়াছে, এই বিশ্বাসই আর্যদিগকে চরিত্রবান, শক্তিমান ও মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আর্যপুরাণের দেবতারাও শাশ্বত ধর্মবিধির অধীন ও কর্মফল-ভোক্তা। ধর্মবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার করিলে ইন্দ্রেরও ইন্দ্রত্ব নষ্ট হয়, ব্রহ্মারও শিরশ্ছেদ ঘটে। মঙ্গলকাব্যে এই কর্মবাদকে অস্বীকার করা হইয়াছে এবং দেবতাদের যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। ক্রূরতা, স্বার্থপরতা, পূজা-নৈবেদ্যের প্রতি লোভ, স্বার্থের জন্য পক্ষপাতিত্ব ও প্রতিহিংসা—এই সকল পশু-ধর্ম মঙ্গলকাব্যের দেবতা চরিত্রে সুস্পষ্ট। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী লক্ষণ-বিচারে মঙ্গলকাব্যের দেবতা, আসলে অমঙ্গল দেবতা বা দেববেশী অপদেবতা মাত্র। হিন্দু পুরাণে প্রধান প্রধান দেব-লক্ষণ বা ঐশ্বর্য হইতেছে শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। মঙ্গলকাব্যের দেবতায় ইহাদের চিহ্নমাত্র নাই। ইহাদের অতিমানবীয় শক্তি আছে, অথচ অতি-মানবীয় মহত্ত্ব দূরে থাকুক, মানবীয় মহত্ত্বও নাই। যে সকল পাপে পুরাণে মানবের জন্য নরকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহারা তদধিক পাপ করিয়াও স্বর্গচ্যুত হন নাই। তথাপি মঙ্গলকাব্যের কবি ও জনসাধারণ এই সকল দেবতার প্রতি শ্রদ্ধানত হইয়া ইহাদের পূজা প্রচারে অত্যুৎসাহী

---

* মনসার আর্যত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন রুদ্রের ক্রোধ 'মনা'কে লইয়া তাহার সহিত সরস্বতী, নির্ঋতি, ময়ূরী, প্রভৃতি মিশাইয়া এক দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনসাকে পৌরাণিক দেবী বলিতে পারেন নাই।

হইয়াছেন। এই প্রকার অপাত্রে শ্রদ্ধা বঙ্গীয় জন-চরিত্রের শোচনীয় হীনতাই প্রকাশ করে। বসন্তরোগকে 'শীতলা মায়ের অনুগ্রহ' বলার মতো অমঙ্গল-দেবতাকে 'মঙ্গল-দেবতা' বলার মধ্যে প্রকাশ পায় বাঙ্গালীর ভীরুতা ও তোষামোদ-প্রবৃত্তি।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী অপদেবতার ন্যায় ইতর বটে কিন্তু এই ইতরতার তারতম্য আছে। মঙ্গলকাব্যের শিব ইন্দ্রিয়াসক্ত কামুক মাত্র কিন্তু পূজা-লোভী নহেন, সুতরাং পূজা আদায়ের জন্য অন্য দেবতা বা মানবের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ নাই। ধর্মঠাকুর কামুক নহেন, তবে পূজা-লোভী ও পক্ষপাতী—প্রথম হইতেই তাঁহার লাউসেনের পক্ষপাতিত্ব করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। চণ্ডী স্বেচ্ছাচারিণী ও অকারণ পক্ষপাতের প্রতিমূর্তি। পূজার ব্যাপারে ধর্মঠাকুর চণ্ডীর সহিত এবং চণ্ডী শিবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বটে কিন্তু কোনো মানুষের সহিত ইঁহাদের বিরোধ নাই। সর্বাপেক্ষা ইতরতা দেখাইয়াছেন মনসা। ইঁহার কুটিলতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার তুলনা নাই; ইনি কোনোদিক দিয়াই সর্প-চরিত্রকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইঁহার বিরোধ দেবতার সঙ্গেও নহে, মানুষের সঙ্গে। শিব ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত 'মঙ্গল'-দেবতারই পূজা-আদায়ের জবরদস্তি-মূলক ইতরতা দেখা যায়। মনসা সাপের ভয় ও শীতলা বসন্তের ভয় দেখাইয়া থাকেন। ধর্মঠাকুব কুষ্ঠরোগের, দক্ষিণ রায় বাঘের এবং সত্যপীর ও চণ্ডী সর্বনাশের ভয় দেখান। এইজন্য মঙ্গলকাব্যের দেবতা পূজকদিগের ভয়েরই পাত্র, প্রীতির পাত্র নহেন। জনসাধারণ স্পষ্টই বুঝিয়াছে—ইহলোকে সাংসারিক ভালো-মন্দের সহিত এই দেবতাদিগের সম্পর্ক মাত্র, ঐহিক উৎপীডন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ইঁহাদিগকে নৈবেদ্যের ঘুস দিতে হইবে, তাহার পরে পরলোকে ইঁহাদের সহিত কোনো সম্পর্ক নাই। পারত্রিক শক্তিহীনতার জন্য মঙ্গলকাব্যের কোনো দেবতা কাহারও ইষ্টদেবতার স্থান গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সেইজন্য কোনো মঙ্গলকাব্যকে ধর্মীয় গ্রন্থ, সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বলা চলে না।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন—রাজনৈতিক কারণেই মঙ্গলকাব্যে দেব-চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়াছে। পাঠান আমলে মুসলমান ধর্মপ্রচারে বিজিত

হিন্দুজাতির উপর যে উৎপীড়ন চলিয়াছিল তাহাতে জনসাধারণ দেবতাগণকে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী রূপে ধারণা না করিয়া পারে নাই—"রাষ্ট্রপোষিত এই মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের তদানীন্তন আপামর জনসাধারণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল। তখনই মঙ্গলকাব্যের মৌলিক ধর্ম ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ কাহিনীগুলির মধ্যে এক অলৌকিক দৈব শক্তির পরিকল্পনা করিয়া ঐহিক জীবনের সকল দুঃখদুর্দশা তাহাদেরই ইচ্ছাধীন বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস দেখা দিল।"[১] কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। মুসলমান যুগেই যে বাঙ্গালায় প্রথম সর্পপূজা ও দানবপূজার প্রচলন হইয়াছে তাহা নহে। এইরূপ পূজা প্রবর্তনের জন্য জনসমাজের উপর রাজনৈতিক বা সামাজিক অত্যাচারের প্রয়োজন হয় না। সর্প-পূজা, ভূত-পূজা বা দৈত্য-পূজা সকল দেশেরই আদিম সামাজিক প্রথা। দেবতা সম্বন্ধে আদিম ধারণাই ইহার জন্য দায়ী।

মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিতে হইলে ভুলিলে চলিবে না যে ইহা জন-সাহিত্য—সুপরিণত ও সুসংস্কৃত মনের পরিচয় এখানে পাওয়া যাইবে না। মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় সূক্ষ্ম কিংবা রামায়ণের মতো গভীর জীবন-রস ফুটাইয়া তুলিবে—এইরূপ প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইহার নিজস্ব রসবৈশিষ্ট্য আছে। ইহা প্রাণধর্মী, জৈব-উত্তেজনাপূর্ণ ও জনতা-মনস্তত্ত্ব সঙ্গত। উত্তেজক হইলেও ইহার কাহিনীতে ও চরিত্রে একটা আদিম সরলতা আছে। অক্ষরপরিচয়হীন কৃষকসম্প্রদায় সারাদিন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় অবসর বিনোদনের জন্য যে কাহিনী শুনিতে চাহিয়াছে তাহা তাহাদের পক্ষে দুর্বোধ হইলেও চলিবে না, অনুত্তেজক হইলেও চলিবে না। পদ্ম মধুর স্বাদ ও সৌরভ ইহাদের মন স্পর্শ করিতে পারে না, তীব্র ঝাঁজালো সুরাই ইহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে। যাহারা সুন্দরবনে গাছ কাটিয়া জমি আবাদ করিয়াছে, সাপ, বাঘ ও কুমীর তাড়াইয়া যাহাদিগকে বসবাস করিতে হয়, তাহাদের কাছে বৈষ্ণবপদাবলীর বা রবীন্দ্রকবিতার সূক্ষ্ম কবিত্ব সম্পূর্ণ অসত্য ও অর্থহীন মনোবিলাস মাত্র। কলহের বা মারামারির উত্তেজনা কিন্তু তাহাদের অতি প্রিয়। বাঘের সহিত কালকেতুর লড়াই,

---

১ পৃঃ ৮ বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

লাউসেনের কুম্ভীর বধ ও গণ্ডার হত্যা, চাঁদসদাগরের সঙ্গে মনসার ঝগড়া, অথবা চাঁদ কর্তৃক হেঁতালের লাঠিতে মনসার কাঁকাল ভাঙ্গিয়া দেওয়া—তাহাদের কাছে অধিক সত্য ও আমোদের বস্তু। এই সকল কাহিনীতে তাহাদের স্থূল বীররসের আস্বাদন ঘটে। তাহাদের জগতে প্রেম-কাহিনীরও বৈশিষ্ট্য আছে। সত্যকার প্রেম অপেক্ষা প্রেমের ছলনার দ্বারা প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে বোকা বানাইয়া কৌতুক সৃষ্টি, মঙ্গলকাব্যের শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকতর উপাদেয়। শিবায়নের দুর্গা বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে লম্পট শিবকে প্রেমমুগ্ধ করিয়া বোকা বানাইয়াছেন, মনসামঙ্গলে মনসা যৌবন-সৌন্দর্যে চাঁদকে ভুলাইয়া তাহার মহাজ্ঞান হরণ করিয়াছেন, ধর্মমঙ্গলে নয়ানী এবং গোলাহাটের নারীগণ লাউসেনকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজেরাই পরাজিত হইয়াছে। তাছাড়া যে ঔদরিকতা ও রসনানন্দ ভদ্ররুচিতে অশোভন ও অশ্লীল বলিয়া গণ্য, তাহাকেই মঙ্গলকাব্যে পরম উপাদেয় রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কালকেতুর বর্বরোচিত ভোজন বর্ণনায় কবি পরম উৎসাহ অনুভব করিয়াছেন ; পাক-প্রণালীর বর্ণনার আতিশয্য তো আছেই। মঙ্গলকাব্য আদিম মনে কতখানি আনন্দ দিতে পারে তাহার আভাস পাওয়া যায় মৈমনসিং-গীতিকায় দস্যু কেনারামের উপাখ্যানে। মনসামঙ্গল শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া বর্বর দস্যু কেনারাম তাহার দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই কেনারাম যদি সরল অশিক্ষিত বর্বর না হইয়া শিক্ষিত দস্যু হইত, তাহা হইলে শত শত মনসামঙ্গলেও তাহার জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিত না। মঙ্গলকাব্যের প্রকৃত সাহিত্যিক-সার্থকতা দেখিতে হইলে সমাজেব আদিম জীবনেই তাহা দেখিতে হইবে। পণ্ডিতের কাছে যাহা তুচ্ছ ও সামান্য, মঙ্গলকাব্যের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে সেই-গুলিই জ্ঞাতব্য ও চিত্তাকর্ষকরূপে গণ্য হইয়াছে। ইতিহাস-বিজ্ঞান-ভূগোলের যাহা প্রাথমিক জ্ঞান ও বালকের জ্ঞাতব্য তথ্য তাহাই সবিস্তারে পরিবেশন করা হইয়াছে মঙ্গলকাব্যে। ফুলের তালিকা, পাখীর তালিকা, গাছের তালিকা, তীর্থস্থানের দেবতার তালিকা, বিভিন্ন দেশের আচারব্যবহার, বিভিন্ন ঔষধের উপকারিতা, নারীদের বশীকরণ, চোরের সিঁদকাটার মন্ত্র প্রভৃতি বিচিত্র তথ্যের প্রচার করিয়া পল্লীজীবনে সর্বার্থসাধক সর্বজ্ঞের আসন গ্রহণ করিয়াছে মঙ্গল-কাব্য। যেমন রামায়ণ-মহাভারতে প্রাচীন ভারতের সমগ্র শিক্ষিত জনসমাজের

পূর্ণ মানস পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি প্রাচীন বঙ্গের পল্লীর নিম্নজীবনের সমগ্র বাণী একত্র নিঃশেষে প্রকাশিত হইয়াছে মঙ্গলকাব্যে। এইখানেই মঙ্গল-কাব্যের গুরুত্ব।

নেপথ্য-বার্তা

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

মঙ্গল নাম দেখিয়াই কোন কাব্যকে মঙ্গলকাব্য গোত্রীয় মনে করা সঙ্গত নহে। বিশিষ্ট ও সংকীর্ণ অর্থেই মঙ্গলকাব্য শব্দ ব্যবহৃত হয়। লৌকিক গ্রামদেবতাব মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্যকেই 'মঙ্গলকাব্য' বলা হইয়া থাকে। 'মঙ্গল' শব্দেব প্রসারিত অর্থে খাঁটি পৌরাণিক কাব্য, বৈষ্ণব-চরিত কাব্য ও অন্যবিধ কাব্যেব নামেও মঙ্গল শব্দ চলিয়া গিয়াছে। গৌরীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল গ্রন্থগুলি বিভিন্ন পুবাণ হইতে গৃহীত পৌবাণিক দেবতাব মাহাত্ম্য-সূচক পৌরাণিক কাব্য মাত্র। কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কপিলামঙ্গল. কাব্য-গুলিও ভাগবতহইতে সংগৃহীত অনুবাদ-সাহিত্য। চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি ব্যক্তি-মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবচরিত-গ্রন্থেব অন্তর্গত। আবার স্থানমাহাত্ম্য-বিষয়ক গ্রন্থ হইতেছে 'তীর্থমঙ্গল'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ লৌকিক মানবজীবন-কাব্য যে মঙ্গল নামের ছদ্মবেশ ধাবণ করিতে পারে তাহাব দৃষ্টান্ত কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। এই সকল কাব্যে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য জনসাহিত্য-ধর্ম নাই সুতরাং ইহারা ঠিক মঙ্গলকাব্য-গোত্রীয় নহে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—"সমসাময়িক মঙ্গল কাব্যগুলির প্রভাববশতঃ ইহাদিগকেও মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে।"[১] উল্লিখিত কাব্যগুলি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী-সাহিত্য মাত্র, কেবল অন্নদামঙ্গল ও কালিকা মঙ্গল সভা-সাহিত্য।

প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্য—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল. ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন।

---

১ পৃ: ৮০ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

(ইহাদের সম্বন্ধে যথাক্রমে দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।)

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য হইতেছে—শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল ও গোসানীমঙ্গল।

শীতলামঙ্গল কাব্য বসন্তরোগের অধিদেবতা শীতলা দেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক। শীতলামঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম, মাণিক্ গাঙ্গুলী, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজগোপাল, শ্রীবল্লভ, শঙ্কর ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। কৃষ্ণরাম সপ্তদশ শতকের ও অন্যান্য সকলেই অষ্টাদশ শতকের কবি। শ্রীবল্লভ ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পাঁচালীই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। শীতলা-কাহিনীর পালা গোকুল পালা, বিরাট পালা ও চন্দ্রকেতুর পালা। প্রথম দুইটি পালার কবি নিত্যানন্দ এবং শেষোক্ত পালার কবি শ্রীবল্লভ। গোকুল পালায় দেখা যায়, শীতলা-পূজা না করায় গোকুলের অধিবাসিগণের এমন কি কৃষ্ণ-বলরামেরও বসন্তব্যাধি এবং শেষপর্যন্ত শীতলা-পূজার দ্বারা এই ব্যাধির উপশম। বিরাট পালাতেও এই একই ব্যাপার, কেবল গোকুলের পরিবর্তে বিরাট নগরে এইরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে। চন্দ্রকেতুর পালায় মনসামঙ্গল কাহিনীর অনুকরণ দেখা যায়, চাঁদ সদাগরই শীতলামঙ্গলে চন্দ্রকেতু হইয়া দেখা দিয়াছে এবং দেবীপূজা না করার ফলভোগ করিয়া শেষে শিবের আদেশে শীতলা-পূজা করিয়াছে, রাজপুত্রবধূ চন্দ্রকলা করিয়াছে বেহুলার অনুকরণ। কৃষ্ণরামের শীতলা-পাঁচালীর নূতনত্ব আছে। উহাতে শীতলার পুত্র বসন্ত রায়ের দ্বারা মদন রায় বেপারীকে ছলনা ও তৎফলে শীতলার মন্দির প্রতিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠীমঙ্গলের ষষ্ঠীদেবী শিশু-রক্ষয়িত্রী ; তাঁহার শিশুরক্ষার কাহিনীও শিশুজনোচিত। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরামই ষষ্ঠীমঙ্গলের প্রথম কবি। অষ্টাদশ শতকের কবি হইতেছেন রুদ্ররাম চক্রবর্তী, এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের কবি রামধন চক্রবর্তী। কৃষ্ণরামের কাব্যের কাহিনী হইতেছে ষষ্ঠীর নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিবার অপরাধে কালো বিড়ালের দ্বারা সায়বেণের পুত্রবধূর শিশু অপহরণ এবং ষষ্ঠীপূজার ফলে অপহৃত পুত্র প্রত্যর্পণ। রুদ্ররামের ষষ্ঠীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি—প্রথমটি পৌরাণিক, দ্বিতীয়টি লৌকিক, ইহাতে

ষষ্ঠীপূজার ফলে কোলাঙ্ক দেশের রাজ্যচ্যুত রাজা ক্ষেত্রমিশ্রের পুত্রলাভ ও রাজ্য-উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ বায় হইতেছেন রায়-মঙ্গল কাব্যের দেবতা। শীতলা-মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল রচয়িতা কৃষ্ণরামই রায়মঙ্গলের বিখ্যাত কবি। রায়মঙ্গলে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে অন্য ব্যাঘ্রদেবতা বড়খাঁ গাজী এবং কুম্ভীরদেবতা কালুরায়ের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। রায়মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই অনুকৃতি। ধনপতির বদলে বণিক দেবদত্ত ইহার নায়ক এবং ইহাতে নায়কের 'কমলে-কামিনী'র পরিবর্তে সুন্দরবন দর্শন এবং শ্রীমন্তের পরিবর্তে পুষ্পদত্তের পিতৃ-অন্বেষণে যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার নূতনত্ব হইতেছে ব্যাঘ্র সৈন্যসহ দুই ব্যাঘ্রাধিপতি দক্ষিণ রায ও বড়খাঁ গাজীর লড়াই, এবং কোরানপুরাণধারী অর্ধ-কৃষ্ণ পয়গম্বরের দ্বারা যুদ্ধ-মীমাংসা।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলের কোনরূপ নিন্দা করিবার উপায় নাই, কারণ স্বয়ং দক্ষিণ রায় স্বপ্নে কবিকে বলিয়াছেন—

তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে॥

রায়মঙ্গলের অপর কবি অষ্টাদশ শতকের রুদ্রদেব।

সারদামঙ্গলে সরস্বতী-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সারদামঙ্গলের প্রধান কবি অষ্টাদশ শতকের দয়ারাম। সরস্বতী বৈদিক দেবী হইলেও সারদামঙ্গলে লৌকিক কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বজন্মের পাপের জন্য রাজপুত্র লক্ষধরের মূর্খত্ব ও বনবাস, ধূলাকুট্যা নাম ধারণ করিয়া বৈদের রাজ্যে রাজকন্যাগণের ভৃত্যরূপে অবস্থান, সরস্বতীপূজার দিনে চোর মনে করিয়া ছদ্মবেশিনী সরস্বতীকে প্রহার, দেবীর বরদান ও বিদ্যালাভ এবং শেষ পর্যন্ত রাজকন্যাগণের সহিত তাহার বিবাহ ও রাজত্বপ্রাপ্তি—ইহাই দয়ারাম-রচিত সারদামঙ্গলের কাহিনী। দয়ারাম ব্যতীত অন্যান্য কবি হইতেছেন—বীরেশ্বর, মুনিরাম ও রাজা রাজসিংহ। রাজসিংহ ও মুনিরামের কাব্যে কালিদাস-বিক্রমাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিংহের কাব্যের নাম 'ভারতীমঙ্গল'।

গোসানীমঙ্গলের গোসানী হইতেছে চণ্ডীদেবীর কবচ। এই কবচই কুচবিহারের গোসানীমারি গ্রামের গ্রামদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। ইহার

মাহাত্ম্য-সূচক কাব্যই গোসানীমঙ্গল; লেখক ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের কবি রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী। গ্রন্থটি চণ্ডীমাহাত্ম্যেরই অন্তর্গত। কুচবিহারের একগ্রামে দরিদ্র প্রজার পুত্ররূপে কান্তেশ্বরের জন্ম, বাল্যে এক ব্রাহ্মণের রাখাল-গিরি, চণ্ডীদেবীর কৃপায় উঁহার কামতা রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, মৃত্তিকার ভিতর হইতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত ভগদত্তের হস্তাস্থি হইতে চণ্ডীদেবীর 'গোসানী কবচে'র উদ্ধার এবং কামতা রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গোসানীকে প্রতিষ্ঠা। ইহাই গোসানীমঙ্গলের কাহিনী।

বঙ্গ সাহিত্যের অপরিণত ও পঙ্গু মঙ্গল-সাহিত্য রূপে কয়েকটি পাঁচালী বা ছড়াকেও দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত হইতেছে—সত্যপীরের পাঁচালী, মাণিক পীরের ছড়া, গাজীমঙ্গল, কিরীটী মঙ্গল (কিরীটিকোনার দেবী মাহাত্ম্য), সূর্যের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, সুবচনীর পাঁচালী, 'লক্ষ্মীচরিত্র', 'রাজবল্লভীর কথা', 'যোগাদ্যার বন্দনা' ও কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খপরিধান ছড়া।

দশম অধ্যায়

মনসামঙ্গল

বঙ্গসাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি প্রকৃতপক্ষে কাব্য নহে—বস্তুসর্বস্ব আখ্যায়িকা মাত্র। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি আখ্যান-কাব্যের সহিত ইহাদের তুলনা চলে না। কাহিনী উপলক্ষ করিয়া পাঠকচিত্তে সৌন্দর্যবোধ ও মহৎভাবের উদ্দীপনই প্রকৃত কাব্যের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হয় নাই। জনগণের চিত্তে কতকটা জৈব উত্তেজনা-সৃষ্টিই ইহার উদ্দেশ্য। কাব্যের সূক্ষ্ম মানস-আনন্দ এক্ষেত্রে কবি ও শ্রোতা কাহারো কাম্য নহে। এই কারণেই রসজ্ঞ সমালোচক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথাকথিত শ্রেষ্ঠমঙ্গলকবি[1] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকেও অকুণ্ঠভাবে কবি বলিতে পারেন নাই, বলিয়াছেন—"শরীরের কবি।" "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত মুকুন্দরাম হৃদয়ের সুগভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারও বিরহবেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক, সে মিলনে দেহই বাঁচিয়া গিয়াছে।...কবিকঙ্কণ বিরহবিধুরা-দিগের রুদ্ধ নিঃশ্বাস বড় অনুভব করেন নাই, বিরহিণীদ্বয়ের কীলাকীলি দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বোধ করি হৃৎকম্প হইয়াছিল, দূর হইতেই তাই তিনি কাজ সারিয়াছেন।...মুকুন্দরাম উদার সিন্ধুর বিশেষ বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অনেকগুলির জায়গার নাম করিয়াছেন মাত্র। কবি হইলে সিন্ধুর ভাবে তাঁহার কল্পনা উদ্দীপিত হইত সন্দেহ নাই।"[2] বলা বাহুল্য, বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা কেবল মুকুন্দরাম সম্বন্ধে নহে, অধিকাংশ মঙ্গল-কবি সম্বন্ধেই সমভাবে প্রযোজ্য।

জৈব দ্বন্দ্বই মঙ্গলকাব্যের উত্তেজনা-সৃষ্টির উপকরণ। এই দ্বন্দ্বই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রে ইহা মনসা ও চাঁদসদাগর উভয়ের পরস্পরের শক্তি-প্রতিযোগিতা রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

১ "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত কবি বলিতে মাত্র দুইজন—এক মুকুন্দরাম ও দ্বিতীয় ভারতচন্দ্র।" পৃঃ ৩৯৮ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

২ ভারতী ১২৯৬

চণ্ডীমঙ্গলে ইহা লহনা-খুল্লনার পারিবারিক সপত্নী-দ্বন্দ্বে পরিণত হইয়াছে, ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের বাধাবিপত্তিবিজয়ে পর্যবসিত হইয়াছে এবং শিবায়নে শিবদুর্গার দাম্পত্যকলহ রূপে দেখা দিয়াছে। কাব্য-বর্ণিত অবান্তর বস্তুপুঞ্জ এবং উপাখ্যানাংশ বাদ দিয়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মূল আখ্যায়িকা বিচার করিলে দেখা যায়—মনসামঙ্গল হইতেছে সেকালের থ্রিলার বা উত্তেজনা-কাহিনী, ধর্মমঙ্গল হইতেছে অ্যাডভেঞ্চার চিত্র, চণ্ডীমঙ্গল হইতেছে সামাজিক উপন্যাস এবং শিবায়ন হইতেছে পারিবারিক ছোট গল্প। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে—এগুলি আধুনিক যুগের কথা-সাহিত্য নহে, ইহাদের মধ্যে কাহিনীসংহতিও নাই চরিত্র-চিত্রণও নাই, বাস্তবানুসরণও নাই। উপরন্তু এইগুলিতে কাহিনীর অঙ্গ-স্বরূপে মধ্যে মধ্যে শিশুকাব্য বা রূপকথার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই সংযোজনের উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্যের অস্বস্তিকর কাহিনীকে মধ্যে মধ্যে বিস্ময়-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া জৈব উত্তেজনার উপর স্বস্তি ও শান্তির প্রলেপ প্রদান। একমাত্র শিবায়ন ছোট গল্প বলিয়া এবং ইহার উত্তেজনা মৃদুতম বলিয়া ইহাতে রূপকথা সংযোজনের আবশ্যকতা হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলে রূপকথার দৃষ্টান্ত স্বর্ণগোধিকা-কাহিনী এবং কমলে কামিনীর বৃত্তান্ত, ধর্মমঙ্গলে রূপকথার দৃষ্টান্ত রঞ্জাবতীর শালেভর পালা এবং লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয় প্রদর্শন। মনসামঙ্গলের রূপকথাই সর্বাধিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বেহুলা-লখীন্দরের সুদীর্ঘ কাহিনীই হইতেছে মনসামঙ্গলের রূপকথা। চাঁদ ও মনসার যুদ্ধের উত্তেজনা সর্বাপেক্ষা সুতীব্র বলিয়াই ইহাতে প্রগাঢ়ভাবে রূপকথা প্রলেপের প্রয়োজনীয়তা ছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের উত্তেজনা এবং রূপকথার বিস্ময়সৌন্দর্য—জনমনের এই দ্বিবিধ বাসনার পরম পরিতৃপ্তি দিয়াছে বলিয়াই মনসামঙ্গল কাব্য সমস্ত মঙ্গল-গ্রন্থাবলীর মধ্যে হইতে পারিয়াছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জন-সাহিত্য।

মনসা-শক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রচারই মনসামঙ্গলের উদ্দেশ্য। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা-বিদ্বেষী চাঁদসদাগরের উপর বারংবার মনসাদেবীর প্রতিহিংসা গ্রহণ চিত্রিত হইয়াছে। শিবভক্ত চাঁদ দুর্বল নহে, কিন্তু তাহার শক্তি লৌকিক, মনসার শক্তি অলৌকিক। উভয়পক্ষের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পর্যবসিত হয় নাই, চাঁদের জীবনই হইয়াছে যুদ্ধক্ষেত্র, তাহাতে দেখা দিয়াছে মেঘনাদের যুদ্ধের ন্যায় অদৃশ্য সংগ্রাম। মনসার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে চাঁদের নানা আকস্মিক

বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু জীবনাদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বারংবার দুঃখ-বরণেই হইয়াছে চাঁদের শক্তিবিকাশ। মনসাই চাঁদের নিয়তি এবং চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব আসলে পুরুষকার ও নিয়তির দ্বন্দ্ব। কাব্যের এই দ্বন্দ্ব দেশকালাতীত ও সর্বজনীন। তৎসত্ত্বেও মনসামঙ্গলের যুদ্ধ বর্বরোচিত, অত্যুগ্র ও ভয়ঙ্কর। চাঁদের উপর মনসার উৎপীড়ন মাত্রাতিরিক্ত; চাঁদের অর্থনাশ, পুত্রনাশ, অবমাননা এবং ক্রমাগত শারীরিক নির্যাতন পাঠকের চিত্তে রসের হানি ঘটায় ও উৎকট আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মনসার ক্রমাগত বীভৎস গুপ্তহত্যা, ঘৃণ্য প্রতারণা, পৈশাচিক প্রতিহিংসা পাঠক-হৃদয়ে অতি-মাত্র আঘাত করে; দানবীয় শক্তি যেন মানব-হৃদয় লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে থাকে ও প্রতি মুহূর্তে প্রাণের মূল্য পাঠককে জানাইয়া দেয়। মনসামঙ্গলের ন্যায় এইরূপ ভয়ানক ভাবের ট্র্যাজেডি বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্লভ। সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে কোনোখানে স্নেহ, প্রেম, ক্ষমার সামান্যতম অবকাশও ইহাতে নাই। বোধহয় যেন, মাথার উপর সর্বত্র মনসার সর্পিল হিংস্রতা ক্রূর দৃষ্টিতে ফণাবিস্তার করিয়া সদা-জাগ্রত রহিয়াছে। শেষে যদিও এই কালরাত্রির অবসান হয়, তথাপি আনন্দের সূর্যালোক ফুটিয়া উঠে না, শেষ পর্যন্ত একটা অবসাদময় ব্যর্থতা-বোধ কুয়াশার মতো কাব্যের চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাহার কারণ গ্রন্থসমাপ্তিতে নিয়তি-পুরুষকারের যুদ্ধে পুরুষকারকেই পরাজিত বলিয়া কবি ঘোষণা করেন এবং তৎফলে নিয়তির পশুবল মানুষের আত্মিক শক্তিকে ব্যঙ্গ করিয়া অট্টহাস্য করিতে থাকে।

মনসামঙ্গলের আদিতে শিবচণ্ডীর কাহিনী, মধ্যে চাঁদের সহিত মনসার সংগ্রামের কাহিনী এবং অন্তে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। মনসার জীবনই এই তিন কাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। শিবচণ্ডীর কাহিনীর মধ্যে রহিয়াছে মনসার বাল্যজীবনের ইতিহাস। মনসা নামে মাত্র দেবী, ইহার দেব-মর্যাদাও নাই, দেব-মাহাত্ম্যও নাই। ইহার সঙ্গিনীও আভিজাত্যহীনা দেবগণের ধোপানী মাত্র। মনসা-চরিত্রে জ্ঞান-বৈরাগ্য, ভক্ত-বাৎসল্য প্রভৃতি দেবগুণ নাই—এমনকি দয়া মমতা প্রেম প্রভৃতি মানবীয় গুণেরও একান্ত অভাব। তাহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য সরীসৃপ-ধর্ম। সুতীব্র ঈর্ষা, প্রচণ্ড লোভ, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা তাহার মজ্জাগত। বিন্দুমাত্র ক্ষমা, সহিষ্ণুতা বা স্বার্থত্যাগ তাহার

চরিত্রকে কোনোখানে স্নিগ্ধ-কোমল করিয়া তুলিতে পারে নাই। দেবসভায় লখীন্দরের হত্যার দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া নির্জলা মিথ্যা বলিতেও মনসা কুণ্ঠিত নহে।[১] স্বভাবে ও ধর্মে সরীসৃপ হইয়াও অন্য দেবতার সহিত সমান আসন পাইবার লোভে হীনতার সর্ব নিম্নস্তরে নামিতেও তাহার দ্বিধা সঙ্কোচ নাই, বারাঙ্গনার ন্যায় নিজের যৌবন-সৌন্দর্যে চাঁদকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার মহাজ্ঞান হরণ করিয়াছে। তাহার ভীরুতারও সীমা নাই। মুখের আস্ফালনে এবং গুপ্ত হত্যাতেই সে পারদর্শিনী—চাঁদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার বীর্য ও সাহস তাহার নাই। আঘাতপ্রাপ্ত হইলে সাধারণ সর্পও ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠে এবং শত্রুর সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করে, কিন্তু চাঁদকে দেখিবামাত্র—

> প্রাণ লইয়া মনসা উঠিয়া দিল রড ॥
> ত্রাসে যায় পদ্মাবতী আলুথালু চুলি।
> পাছে পাছে ধায় চান্দ 'ধর ধর' বলি ॥ —বিজয় গুপ্ত

পরিশেষে চাঁদ যখন বেহুলার অনুরোধে মনসার পূজা করিতে সম্মত হইয়াছে তখনও মনসার প্রহারের ভয় দূর হয় নাই—

> যদি মোর পূজা তো করিবে চাঁদ বাণ্যা।
> হেঁতালের বাড়ি গাছি দূরে ফেল টান্যা ॥ —কেতকা দাস

শুধু ভীরু নহে, মনসা নির্বোধও বটে। তাহার যদি বুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে চাঁদের মহাজ্ঞান থাকিতে ও চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরি জীবিত থাকিতে কখনই চাঁদের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে যাইত না এবং বারবার তাহাকে পরাজিত ও অপদস্থ হইতে হইত না। মনসা চাঁদের শক্তিও বুঝে না, নিজের শক্তিও বুঝে না; বুঝিতে পারে না যে, পশুবলের দ্বারা শ্রদ্ধার পূজা আদায় করা যায় না; বুদ্ধি থাকিলে বুঝিতে পারিত যে, শেষ পর্যন্ত তাহার সত্যকার পরাজয়ই ঘটিয়াছে—চাঁদের পূজাই তাহার পক্ষে চরম অবমাননা। কর্তার উদ্দেশ্যের উপরেই কর্মের ভালোমন্দ নির্ভর করে। চাঁদ সদাগরের যে মনসা-

---

১ পদ্মাবতী বলে—বাপ না কও বিস্তর। মোর নাগে না খাইছে চান্দের সুন্দর ॥ —ষষ্ঠীবর

কি কারণে দেবসভা বল এতগুলা। কেবা চিনে চাঁদ বাণ্যা লখাই বেহুলা ॥ —কেতকা দাস

পূজা, তাহা মনসার দিকে পিছন করিয়া বাম হস্তে পূজা, আসলে তাহা পূজাই নহে—ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভিক্ষা-দান মাত্র। এই পূজার সময়ে মনসা-চরিত্র অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। যে চাঁদ লাঠির আঘাতে তাহার কাঁকাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সর্বত্র পূজা পণ্ড করিয়াছে এবং অতি অশ্রাব্য ভাষায় বারংবার অপমান করিয়াছে[১], সেই পরম শত্রু চাঁদের নিকটে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার অপমানের জ্বালা পরিপাক করিয়া সর্পস্বভাবা মনসা কাতর অনুনয়বিনয় করিয়াছে—

মহাদেবের শিষ্য তুমি আমার হও ভাই।
আমাকে মন্দ বোলি তুমি বাড়াহ বড়াই॥…
তুমি পূজিলে মোকে পূজিবে সর্বলোকে।
তে কারণে এতেক বলিএ তোমাকে॥ —নারায়ণ দেব

এইখানেই মনসার অদৃষ্টের পরিহাস এবং এইখানেই সে বাস্তবিক হতভাগিনী।

চাঁদ সদাগরকে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মহাবীর প্রমিথিউস বা হারকিউলিস বলা চলে। তাহার শক্তি মনসার শক্তির ন্যায় পশুশক্তি নহে, তাহার শক্তি আত্মার শক্তি। চাঁদ আদর্শবাদী, ইষ্টদেবতায় অব্যভিচারিণী ভক্তিই তাহার শক্তির মূল। দুঃখবরণের কঠোরতম তপস্যাতেও চাঁদ বিজয়ী. মনসার অকথ্য নির্যাতন, বহুদিবসের অনাহার, সাতপুত্রের শোক, পত্নীর অনুনয়বিনয়, কিছুই তাহাকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই। সমুদ্রে তাহার নৌকাডুবি হওয়ায় মজ্জমান অবস্থায় যখন তাহার মৃত্যু আসন্ন, সেই সময়েও সে পৌরুষ হারায় নাই, পদ্মা-মনসার নাম-সম্পৃক্ত পদ্মফুল অবলম্বনে প্রাণরক্ষা করার অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই তখন তাহার কাছে শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এইরূপ মহৎ গম্ভীর সৌন্দর্যময় পৌরুষ-চিত্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর দেখা যায় না। যে হস্তে চাঁদ ইষ্টদেবতা পূজা করিয়াছে, সেই দক্ষিণ হস্তের মর্যাদা সে আজীবন রক্ষা করিয়াছে।[২] শেষকালে বেহুলার অনুরোধে যখন সে মনসা-পূজা করিয়াছে তখনও তাহার চরিত্রে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা বা হীনতা প্রকাশ

১ লুকাইয়া করে কাণী ধামনা ভাতার॥ …
ধামনা-ভাতারী তোর হিতাহিত নাই।
আমি তোর দেবকুলে ভাঙ্গিব বড়াই॥
—বিজয় গুপ্ত

২ পিছু দিয়া বাম হাতে তোমারে পূজিমু॥
শিবলিঙ্গ আমি পূজি যেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পুজিতে না লয় চিতে॥
—নারায়ণ দেব

পায় নাই, বরং ইহাতে চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যই বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে একদিকে প্রকাশিত হইয়াছে কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলার প্রতি তাহার কন্যাস্নেহ, অপরদিকে প্রকাশ পাইয়াছে শরণাগত পরম শত্রু মনসার প্রতি তাহার বীর হৃদয়ের ক্ষমা এবং প্রার্থনাপূরণের ঔদার্য। তাহার এই অপরাজিত মহত্ত্বের জন্য চণ্ডীমঙ্গলের বণিক ধনপতি সদাগর সামাজিক সম্মেলনে সর্বপ্রথম চাঁদকে পাদ্য-অর্ঘ্য দানে বরণ করিয়াছে। উপযুক্ত কবির হাতে পড়িলে চাঁদ সদাগরের জীবন মহাকাব্যে পরিণত হইতে পারিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরুষপরম্পরায় প্রচলিত এই মহামানবের জীবনকাহিনী ও চরিত্র-মহিমা কয়েকজন ক্ষুদ্রপ্রাণ মঙ্গল-কবি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা চাঁদকে স্থানে স্থানে নিষ্ঠুর নির্মম গোঁয়ারগোবিন্দ ও স্বার্থপর রূপে অঙ্কিত করিয়া তাহাকে হাস্য-কৌতুকের পাত্র করিয়া তুলিয়াছেন। কেতকা দাসের ধারণা—"নিষ্ঠুর শরীর তার নাহি মায়া মো।"[১] লখীন্দরের মৃত্যুতে চাঁদ নাকি 'হরষিত' হইয়া 'নাচিতে লাগিল' এবং তখন তাহার প্রস্তাব নাকি "মৎস্যপোড়া দিয়ে আজি খাব পান্তা ভাত॥"[২] বিজয় গুপ্ত দেখাইয়াছেন সদ্যোবিধবা পুত্রবধূ বেহুলার প্রতি চাঁদের নির্দেশ হৃদয়হীনতার পরিচায়ক—"লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ" এবং ইতরের মতো অভাগিনী বালিকাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে তাহার বাধে নাই—

> মাজুষে ভাসিতে তোরে লাগে পাবে ঘাটে।
> জলে মড়া ফেলাইয়া তোরে নিবে থাটে॥
> যাহার ঘরে যাবে তুমি সেই প্রাণেশ্বর।

চাঁদ-চরিত্রের সর্বাধিক অধঃপতন ঘটাইয়াছেন বিজয় গুপ্ত ও কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ। তাঁহাদের গ্রন্থে চাঁদ শেষকালে পরম ভক্তিভাবে মনসার স্তব-স্তুতি করিয়াছে। এই ঘটনা যে চাঁদের মতো বীর-চরিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক তাহা সর্পভয়ে ভীত ক্ষুদ্রপ্রাণ কবিগণ মোটেই বুঝিতে পারেন নাই।[৩] একমাত্র কবি নারায়ণ দেবই চাঁদ-চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন।

---

১ ও ২ পৃঃ ২০৪ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত মনসামঙ্গল (বাইশা)

৩ বিজয় গুপ্তের চাঁদ শেষ পর্যন্ত "প্রণাম করিল চান্দ করিয়া ভকতি।" তাছাড়া বলিয়াছে—

> যেই মুখে বলিয়াছি লঘুজাতি কাণী।
> সেই মুখে জন্ম দেও জগৎ-জননী॥

বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী হইতেছে মনসামঙ্গলের শান্তিপর্ব বা স্বস্তি-বাচন। ইহাই মূল-কাহিনীকে কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে এবং জয়-পরাজয়ের উত্তেজনাকে বাস্তব জগৎ হইতে রূপকথার জগতে টানিয়া লইয়া প্রশমিত ও পরিসমাপ্ত করিয়াছে। মৃত স্বামীর শবদেহ কোলে করিয়া বেহুলার যাত্রা আসলে এই রূপকথার স্বপ্নজগতের উদ্দেশেই যাত্রা, তাহার ভাসানের গাঙ্গুর নদী রূপকথাবই স্বপ্ন-বৈতরণী। মানবমনের বিস্ময় এবং সৌন্দয দিয়া এই রূপকথার জগৎ গঠিত—এখানে সম্ভব-অসম্ভবেব কোন বিবোধ নাই। এখানে নয়াঁহাডীতে বেহুলা ছয় বুড়ি লোহার কলাই অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পাবে এবং নিশ্ছিদ্র লোহার বাসরেব মধ্যে নেতেব আঁচলে আগুন জ্বালিয়া বরণের মঙ্গলভাঁড়ে নারিকেলের জলে ভাত রাঁধিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবেই লখীন্দরকে খাওয়ায়, এমনকি কালনাগিনী সর্প পর্যন্ত দংশন কবিতে আসিয়া বিনাদোষে আঘাত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে এবং লখীন্দবের পদাঘাত পাইযা, চন্দ্র-সূয সাক্ষী রাখিয়া তবেই দংশন কবে। রূপকথার জগতে ভূতপ্রেত, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী উদ্ভিদ-পশু সকলেই মানুষের সগোত্র, সকলেই মনুষ্যভাষা ব্যবহার করে এবং মনুষ্যবৎ আচরণ করে। ঠাকুবদাদার ঝুলির মালঞ্চমালার গল্পে দেখা যায়—মৃত স্বামীব সহিত সহমরণের চিতায় উপবিষ্ট মালঞ্চমালাকে ভূতপ্রেত আসিয়া বলিতেছে—'পচাঁ গলাঁ মড়াটাঁ ফেলেঁ দেঁ', নদীর হাঙ্গর কুমীর আসিয়া ঐ অনুরোধই বারবার জানাইতেছে। বেহুলার ভাসানে বেহুলাব প্রতি বাঘেব অনুনয়ও ঠিক ঐ প্রকার—

> দেও আমি মড়া খাই পেটের ভুখে মরি।
> মড়ুয়া খাইয়া মোর ক্ষুধা দূর করি॥ —ষষ্ঠীবর

রূপকথার রাজ্য পৃথিবী ও স্বর্গের মিশ্রণে রচিত আনন্দরাজ্য। এখানে পার্থিব দুঃখ-বেদনা-দুর্ভাগ্যের প্রকাশ আছে তবে তাহা জীবনকে লঘুভাবে স্পর্শ করিয়া যায়; জীবনে হিল্লোল মাত্র ঘটে, তাহাতে জীবনে দাগ কাটে না, আবর্ত হয় না, জীবনের তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত হয় না। পুষ্পমালার গল্পে ডাকাতের আক্রমণে পুষ্পমালার স্বামী চন্দনের মুণ্ড কাটা হইয়া যায় এবং পুষ্পমালাও উচ্চস্বরে রোদন করে বটে কিন্তু আনন্দের রাজ্যে এই দুঃখ স্থায়ী হইতে পারে না, শিবদুর্গার আকস্মিক আগমন ঘটে এবং চন্দনের কাটামুণ্ড জোড়া লাগিয়া

যায়। কাজেই মৃত লখীন্দরের যে পুনর্জীবন প্রাপ্তি হইবে, ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। রূপকথায় জগৎ অর্ধ-স্বর্গ বলিয়া এখান হইতে স্বর্গে যাতায়াত করা এমন কিছু কঠিন নহে। সেইজন্য বেহুলা নেতা ধোপানীর বোনঝি সাজিয়া স্বর্গে যাইতে পারে এবং স্বর্গ আনন্দভূমি বলিয়া বিরহ-বিধুরা বৈধব্য-পীড়িতা বেহুলা সেখানে নিঃসঙ্কোচে নাচিতে পারে, বিরহিণীর নৃত্য কাহারও দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। এই রূপ-কথার দৃষ্টি লইয়া দেখিলে তবেই মনসামঙ্গলের শুভ সমাপ্তির সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, উপন্যাস-জগতের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে মনসামঙ্গলের রসাস্বাদন সার্থক হইবে না।

মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যে প্রকৃত শক্তিশালী কবি তিনজন—নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত এবং কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রুচি ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কাহিনী বর্ণনায় নারায়ণদেবের দৃষ্টি নাট্যকারের, বিজয় গুপ্তের দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের এবং কেতকাদাসের দৃষ্টি কবির। সেইজন্য মনসামঙ্গলের প্রধান চরিত্র নারায়ণদেবের গ্রন্থে চাঁদ সদাগর, বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে মনসা এবং কেতকাদাসের গ্রন্থে বেহুলা। নারায়ণ দেবই চাঁদ চরিত্রকে পূর্ণতা দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—চাঁদ নিষ্কাম কর্মযোগী, পরম শত্রু আততায়িনী মনসার প্রতিও তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই, হরগৌরী-ভক্তিই তাহার মনসা-বিরোধিতার কারণ। চাঁদ চণ্ডিকামাতার আজ্ঞাবাহী সন্তান মাত্র, তাই শেষকালে মনসাকে অকপটে বলিতে তাহার বাধে নাই—

> তোমার সনে কোন্দল বাড়াইল চণ্ডী।
> তোমারে পূজিতে মা-ও হইল পাষণ্ডী॥
> মহাদেব-শিষ্য আমি, মা-ও পাগল।
> আমা পাগলের হাতে দিল হেমতাল॥…
> হেমতাল দিয়া মোরে পাঠাইল গৌরী।
> তান বলে আমি গিয়া ভাঙ্গি ঘট বারি॥

চাঁদের এই কৈফিয়ত তাহার অন্তরবাসী একটি মাতৃ-বৎসল শিশুকে দেখাইয়া দেয় এবং সমগ্র চাঁদ-চরিত্রকে একটি নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে। অপরপক্ষে মনসা-চরিত্রের সূক্ষ্ম রূপায়ণ বিজয় গুপ্তের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মনসামঙ্গলে ঠিক

মনসা-ভক্তি নহে, উহাতে মনসার প্রতি কবিচিত্তের করুণা ও সহানুভূতিই বেশী প্রকাশিত হইয়াছে। কবির দৃষ্টি মনসাতেই কেন্দ্রীভূত, তিনি নিপুণভাবে মনসার জন্ম, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং মনসার ক্রুর স্বভাবের মনস্তাত্ত্বিক কারণ চিন্তা করিয়াছেন। কবি দেখাইয়াছেন, বাল্যে মাতৃ-হীনতা ও বিমাতার দুর্ব্যবহার এবং যৌবনে স্বামি-প্রেমের ব্যর্থতাই মনসার চারিত্রিক হিংস্রতার জন্য দায়ী। স্নেহ-বঞ্চিতা, নির্যাতিতা ও পতি-ত্যক্তা এই হতভাগিনী। সপত্নীকন্যা-বিদ্বেষিণী বিমাতা চণ্ডী তাহার এক চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে চিরকালের মতো সকলের উপহাসের পাত্রী করিয়া দিয়াছেন। দেব-সভাতেও তাহার আসন নাই। বিজয় গুপ্তের মনসা আক্ষেপ করিয়াছে—

জনমদুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় নিজ কর্মফলে॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥
ডাকিবার লক্ষ্য নাই শুন গো জননী।
বিধাতা করিল মোরে জনমদুখিনী॥

বিজয় গুপ্ত বুঝাইতে চাহিয়াছেন—মনসার এই পুঞ্জীভূত চিত্তবেদনাই শেষ পর্যন্ত প্রতিহিংসায় পর্যবসিত হইয়া তাহার চিত্তকে হিংস্র ও নিষ্করুণ করিয়া তুলিয়াছে। নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গল-রচয়িতা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইনি সম্পূর্ণ রোমান্স-পাগল কবি। কেতকাদাস প্রজাপতির মতোই সৌন্দর্যলোভী। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব বর্ণনা তাঁহার স্বভাবের অনুকূল নহে, তাঁহার সৌন্দর্যসন্ধানী সমগ্র দৃষ্টি পড়িয়াছে বেহুলা চরিত্রে। তাঁহার বেহুলা শুধু 'বেহুলা' নহে, "বেহুলা নাচনী"—একটি অপূর্ব লাস্যময়ী প্রাণ-চঞ্চলা কিশোরী। তাহাকে দেখিলে বসন্তবায়ু-হিল্লোলিতা পুষ্পলতিকাকে মনে পড়ে। মনসামঙ্গলের ন্যায় ভয়ঙ্কর কাহিনীর রুক্ষতাকে এই বেহুলা নিজের কিশোরী-জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও মাধুর্য দিয়া মসৃণ-কোমল করিয়া তুলিয়াছে।

মৃত স্বামীর পুনর্জীবনের জন্য দেবসভায় নৃত্য-প্রদর্শন তাহার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহার সমগ্র জীবনটাই লাস্য-লীলা। বেহুলা বালিকা বয়স হইতেই মনসা-সেবিকা, তাহার মনসা-ভীতি নাই, মনসার প্রতি বরং একটা মধুর স্নেহাভিমান আছে। মনসার সমস্ত ব্যাপারই তাহার কাছে একটা লীলা-বিলাস মাত্র। মনসার সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সাপগুলিও তাহার আদরের পাত্র, কেহ খুড়া, কেহ জ্যেঠা, কেহ দাদা। সাঁতালী পর্বতে লোহার বাসরে যখন বঙ্করাজ, কালদণ্ড, উদয়কাল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সর্প গর্জন করিয়া নিদ্রিত লখীন্দরকে দংশন করিতে আসিয়াছে, তখনও বেহুলা ভয় পাইবার কারণ খুঁজিয়া পায় নাই; নিঃসঙ্কোচে হাস্যমুখে সর্পদিগকে পরমাত্মীয়ের অভ্যর্থনা জানাইয়াছে—

বেহুলা বলেন 'খুড়া কোথা আছ তুমি।
তোমা সবা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি॥
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ।
আমারে কঠিন বাপ না করে তল্লাস॥
মনে কিছু না করিও সেই অভিমান।
কাঞ্চন-বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥'

কবির দৃষ্টিতে লাস্যময়ী বেহুলার এই নির্ভীক মধুর চিত্তবলের নিকটে উদ্ধত হিংস্রতাও মাথা নোয়াইয়াছে—

এতেক শুনিয়া সাপ বড় লজ্জা পায়্যা।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেট মুণ্ড হয়্যা॥

সেই সুযোগে রঙ্গময়ী বেহুলা—

বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াশি॥
"ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে।
সুখে শুয়ে নিদ্রা যাও হড়পী ভিতরে॥"

এ-হেন বেহুলার জীবনকে পূর্ব-পূর্ব মনসামঙ্গলে চাঁদ-সদাগর কাহিনীর পাদ-পূরণার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেইজন্য কেতকাদাসের আফসোসের অবধি নাই। তাই কবি তাঁহার গ্রন্থে চাঁদ-কাহিনীকে যথা-সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া বেহুলা

কাহিনীকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রথা বজায় রাখিতে হইবে, মূল বেহুলা-কাহিনীকে বাড়াইবার উপায় নাই, কাজেই কবিকে বেহুলার পূর্ব-জীবন পুরাণ হইতে টানিয়া আনিতে হইয়াছে। মনসামঙ্গলের কবিগণের মতে বেহুলা-লখীন্দর হইতেছে শাপভ্রষ্ট উষা-অনিরুদ্ধ। পুরাণে বাণ-রাজ-কন্যা উষার সহিত প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধেব গোপন প্রেম-কাহিনী বর্ণিত আছে। কাজেই রোমান্স-প্রিয় কেতকাদাস উষা-রূপিণী বেহুলার গোপন প্রেমকে বিস্তৃতভাবে রসাইয়া রসাইয়া বর্ণনা করিয়া মনসামঙ্গলের অন্তর্গত উষাহরণ পালাকে একেবারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পর্যবসিত করিয়াছেন। উষাহরণ পালা কেতকাদাসেব মনসামঙ্গলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান দখল করিয়াছে। বেহুলা-প্রেমিক কবির চক্ষে বেহুলার জীবনের মতো মনসার জীবন বা চাঁদ-সদাগরের জীবনের মহিমা মোটেই ধরা পড়ে নাই। সেইজন্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য প্রকৃত মনসামঙ্গল না হইয়া উঠিয়াছে 'বেহুলা-মঙ্গল'।

নেপথ্য-বার্তা

মনসামঙ্গলের কবি ও কাহিনী

মনসামঙ্গলের কবিদিগের সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ ও বিতণ্ডা দেখা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' অন্যূন ৬২ জন কবির নাম করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেরই ধারণা দীনেশবাবুর তালিকায় মনসামঙ্গলের বহু গায়কই কবির ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া আছে। কানা হবিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণদেব, তন্ত্রবিভূতি, অসমীয়া কবি মনকর ও দুর্গাবর দ্বিজবংশী, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ*, বিষ্ণু পাল, কালিদাস, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র, কবিবল্লভ, কবিচন্দ্র, রতিদেব, দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ, জগৎজীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, রাজা রাজসিংহ, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, বৈদ্য হবিনাথ, কৃষ্ণানন্দ, জানকীনাথ, জগন্নাথ, কবি কর্ণপূর, শ্রীরামবিনোদ, গঙ্গাদাস সেন, ষষ্ঠীবর,

* কবির নাম ক্ষেমানন্দ, উপাধি কেতকাদাস, কেতকা অর্থে মনসা

বাণেশ্বর, হরগোবিন্দ, মধুসূদন, ছিরাবিনোদ, কালীপ্রসন্ন ও জগমোহন প্রভৃতি মনসামঙ্গলের কবিরূপে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পাঠক-সমাজে সুপরিচিত। দীনেশচন্দ্র সেন ও আশুতোষ ভট্টাচার্য কানা হরি দত্তকে আদি কবি মনে করেন। ইহার কারণ বিজয় গুপ্তের প্রচলিত সংস্করণের মনসামঙ্গলে দেখা যায়—"প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত"। কিন্তু বিজয় গুপ্তের প্রাচীন সংস্করণের গ্রন্থে এই চরণ না থাকায় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এই প্রাচীন হরি দত্ত সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন, তাঁহার মতে অষ্টাদশ শতকের হরিদাস দত্তই সম্ভবতঃ কানা হরি দত্ত। আদি কবি বলিয়া প্রচলিত বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থাপিত হইযাছে। শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন বিজয়গুপ্তের "যে পুরানো পুথিব উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহা অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ দশকে লেখা পুথির আধুনিক প্রতিলিপি"[১] বিজয় গুপ্তের কাব্যে যে রচনাকাল 'ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক' বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত আছে, সেই সময়ে বলা হইয়াছে 'সুলতান হোসেন শাহ্ নৃপতিতিলক' কিন্তু ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দেব প্রায় দশ বছব পবে হোসেন শাহ্ সুলতান হন। কাজেই এ তারিখ অগ্রাহ্য। "স্বপ্নাধ্যায় অংশে এবং অন্যত্র স্পষ্ট প্রক্ষেপ যথেষ্ট আছে।"[২] সুকুমারবাবু বিজয় গুপ্তের কাব্যের সংগ্রাহক কবি প্যারীমোহন দাশগুপ্তকেই প্রক্ষেপেব জন্য সন্দেহ করিয়াছেন। তাঁহাব মতে "বিজয় গুপ্ত পুরাণো অথবা অর্বাচীন কবি কিংবা গায়ক হইতে পারেন।"[৩] সুকুমার সেনের বিশ্বাস, বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গলের আদি কবি, তিনিই বিজয় গুপ্তেব পবিবর্তে হোসেন শাহের রাজত্বকালে 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ' বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা কবেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য সুকুমার বাবুর প্রতিবাদ কবিয়া প্রচার কবিয়াছেন—বিজয় গুপ্তের নহে, বিপ্রদাসের কাব্যই অর্বাচীন এবং "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই রচিত।"[৪] চাঁদ-সদাগরেব বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে বিপ্রদাস যে সকল স্থানের নাম করিয়াছেন, সেগুলি নিতান্ত আধুনিক। এমন কি সেখানে 'শ্রীপাট খড়দহ', এড়েদহ, ঘুষুড়ি, চিৎপুর,

---

১ পৃ: ২৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (৩য় সং)

২ পৃঃ ২৩৮ ঐ

৩ পৃঃ ২৩৬ ঐ

৪ পৃ: ২৫২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

কলিকাতা ও বেতড় পর্যন্ত আছে। তাহার উপর "ইহাতে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও নাথ সাহিত্যের কথাও আছে এবং তাহাদের দ্বারা ইহার কাহিনী বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।"[১] এই অভিযোগের উত্তরে বিশেষ করিয়া যাত্রাপথের আধুনিক নামগুলি সম্বন্ধে সুকুমারবাবু লিখিয়াছেন "এই বর্ণনা অনেকটাই প্রক্ষিপ্ত।"[২] এই উত্তর সম্বন্ধেও আবার আশুবাবু প্রচার করিয়াছেন শুধু যাত্রাপথের নামগুলি প্রক্ষিপ্ত নহে, গ্রন্থরচনার তারিখটাও প্রক্ষিপ্ত—"যে পুথিতে পরবর্তী হস্তক্ষেপ এত সুস্পষ্ট তাহার রচনাকালজ্ঞাপক পদ দুইটির উক্তিও পুথির অন্য কোন তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, অথচ উক্ত পদ দুইটি সমর্থিত হয়, এই পুঁথি দুইখানির মধ্যে এমন আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।"[৩] অবশ্য নদীয়ার প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের নাম বিপ্রদাসের পুথিতে নাই, ইহাও লক্ষ্য করা উচিত।

নারায়ণ দেবের কাব্যের মধ্যেও চৈতন্যদেবের কোন উল্লেখ নাই, এইজন্য অনেকে নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলকেও চৈতন্য পূর্ব সাহিত্য বলিয়া মনে করেন।

[বিজয় গুপ্ত বা বিপ্রদাস চৈতন্য-পূর্ব প্রাচীন কবি না হইতে পারেন কিন্তু চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই যে মনসাপূজা এবং সম্ভবতঃ মনসামঙ্গলও সুপ্রচারিত হইয়াছিল যে বিষয়ে সন্দেহ নাই, "দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন"—চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবনদাসের এই উক্তিই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।]

অল্প পরিচিত কবিদিগের মধ্যে বিপ্রদাস, তন্ত্রবিভূতি, মনকর-দুর্গাবর ও দ্বিজবংশীর কাব্যের কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য আছে।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে শিবের ধর্ম-তপস্যা ও ধর্ম-দর্শনে গঙ্গার ধবলতা প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে তেঁতুলের দ্বারা ক্ষারোদসাগরের দধিসাগরে পরিণতি এবং তৎপরে সমুদ্র-মন্থন বর্ণিত হইযাছে। বিপ্রদাসের চাঁদসদাগর হইয়াছে চাঁদো। নারায়ণ দেবের ন্যায় বিপ্রদাসও দেখাইয়াছেন—চণ্ডীর উপদেশেই চাঁদো মনসা-বিদ্বেষী। চাঁদের গুয়াবাড়ী বিপ্রদাসের কাব্যে হইয়াছে নাথবা-বন এবং তন্ত্রবিভূতির কাব্যে 'লক্ষের বাগান'। চাঁদোর

১ পৃঃ ২৫২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

২ পৃঃ ১৯৮ পাদটীকা, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ (৩য় সং)

৩ পৃঃ ২৫২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

সমুদ্রযাত্রায় ঘোড়ামুখো, হাতীমুখো ও একঠেঙ্গে মানুষের দেশ এবং সমুদ্রের মধ্যে কাঁকডাদহ, জোঁকদহ, সাপদহ, কড়িদহ, শাঁখদহ প্রভৃতি বিচিত্র দহের বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপূর্ণ।

তন্ত্রবিভূতি পঞ্চদশ শতকের কবি। ইহার কাব্যে উত্তরবঙ্গীয় কাব্যকথার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মনসার রূপ দেখিয়া ব্রহ্মার ব্রহ্মচর্যহানি এবং মনসার গর্ভে বিষের উৎপত্তি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও চাঁদ হইয়াছে চাঁদো। তাডকা রাক্ষসী আসিয়া এখানে মনসার অনুচরী হইয়াছে এবং চাঁদোর মৃত ছয় পুত্রকে শুটকি মাছের মতো শুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গীয় কাহিনীতে অনিরুদ্ধ-উষাই লখীন্দর-বেহুলা, এখানে কিন্তু সাবিত্রী-সত্যবানকে বেহুলা লখীন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। লখীন্দরের দ্বারা মাতুলানী ধর্ষণ তন্ত্রবিভূতির কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের ধারণা—"সপ্তদশ শতাব্দের শেষার্ধের কবি জগৎজীবন ঘোষাল বিভতির রচনাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।"[১]

মনকর ও দুর্গাবর অসমীয়া কবি। ইহারা ষোড়শ শতকে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রাচীন বাংলাভাষার সহিত তদানীন্তন অসমীয়ার বিশেষ পার্থক্য না থাকায় শ্রীসুকুমার সেন ইহাদের কাব্যকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দাবী করেন। ইঁহাদের কাব্যে 'পোঞা', 'বাদুড়া ব্রাহ্মণী', 'তোতোলা', 'দিগম্বরী', 'মানসাই'—এই শব্দগুলি মনসা নামের প্রতিশব্দ। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর দ্বারা সৃষ্টিপত্তন মনকরের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বিপ্রদাসের কাব্যের মতো এখানেও শিবের ধম-তপস্যা বর্ণিত হইয়াছে। মনকরের কাব্যে মনসার জন্ম পযন্ত বর্ণিত আছে, পরে পুথি খণ্ডিত। দুর্গাবরের কাব্যে চান্দোর পত্নী সোনেকা ধন্বন্তরি ওঝার নিকট হইতেই মনসাপূজা শিখিয়াছে, এবং গঙ্গা-প্রদত্ত ছয়টি আমলকি ভক্ষণে ছয়টি পুত্র প্রসব করিয়াছে। শিবদুর্গার বিবাহ-পূর্ব মিলন ব্যাপারে মনকরের কাব্যের সহিত জগৎজীবনের ও ষষ্ঠীবরের কাব্যের সাদৃশ্য দেখা যায়, উভয়ত্র পুষ্পচয়নরতা উমার প্রতি শিবের বলপূর্বক আলিঙ্গন বর্ণিত হইয়াছে।

---

১ পৃঃ ২২৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (৩য় সং)

উদ্দীপনই মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য। ঘটনা ও চরিত্রের বিস্তৃতি, গম্ভীরতা ও ঔদার্যের উপরই মহাকাব্যের ধর্ম নির্ভর করে। ধর্মমঙ্গল-কাহিনী অ্যাডভেঞ্চার-সমষ্টি বটে এবং বীররসও মহাকাব্যের অন্যতম রস বটে, কিন্তু লাউসেনের অসমসাহসিক কার্যাবলী প্রকৃতপক্ষে বীররসের সৃষ্টি করে না। কারণ ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রকৃত বীরত্ব লাউসেনের নহে—হনুমানের। সর্বত্রই লাউসেন নিমিত্ত বা শিখণ্ডী মাত্র। লাউসেন সর্বত্র বালকের মতো বিপদ বরণ করিয়াছে এবং বিপন্ন হইয়া বালকের মতো আর্তনাদ করিয়াছে; এই সমস্ত বিপদ হইতে ধর্মঠাকুরের ভৃত্য হনুমানই তাহাকে বারবার রক্ষা করিয়াছে। লাউসেনের অসমসাহসিকতা অবিবেচনা-প্রসূত গোঁয়ারতুমি রূপেই প্রকাশ পায়। সেইজন্যই লাউসেন পাঠকচিত্তে বীরের আসন গ্রহণ করিতে পারে না। চরিত্রহীনা নারীদিগের সংস্পর্শে লাউসেনের চিত্তবলও পাঠকচিত্তে মহৎভাবের উদ্দীপন করে না। প্রকৃত বীরত্ব পতিতা-বিজয়ে নহে, পতিতা-উদ্ধারে। পতিতাদের জন্য লাউসেনের কিছুমাত্র করুণা ও ত্যাগ স্বীকার নাই। রঞ্জাবতীর শালেভর ও লাউসেনের হাকন্দ-সেবন মহাকাব্যোচিত বীরত্বের ব্যাপার বটে কিন্তু উহাদের উদ্দেশ্যের তুচ্ছতার জন্য পাঠকচিত্তে বিশালভাবের উদ্দীপন করে না—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয়। রঞ্জাবতী ও লাউসেনের কঠোর তপস্যা মহৎভাবের প্রেরণাজাত বা নিষ্কাম নহে। রঞ্জাবতীর উদ্দেশ্য পুত্রলাভ। রঞ্জাবতীর মতো অপ্রাপ্তযৌবনা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার এই পুত্রকামনাও অস্বাভাবিক ও হাস্যকর। লাউসেনের তপস্যার ফল একটি ম্যাজিক—পশ্চিমে সূর্যোদয় প্রদর্শন। দুইটিই অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের দৃষ্টান্ত।

রূপরাম, ঘনরাম প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ডোম-পূজিত ধর্মঠাকুরকে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরও পূজ্য করিবার জন্য কৃষ্ণ বা নারায়ণ বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন কিন্তু ছদ্ম সাজসজ্জার দ্বারা তাঁহার চরিত্রগত অনার্যত্ব ঢাকিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। ধর্মের মধ্যে না আছে কৃষ্ণের মাধুর্য, না আছে নারায়ণের শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ঐশ্বর্য। সমগ্র ধর্মমঙ্গলের কোনোখানে ধর্ম-ঠাকুরের গীতার জ্ঞানের চিহ্ন দেখা যায় না; বরং ধর্মমঙ্গলের আদর্শ গীতার আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। গীতায় নিষ্কাম কর্মেরই প্রশস্তি, ধর্মমঙ্গলে সকাম কর্মেরই জয়ধ্বনি। সকল আর্য-পুরাণে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—

মোক্ষ, জ্ঞান বা ভক্তি কিন্তু ধর্মমঙ্গলের চরম লক্ষ্য পুত্রোৎপাদন। গীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে সাধনার জন্য শরীরের উপর অত্যাচার করাকে আসুরিক কার্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, ধর্মমঙ্গলে সেই আসুরিক তপস্যাই হইতেছে ধর্মপূজা। ধর্মপূজায় ঢাক বাজাইবার তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নিজ-শরীরে বেত্রাঘাত করিতে হয়—"দুহাতে বেতের বাড়ী নাচে রঞ্জাবতী" (রূপরাম)। ধর্মপূজায় আদিম বর্বরতা সুস্পষ্ট—

উপরে যুগল পদ অধ লোটে শির।
ধূলা করে অগ্নি জ্বালে বদনে রুধির ॥
বেত হাতে নাচে গায় ডাকে ধর্ম জয়।
ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কেহ এক পায়ে রয় ॥
কাটারি-শয্যায় কেহ করেছে শয়ন।
উরসি উজ্জ্বল করে জ্বালে হুতাশন ॥
কেহ বিন্ধে কপালে শলাকা জ্বলে দীপ।
একান্ত হইয়া চিত্তে পূজে নরাধিপ ॥ —বাদলপালা, ঘনরাম

তাছাড়া ধর্মঠাকুরের নৈবেদ্যেরও বিশেষত্ব আছে। বলিদান তো আছেই, তাহার উপর মদ্য, মাংস ও পিষ্টক ধর্মপূজার উপকরণ—

তবে আদ্য পূজা দিল 'আশোয়া' চণ্ডাল।
মদের পুষ্করিণী দিল, পিষ্টের জাঙ্গাল ॥

—স্থাপনা পালা, রূপরাম

খুব সম্ভব ধর্ম-পূজাকেই লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে ॥

চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুরকে প্রথমে অত্যন্ত নিরীহ বলিয়া বোধ হয়, কারণ "ধর্মঠাকুরের মানবিক প্রকৃতি ও পরিচয়টি অনেকটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।"[১] কিন্তু এই অস্পষ্টতা ধর্মঠাকুরের কৌশল মাত্র, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা কূটনীতি-বিশারদ। তাঁহার আত্মপ্রচার-স্পৃহা, পূজা-লুব্ধতা ও প্রতিহিংসা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

১ ভূমিকা পৃঃ ১৫০ কবিকঙ্কণ চণ্ডী (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

অথচ সাধারণতঃ তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় না। জাম্বুবতী ওরফে অম্বুবতী[১] অপ্সরাকে অভিশাপ দিয়া রঞ্জাবতী রূপে ধর্মপূজার জন্যই পৃথিবীতে পাঠানো হইয়াছে। এজন্য ধর্ম সুকৌশলে প্রতিপক্ষ চণ্ডীকে দিয়াই তাহাকে অভিশাপ দেওয়াইয়াছেন এবং নিজে নিরপেক্ষতার ভান করিয়াছেন। পৃথিবীতে চণ্ডীপূজার বাহুল্য হেতু চণ্ডী তাঁহার পরম ঈর্ষার পাত্রী, অথচ দেবসভায় তাহা বুঝিতে দেন না। তাঁহার পূজা সম্বন্ধে নিঃস্পৃহতা যে ভান মাত্র, এবং তাঁহার বৈরাগ্য যে মর্কট-বৈরাগ্য, তাহা বুঝা যায় তাঁহাব চণ্ডী প্রতিযোগিতা হইতে। ধর্মমঙ্গলে এমন কোন পালা নাই, যেখানে তিনি চণ্ডীপূজার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না করিয়াছেন। আসলে ধর্মমঙ্গল কাব্য চণ্ডীপূজার বিরুদ্ধে প্রোপাগ্যাণ্ডা ছাড়া কিছু নহে। চণ্ডীকে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্যই ইহাতে প্রধানতঃ চোর, ডাকাত, বদমায়েস, বেশ্যা প্রভৃতি সকল দুর্বৃত্তকেই চণ্ডীভক্তরূপে দেখানো হইয়াছে। ধর্মের অনুগৃহীত লাউসেনের হস্তে যে কেউ নিহত, পরাজিত বা অপদস্থ হইয়াছে তাহাদের সকলকেই চণ্ডীর আশ্রিত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এমনকি 'কামদল' বাঘটাকে পর্যন্ত চণ্ডীভক্ত ও চণ্ডীর আশ্রিত বলিয়া প্রচার করিয়া তবে মারা হইয়াছে। দেবীর বরে যদিও ইছাই ঘোষ ও কামদল বাঘের ছিন্নমুণ্ড জোড়া লাগিয়াছে তথাপি লাউসেনের অস্ত্র হইতে চণ্ডী তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অথচ কোনো জায়গায় ধর্মঠাকুর যে প্রকাশ্যে চণ্ডীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা নহে।

নিজভক্তের সঙ্গে ব্যবহারেও ধর্মঠাকুর কূটনীতি প্রয়োগ করেন। তিনি সর্বজ্ঞ অথচ ভক্ত সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভান করিতেও অদ্বিতীয়; ভক্তের প্রতি প্রসাদবর্ষণের মূলে তাঁহার কোনোরূপ হৃদয়বত্তা বা স্নেহ নাই—আছে প্রয়োজন-সিদ্ধির স্বার্থবুদ্ধি। তাঁহার হৃদয়ে করুণা থাকিলে রঞ্জাবতীর জীবিত অবস্থাতেই তাহাকে বর দিতে পারিতেন। ধর্মকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রঞ্জাবতী কি না করিয়াছে—

জিভ কেট্যা আপনি রানী রাখে কলাপাতে।
তবে জ্বালে প্রদীপ যে মাথার মজ্জাতে॥ —শালেভর, রূপরাম

কিন্তু "স্বপনে ধর্মের দয়া তথাপি না হৈল।" রঞ্জাবতী শূলের উপর ঝম্প প্রদান

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গলে জাম্বুবতী, ঘনরামের কাব্যে অম্বুমতী

করিয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুবরণ করিয়াছে, এমন কি "প্রাণিগন্ধ অবতীর্ণ বাসি মড়া হৈল", তথাপি ধর্মরাজের টনক নড়ে নাই। অবশেষে যখন স্ত্রীহত্যা-পাপ (ধর্মকে গ্রাস না করিয়া) সূর্যকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে এবং দেবগণ তাঁহাকে দয়া দেখাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, তখনই তিনি ধীরে ধীরে আলস্য ছাড়িয়া পুত্রবর দিতে গিয়াছেন। ইহাকে ভক্তির পরীক্ষা বলা চলে না ; ইহা ধর্মের ভক্তবৎসলতা নহে, হৃদয়-হীনতারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু যেখানে ধর্মের নিজের গরজ, অর্থাৎ যেখানে চণ্ডীশক্তিকে পরাভূত করিতে হইবে, সেখানে তিনি কাহারও ডাকার অপেক্ষা রাখেন নাই, বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে অল্প হাঙ্গামা পোহাইতে হয় নাই। ভক্তের কোনপ্রকার তপস্যা ছাড়াই তিনি চণ্ডীশক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য 'ব্রহ্মকরজাপ্য মালা' প্রভৃতি অতি দুর্লভ বস্তু কৌশল করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, কখনও বা লুকাইয়া চণ্ডীর নিকট হইতে নারীর ধাতুতত্ত্ব জানিয়া লইবার জন্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। ধর্ম নিজে না গিয়া ভক্ত নারদকে দিয়া শিবকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। শিব সুকৌশলে গোপনে চণ্ডীকে ঠকাইয়া ধাতুতত্ত্ব শিখিয়া লইয়া নারদের মারফত ধর্মকে জানাইয়াছেন, ধর্ম আবার হনুমানের মারফত লাউসেনকে উহা জানাইয়াছেন, তবেই সুরিক্ষার হাত হইতে লাউসেন রক্ষা পাইয়াছে। ধর্মঠাকুরের এই অধর্ম-পন্থা, গুপ্তচরবৃত্তির একমাত্র কারণ ঠিক ভক্তবৎসলতা নহে—চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেরই মর্যাদা রক্ষা।

ধর্মঠাকুরের দ্বারা শক্তি-প্রতিযোগিতায় বারবার পরাভূত হইয়াও ধর্মমঙ্গলে অধিকতর মহিমায় মনোহর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন চণ্ডীদেবী। চণ্ডীর মানবিকতা সুস্পষ্ট। চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীকুমার বাবু চণ্ডীকে জননীরূপে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা চণ্ডীমঙ্গলে ততখানি সার্থক নহে, যতখানি সার্থক ধর্মমঙ্গলে। ধর্মমঙ্গলের চণ্ডী একেবারে সন্তানবৎসলা, সরলা, স্নেহান্ধা বঙ্গনারী। চোর হউক, ডাকাত হউক, পণ্ডিত হউক, একবার যদি কেহ বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহা হইলে আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। স্নেহাতিশয্যে ভক্তের সকল দোষই তিনি ভুলিয়া যান। চোর ইন্দামেটে, সুরিক্ষা বেশ্যা, পরম দুর্বৃত্ত ইছাই ঘোষ, এমন কি বন্য পশু কামদল বাঘ—সকলেরই উপরে তাঁহার মাতৃস্নেহ অজস্রধারে বর্ষিত হইয়াছে।

স্নেহাতিশয্য তাঁহার মর্যাদাভিমান নষ্ট করিয়া দিয়াছে, ধর্মের কাছে বারবার পরাভূত হইয়াও বিপন্ন ভক্তের রক্ষায় পুনর্বার ধর্মের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে তাঁহার বাধে না। তাঁহার প্রয়াস—বলবান শত্রুর কবল হইতে শাবক রক্ষার জন্য দুর্বল পক্ষিমাতার সংগ্রাম মাত্র। তাঁহার মাতৃত্ব শত্রুমিত্রবোধ-নিরপেক্ষ। দেবী শত্রুপক্ষীয় (ধর্মপূজক) লাউসেনের ভাবী পত্নী কানড়াকেও স্নেহ করিতে দ্বিধা করেন নাই। যখন কানড়া বিপন্ন হইয়া ডাকিয়াছে—

"ভকত-বৎসলা কোথা কি করিলে মা ?"

অমনি দেবী ছুটিয়া আসিয়া কানড়াকে সান্ত্বনা দিয়াছেন—

বিবাহ না দিয়া তোর যদি যাই ফিরা॥
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরা॥

লাউসেনের হস্তে ভক্ত ইছাই ঘোষের মৃত্যুতে দেবীর হাহাকার মর্মস্পর্শী। তাহা মহাভারতের গান্ধারীর বিলাপকে স্মরণ করায়—

'উঠ উঠ' বলি মাতা অনুগ্রহ বোলে।
ভকতবৎসলা মাতা তুলে নিল কোলে॥
"ইছাই রে বাছা মোর কি হলো কি হলো।
বিপাক বন্ধনে বেড়ে বাছা মোর মোলো॥
আর না শুনিব কথা সে চাঁদ বদনে।"
কান্দেন করুণাময়ী অঝোর নয়নে॥
"মনেতে কুমতি পদ বাঞ্ছিল যখন।
তখনি জানিনু বাছার নিকট মরণ॥
পাতালে পশিনু আমি যাহার লাগিয়া।
সে বাছারে নিল মোর হিয়া বিদারিয়া॥"

চণ্ডীদেবীর এই মাতৃত্বের জন্যই সহদেব চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবি হইয়াও চণ্ডী-চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিয়া পারেন নাই—

শরণ লইনু জগৎজননী ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে কে আর আছয়ে মোর॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের দিগন্ত-প্রসারী মরুভূমির মধ্যে একমাত্র মরূদ্যান হইতেছে সিমুলা-রাজকন্যা কানড়ার উপাখ্যান। ইহাকেই ধর্মমঙ্গলের একমাত্র কাব্য

বলা চলে। রঞ্জাবতীর শালে ভর বা লাউসেনের হাকন্দ-তপস্যা বিস্ময়কর অ্যাডভেঞ্চার বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব নাই—তাহা পাঠক-চিত্তের কোন বাসনাই পূরণ করে না। কিন্তু কানড়া-কাহিনী এরূপ নহে। এখানেও রূপকথা আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে, তবে তাহা সুন্দর। পরিবেশ সুন্দর, পাত্র-পাত্রী সুন্দর, ঘটনা সুন্দর, পরিণতিও সুন্দর। ইহা সর্বতোভাবে রোমান্স। স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, ঘটনা যুদ্ধ, পাত্রপাত্রী একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে লাউসেন, বিপক্ষে অন্যদিকে অশ্বীপৃষ্ঠে কানড়া। রসিক কবি দেখাইয়াছেন—নায়কনায়িকা লাউসেন ও কানড়া যে কেবল পরস্পরের রূপে মুগ্ধ তাহা নহে, উভয়ের বাহন ঘোটক ঘোটকীর মধ্যেও অনঙ্গমোহ উপস্থিত—"ঘুড়ি দেখি মদনে মাতাল হল 'হয়'।" এই রসপরিপোষক সাদৃশ্যের সৃষ্টি কবিত্বময়, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে লাউসেন ও কানড়ার পরস্পরের 'রূপ দেখি দুজনারি মন বিমোহিত।' অথচ যুদ্ধ না হইয়া উপায় নাই। কারণ একপক্ষে পৌরুষ, অপরপক্ষে প্রেম-মর্যাদা, কেহই নমনশীল নহে। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াব উদ্দেশ্যেই সেনাপতিরূপে লাউসেন কানড়াকে ধবিযা লইয়া যাইতে আসিয়াছে। অপরপক্ষে লাউসেনকেই কানড়া পতিত্বে বরণ করিয়াছে, অপর কাহাকেও বিবাহ কবিতে পাবে না। এই অভূতপূর্ব জটিল পবিবেশ সৃষ্টি করিয়া ধর্মমঙ্গলে কবি অপূর্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই পবিবেশ মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে কানড়ার তেজোগর্ভ উক্তিতে—

"বলে ধরে নিতে পারে কার এত বুক।"
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক॥
"এখন বাঁচাই নাথ—অনুমতি দে।
না হয়, দাসীব এক বাণ সয়ে নে॥"

যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধেও কানাড়ার চিন্তা মহৎ ভাবের উদ্দীপক—

"মরি যে তোমার হাতে মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমায় শির সহমৃতা হব॥"

ঘটনার দ্বারা পাঠকচিত্তে এই উৎকণ্ঠা-সৃষ্টি চমৎকার। উভয়ের অস্ত্রযুদ্ধের কিরূপ পরিণতি হইত বলা যায় না; কিন্তু রসিক কবি সুকৌশলে চণ্ডীকে দিয়া উভয়ের বাহুযুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—"হাতাহাতি বল বুঝি আমার

সাক্ষাৎ।” কিন্তু কানড়ার হস্তাকর্ষণ লাউসেনের পক্ষে হইয়াছে মারাত্মক, কারণ লাউসেনের পক্ষে—“পরশে পরম সুখ যুবতীর হাত।” এই ‘সুখের’ ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ, ইহার শক্তি অমোঘ। ইহার পরিণাম—“লাউসেন পড়ে আসি কানড়ার কোলে।” লক্ষ্য করিতে হইবে—এই আত্মসমর্পণে শুধু লাউসেনের পরাজয় হয় নাই, পরাজয় হইয়াছে ধর্মঠাকুরের। এইখানেই হইয়াছে ধর্মঠাকুরের চণ্ডীবিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত। চণ্ডী নহে, অতনু মদনই ধর্মকে পথে বসাইয়াছে।

ধর্মমঙ্গলের পাত্র-পাত্রীর ঐতিহাসিক পরিচয় আবিষ্কার করিতে কয়েকজন ব্যক্তি পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। জানা উচিত, রূপকথা ইতিহাস নহে। ধর্মমঙ্গল-কাহিনী কেবল যে কাল্পনিক তাহাই নহে, ইহা অ-বঙ্গীয়ও বটে। ভালো হউক, মন্দ হউক, শান্তরসাশ্রিত গৃহধর্মই বাঙ্গালীজাতির মজ্জাগত, অ্যাডভেঞ্চার বা বোহেমীয় জীবন তাহার স্বপ্ন বা বিলাস-কল্পনা মাত্র। সেইজন্য বীরনারী কানড়াকে আমাদেরই একজন বলিতে পারি না। কালু ডোম, শাকাশুকা, কানড়া, লখাই, ময়ূরা—সকলেই যেন রাজপুত নরনারী। ঘটনা-পরিবেশও ঠিক বঙ্গীয়ভাবের নহে। শ্রীকুমার বাবুর ভাষায়—“যে বল্লুকা নদীর সহিত ধর্মের স্মৃতি বিজড়িত, তাহা যেন কোন পরিচিত ভাবাষঙ্গের মধ্যে বিধৃত নয়। এই নদীপথ দিয়া যে চাঁদ সদাগর বা ধনপতি কোনোদিন তাহাদের অভ্যস্ত বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়াছিল তাহা আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি না।”[১] আশ্চর্যের বিষয়, কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন—“ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় কাব্য (National Poetry) বলা যাইতে পারে।...ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বীর ডোমজাতির বিজয়গাথা।”[২] কিন্তু ধর্মমঙ্গল-কাহিনীকে ডোমজাতির ঐতিহাসিক গাথা রূপে প্রমাণ করিতে হইলে ছেলে-ভুলানো “আগডোম বাগডোম”ই যথেষ্ট নহে, অধিকতর বিশ্বসনীয় প্রমাণ আবশ্যক। তাছাড়া কোনো কাব্যে একটি বিশেষ জাতির বীরত্বের বর্ণনা থাকিলেই তাহা সমগ্র দেশের জাতীয় সাহিত্য হইয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ কোনোদিনই কেবল ডোমজাতির দেশ নহে। ধর্মমঙ্গলও সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় কাব্যের মর্যাদা দাবি করিতে পারে না।

---

১ ভূমিকা পৃঃ ১৮০ কবিকঙ্কণ চণ্ডী (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

২ পৃঃ ৫৪-৫৫ মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং)

নেপথ্য-বার্তা

ধর্ম-ঠাকুর, ধর্ম-সাহিত্য ও ধর্ম-কবি

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অধিদেবতা ধর্ম-ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের ডোমজাতির জাতীয় দেবতা। ডোমজাতি প্রাগার্য প্রোটো অষ্ট্রালয়েড জাতির শাখাভুক্ত আদিম জাতি; বর্তমানে অন্ত্যজ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে গণ্য। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহারাও রক্ষণশীল, হিন্দুসমাজে মিশিয়াও ইহারা প্রাচীন কৌম সংস্কার ত্যাগ করে নাই; বরং নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা হিন্দুসমাজকেই প্রভাবিত করিয়াছে। মানিক গাঙ্গুলি, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরাও ডোম-দেবতার মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছে এবং কাব্য রচনার দ্বারা ডোম-দেবতার পূজা প্রচার করিতে দ্বিধা করে নাই। অপরপক্ষে ডোমজাতির ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ দেখা যায় "নিরঞ্জনের রুষ্মা" কবিতায়। ধর্মমঙ্গল গানের মধ্য দিয়া ডোমজাতির কৌম জীবনের ছেলে-ভুলানো গল্পগুলি বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এই গানের দ্বারাই অপৌরাণিক শূন্যবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব হিন্দুমনে সংক্রামিত হইয়াছে। বিপ্রদাস পিপিলাই ও বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের পরিবর্তে ধর্মমঙ্গলের শূন্যবাদী সৃষ্টিতত্ত্বই দেখা যায়। নাথ-সাহিত্যেও ডোমজাতির ধর্মঠাকুরের প্রভাব অল্প নহে। বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গসংস্কৃতিতে ডোম-ধর্মের দান উপেক্ষা করা যায় না।

হিন্দুপুরাণের ধর্ম হইতেছেন যুধিষ্ঠিরের পিতা যম এবং বৌদ্ধ মতের ধর্ম হইতেছে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের দ্বিতীয় রত্ন। এই দুই ধর্মের সহিত ডোম-দেবতার নাম-সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রাগার্য দেবতার নাম ধৃ-ধাতু নিষ্পন্ন আর্য শব্দ হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়াছেন—কূর্মবাচক অষ্ট্রিক শব্দ 'দডম্' হইতে এই 'ধর্মে'র উৎপত্তি। সম্ভবতঃ কচ্ছপাকৃতি গোলাকার শিলাই আদিযুগে ধর্মঠাকুররূপে পূজিত হইত। এখনও যে সকল বিভিন্ন আকৃতির শিলাখণ্ডে ধর্মঠাকুর পূজিত হন, তন্মধ্যে কচ্ছপাকৃতি শিলাই বেশী।

পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ধর্ম-শিলার কচ্ছপাকৃতিকে প্রাধান্য দিয়া ধর্মঠাকুরকে কূর্ম-অবতার রূপী বিষ্ণু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী ও দীনেশ চন্দ্র সেন ইহার মধ্যে গম্বুজাকৃতি বৌদ্ধস্তূপের অনুকৃতি সন্দেহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করিয়াছেন—"বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তরের অনেক ঐতিহ্য ও কল্পনা ধর্মঠাকুরে পরিণতি লাভ করিয়াছে।"[১] তাঁহার মতে বৈদিক সূর্য, ইরানী সূর্য, বৈদিক বরুণ, প্রাগার্য অষ্ট্রিক রণদেবতা প্রভৃতি একত্র মিশ্রিত হইয়া এই বর্ণসংকর ধর্মঠাকুর গঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই সকল পণ্ডিত ডোমজাতির অনুন্নত অবস্থা ও আদিম কৌম সংস্কৃতির রক্ষণশীলতা ও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ লক্ষ্য করেন নাই, সেইজন্য ইহাদের ধর্মের উপর হিন্দুপ্রভাব বা বৌদ্ধপ্রভাবের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। ডোমেরা যে নিজেদের জাতীয় আদিম কৌম সংস্কার বর্জন করিয়া বৌদ্ধস্তূপকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল অথবা বেদ উপনিষদ ও জেন্দাবেস্তা পড়িয়া এক বর্ণ-সংকর দেবতা খাড়া করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ কেহই দেন নাই। অনুমানের সমর্থনে প্রয়োজনীয় যুক্তি ও বিশ্বাস্য ঐতিহাসিক তথ্য থাকিলেই তবেই তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ধর্মঠাকুরকে আদিম অষ্ট্রিক কোমের স্বয়ম্ভু কৌম দেবতারূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

ধর্মঠাকুর হইতেছেন নিরাকার নিরঞ্জন আদ্য দেবতা, অথচ উলুক পক্ষী তাঁহার বাহন ও মন্ত্রী। ধর্মঠাকুরের ঘর্মজা কন্যা আদ্যাদেবীই তাঁহার পত্নী। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদ্যার গর্ভজাত ধর্মঠাকুরের সন্তান। কোন বিশেষ মূর্তি না থাকিলেও ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা ফকিরের বেশে অথবা শ্বেত-অশ্বে-আরোহী সিপাই মূর্তি ধরিয়া আবির্ভূত হন। ইনি নিরঞ্জন হইলেও নিজে ধবলবর্ণ, ধবল বর্ণপ্রিয় এবং ধবল কুষ্ঠের দেবতা। ইনি ক্রুদ্ধ হইলে কুষ্ঠ রোগ হয় এবং সন্তুষ্ট হইলে কুষ্ঠ রোগের নিরাময় হয়। বন্ধ্যানারীকে সন্তান প্রদান ইহার সর্বপ্রধান মাহাত্ম্য। চাঁপা ফুল ও চাঁপা কলা ধর্মঠাকুরের প্রিয় এবং চুন, মদ্য, মাংস ও পিষ্টক ইহার পূজার প্রধান উপকরণ। ধর্মঠাকুর নরবলি প্রিয়; বর্তমানে শাদা মোরোগ বা পায়রা এবং শূকর বা ছাগ ইহার প্রধান বলি। ইহার সম্মুখে পশুপক্ষীকে হাড়িকাঠে বলি দেওয়া হয় না, হঠাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় জবাই করা হয়। ধর্মের নৈমিত্তিক পূজার উৎসবের নাম গাজন। আগুন, কাঁটা, বঁটি ও শূলের উপর ঝাঁপ দিয়া শারীর নির্যাতন বরণই গাজনের

১ ভূমিকা পৃঃ ॥৵০ রূপরামের ধর্মমঙ্গল।

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইংরেজপূর্ব যুগে মানুষের মেরুদণ্ড মোটা বঁড়শীতে বিদ্ধ করিয়া চড়কগাছে বাঁধিয়া তাহাকে চক্রাকারে ঘুরানো ছিল এই গাজনেরই অন্যতম অঙ্গ; বর্তমানে উহা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনেক পণ্ডিতের ধারণা—বর্তমানকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শিবের গাজনে ধর্মের গাজনই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ধর্ম-সাহিত্য ত্রিবিধ—সাংজাত, শূন্য পুরাণ ও ধর্মমঙ্গল। সাংজাত হইতেছে ধর্মপূজা-পদ্ধতি-বিষয়ক নিবন্ধ বা ছড়া; এইগুলি 'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থে ও বিবিধ ধর্মমঙ্গলে দেখা যায়। এইগুলি ধর্মঠাকুরের একটি কাল্পনিক আদি পূজারী 'রামাই পণ্ডিতে'র নামে প্রচলিত। ছড়াগুলির অধিকাংশই ঊনবিংশ শতকের পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি ছড়া অষ্টাদশ শতকের রচনাও হইতে পারে। সাংজাত-বিষয়ক রচনা পারিভাষিক শব্দাবলীতে কণ্টকাকীর্ণ। কামিন্যা (নিরাকার ধর্মের নিরাকার স্ত্রী), দেয়াসী (ধর্মের সেবাইত), ধামাৎকনী (দেয়াসীর প্রধান সহায়ক), ভক্ত্যা বা ভকিতা (পূজামানতকারী কৃচ্ছ্রব্রতী গাজনের 'সন্ন্যাসী'), পাট ভক্ত্যা (প্রধান ভক্ত্যা), আমিনী (স্ত্রী-ভক্ত্যা), ঘরভরা (ধর্মমঙ্গল গানযুক্ত পুত্র-কামনাত্মক পূজা), লুয়ে (বলির পশু), বারমতি (বারদিন গাহিবার উপযোগী চব্বিশটি পালা) প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিত না হইলে সাংজাত অংশ বুঝা কঠিন।

শূন্য পুরাণের পৌরাণিকতা সৃষ্টিতত্ত্বে। ডোমজাতির ধর্মঠাকুর সম্বন্ধীয় ধারণা ও জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধীয় ধারণা 'রামাই পণ্ডিতে'র (?) গ্রন্থে প্রাধান্য পাইয়াছে বলিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে 'শূন্য পুরাণ'। এই সৃষ্টিতত্ত্ব 'স্থাপনা' পালা নামে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও দেখা যায়। 'শূন্য পুরাণে'র রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে; তবে গ্রন্থখানি খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতকেই রচিত। এই গ্রন্থের শেষাংশে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বলিয়া একটি কবিতা আছে, উহাই 'জালালি কলিমা' নামে বিস্তৃত আকারে সাংজাতের ছড়ায় স্থান পাইয়াছে। ইহাতে হিন্দুর উপরে মুসলমানের অত্যাচার বর্ণনায় কবির ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আনন্দ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ডোমজাতির অহিন্দু-মনোভাবের অন্যতম প্রমাণ।

ধর্মমঙ্গলই প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম-সাহিত্য। ইহার মোট চব্বিশটি পালা;

প্রথমাংশে রঞ্জাবতীর কাহিনী, শেষাংশে তৎপুত্র লাউসেনের কীর্তিকলাপ বর্ণনা। প্রথমাংশে রঞ্জাবতীর কাহিনী ছাড়াও আদি-ধর্মভক্ত সদা ডোম ও হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী বর্ণিত হইতে দেখা যায়। এই হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পুরাণের ব্যক্তি বিশেষ নহেন, ইনি বঙ্গীয় ডোমজাতির ধর্মভক্ত হরিশ্চন্দ্র, অবশ্য ইহারও পুত্র রোহিতাশ্ব (লুইচন্দ্র)। এই সদাডোম ও হরিশ্চন্দ্র উভয়েই ধর্মপূজা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন এবং নিজ হস্তে পুত্রকে কাটিয়া তাহার মাংসের দ্বারা ধর্মঠাকুরের তর্পণ করিয়াছিলেন ; বলা বাহুল্য ধর্মঠাকুরের কৃপায় দুইজনেরই মৃতপুত্র জীবনলাভ করিয়াছিল। 'শূন্যপুরাণে'র 'সদা খণ্ডে' সদাডোমের কাহিনী এবং 'সাংজাত খণ্ডে' হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী বর্ণিত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক কবি ধর্মমঙ্গল-কাব্য লিখিয়াছেন। শ্রীসুকুমার সেন উনিশজন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কাল্পনিক ময়ূর ভট্টই নাকি কাল্পনিক 'হাকন্দ-পুরাণে'র (লাউসেনের পালা) আদি কবি। ধর্মমঙ্গল রচয়িতা রূপরাম চক্রবর্তী, শ্রীশ্যামপণ্ডিত প্রভৃতি কবিগণ এই 'আদিকবি' ময়ূর ভট্টের গ্রন্থের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ময়ূর ভট্টের কোন পুথি এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্ম পুরাণ' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রায় মনে করিয়াছেন —ইহা আশুতোষ পণ্ডিত নামক আধুনিক কোনো ব্যক্তির রচনা। শ্রীসুকুমার সেনের মতে—ইহা অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র বাড়ুজ্জে রচিত।

কবি খেলারাম নাকি ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "গৌড়কাব্য" ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একমাত্র হারাধন দত্ত ছাড়া আর কেহই খেলারামের পুথিখানি প্রত্যক্ষ করেন নাই। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের 'নিরঞ্জন মঙ্গল' কাব্যের কয়েকটি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম পুথিটি ১৭০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের পুথিতে ঢেকুর গড়ের নাম ত্রিহট্টগড়, ইছাই ঘোষ হইতেছে ঈশ্বর ঘোষ এবং তাহার অনুজ হইতেছে বিজয় ঘোষ। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের একটি পুথিতে ধর্মদাস বণিক নামক আর একজন কবির রচনা মিশ্রিত দেখা যায়। সুতরাং এই ধর্মদাসও শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের মতো ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কবি। ধর্মদাস তাঁহার কাব্যকে বলিয়াছেন—"নিরঞ্জন ব্রতকথা।"

৮ সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ধর্ম-কবি হইতেছেন রূপরাম চক্রবর্তী। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ইনি ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। কবি কাব্যে নিজের প্রথম জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। সুকুমার সেনের মতে—"পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোট গল্পের মত কোন জীবন-রস-নিটোল রচনা থাকে, তবে তাহা রূপরামের এই আত্মকাহিনী।"[১] রূপরাম ছিলেন বর্ধমান জিলার কাইতি শ্রীরামপুরের অধিবাসী। ইহার সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে যে ইনি প্রথম যৌবনে জনৈকা হাড়ী-তনয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া সমাজে পতিত হন এবং ধর্মমঙ্গল গাহিয়া জীবিকা অর্জন করেন।

কৈবর্ত-কবি রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যখানি 'অনাদিমঙ্গল' নামে সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও কবির একটি আত্মকাহিনী আছে, উহাতে গীতোৎপত্তির কারণ রূপরামের বর্ণনার অনুরূপ। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন "প্রকাশিত গ্রন্থের মূল এক আধুনিক গায়নের খাতা, ইহার বারো আনাই রূপরামের রচনা, ভণিতা শুধু রামদাসের।"[২]

মনসামঙ্গল-প্রণেতা কায়স্থ কবি সীতারাম দাস সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। ইহার আত্মকাহিনীতে দেখা যায়, কবি ছিলেন গজলক্ষ্মীর ভক্ত—

শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥

কবি কিন্তু গজলক্ষ্মীমঙ্গল না লিখিয়া লিখিলেন ধর্মমঙ্গল—

বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে।
যেবা মনে করি ভাষা লিখি অনায়াসে॥

অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গলকার কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরামের কাব্যই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে প্রথম মুদ্রিত রূপে প্রকাশিত হয়। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা করেন। মুদ্রিত গ্রন্থে কবির আত্মকাহিনী নাই, সেইজন্য কেহ কেহ মনে করেন, মূল পুথিতে কবির আত্মকাহিনী ছিল,

১ পৃঃ ৫১৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) ২ পৃঃ ৫২২ পাদটীকা ঐ

বঙ্গবাসীর প্রকাশক মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ও যোগেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঘনরাম পণ্ডিত কবি, তাঁহার ভাষা সুমার্জিত নাগরিক ও ভারত চন্দ্রের ভাষার যথার্থ অগ্রজা। ভাষা অনুপ্রাসযুক্ত অনেক সময়ে কবি উৎকট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তর দিক অর্থে 'বিরাট-তনয় মুখ', ঊষা-কাল অর্থে 'গোবিন্দ-তনয়-সুত-জায়া' দশ বাণ (দশবার দহনে বিশুদ্ধ) সোনা অর্থে 'ইন্দু বিন্দু বাণ হেম' প্রভৃতি শব্দে তাঁহার রচনা সময়ে সময়ে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ঘনরামের কাব্যে বহু সংস্কৃত শ্লোকেব সংহৃত অনুবাদ দেখা যায। যেমন—

মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥

সুবৃক্ষ চন্দন-গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥
কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে॥

রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু।
কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্যের কিরণে॥

তাছাড়া ঘনরাম গ্রন্থখানির সর্বত্র বহু পুরাণ-কাহিনীর সমাবেশ করিয়াছেন। লেখক যে সুপণ্ডিত 'কবিরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত রচনায় তাহার পরিচয় আছে। তবে পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার কাব্যে ঘটনার সাবলীল গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। লাউসেনের বীর-চরিত্রের পাশাপাশি ভীরু 'কর্পূর-ধবলে'র চরিত্র তিনি রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করিলেও একান্তভাবে রামভক্ত, রামায়ণ প্রসঙ্গের অবতারণাও তাঁহার কাব্যে খুব বেশী। অনেক স্থলেই তিনি নিজেকে ভণিতায় রামদাস বলিয়াছেন—

শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।
কবিরত্ন ভণে প্রভু পূর মনস্কাম॥

শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

এ রামের নাম থাকিতে নিগূঢ়।
কেন ঘোর নরকে নিবাস করে মূঢ় ॥

দুষ্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঙ্কুর ॥ প্রভৃতি

ঘনরামের অনুপ্রাস-প্রিয়তার দৃষ্টান্ত—

বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুল কুল কুরব কমল কানে কান ॥

গদ গদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায় ॥

চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা ॥

ঘনরাম ব্যতীত অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কবিদিগের মধ্যে রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে (১৭৩২—৩৩ খ্রীঃ), নরসিংহ বসু (১৭৩৭ খ্রীঃ), প্রভুরাম মুখুজ্জে (১৭৪৮ খ্রীঃ ?) হৃদয়রাম সাউ (১৭৪৯ খ্রীঃ), শঙ্কর কবিচন্দ্র ও নিধিরাম কবিচন্দ্র (১৭৪৯ খ্রীঃ), মানিকরাম গাঙ্গুলি (১৭৮১) ও রামকান্ত রায়ের (১৭৯০ খ্রীঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে মানিকরাম গাঙ্গুলি ব্যতীত অন্য কাহারও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নাই। মানিকরাম ঘনরামের মতোই সংস্কৃতজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। আদিরস বর্ণনায় মানিকরাম বিশিষ্ট, তাঁহার লখ্যা ডোমনীর চিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণ ঠিক ধর্মমঙ্গল নহে। ইহা ছয়টি অংশে বিভক্ত। ১ম অংশ সৃষ্টি পত্তন, ২য় শিবায়ন, ৩য় মীননাথ-গোর্খনাথ কাহিনী, ৪র্থ গঙ্গার উপাখ্যান, ৫ম সদাডোম রমাই পণ্ডিত ও ভূমিচন্দ্র রাজার হাকন্দ সেবন কাহিনী, এবং ৬ষ্ঠ অংশ হরিশ্চন্দ্র লুইচন্দ্রের কাহিনী। সহদেবের গ্রন্থে লাউসেনের কাহিনী নাই। 'রমাই পণ্ডিত'

নামের ছদ্মবেশে দ্বিজ লক্ষ্মণও সহদেব চক্রবর্তীর অনুরূপ আর একখানি অনিল-পুরাণ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অসমাপ্ত, ইহাতেও নাথ-ধর্মের প্রভাব ও নাথ-সিদ্ধার কাহিনী আছে। ইহাতে জাজপুরের প্রসঙ্গে কবি ধর্মঠাকুর ও চণ্ডী-দেবীকেও মুসলমান বানাইয়া জবাই-করা পশু নিবেদন করিয়াছেন—

সৈয়দ মোলনা কাজি বৈসে স্থানে স্থানে।
ঈদ পার্বণ করে আনন্দিত মনে॥
নিরঞ্জন ভাবে তারা নিজ শাস্ত্র পড়ি।
বনের পশু আনি তার গলায় দেয় ছুরি॥
তথাত্র খর্পর পাতি দেবী হন দিগম্বরী।
নিরক্ষ রুধির পান করে মহেশ্বরী॥

অষ্টাদশ শতকের কবি দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত 'লাউসেন চুরি পালা', দ্বিজ রসিক ও ভবানন্দ রায় 'গোলাহাট পালা' এবং রামনারায়ণ 'ইছাই বধ পালা' রচনা করিয়াছেন। তাছাড়া গোবিন্দরাম বাঁড়ুজ্জের একটি ধর্মমঙ্গল কাব্যের কিছু অংশ পাওয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিবায়ন

শিবায়ন অর্থে শিব-কাহিনী। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ও লোক-প্রচলিত উভয়বিধ শিবকথাই শিবায়ন-কাব্যের বিষয়বস্তু। শিবায়নের সকল কবিই যে উভয় প্রকার কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নহে। রামকৃষ্ণ রায় ও দ্বিজ কালিদাস কেবল পৌরাণিক কাহিনীর কবি। তাঁহাদের কাব্যে সমুদ্রমন্থনে শিবের বিষপান, শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস ও মদনভস্ম, শিব-পার্বতীর বিবাহ, শিবরাত্রি-ব্রত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণকথাই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। 'মৃগলুব্ধ' নাম দিয়া একটি শিব-কথার অবতারণা করিয়াছেন রামবাজা ও রতিদেব, তবে তাহাও শিবরাত্রির অনুসরণে রচিত ও পৌরাণিক লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। সেইজন্য এই কাব্যগুলি ঠিক জন-সাহিত্য বা মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত নহে। অপরপক্ষে বাংলার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বিচিত্র শিব-কথা সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন—দ্বিজ কবিচন্দ্র ও কবি রামেশ্বর। তন্মধ্যে রামেশ্বরের কাব্যই সুপবিণত ও ব্যাপক। একমাত্র বিষপানের কাহিনী ব্যতীত একদিকে শিবের প্রায় সমস্ত পৌবাণিক কাহিনী এবং অপরদিকে জন-প্রচলিত সমস্ত লৌকিক কাহিনী একত্র করিয়া ইহা যথার্থ মঙ্গলকাব্যের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছে। তাছাড়া, বাঙালীর ভোজ্য-তালিকা, বিশ্বকর্মার কৃতিত্ব, পবননন্দনের সহায়তা, এবং কাঁচলি-চিত্রণ প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের অঙ্গসজ্জাও ইহার মধ্যে দেখা যায়। সেইজন্য ইহাকে মঙ্গলকাব্যেরই শাখা রূপে দেখা হইয়া থাকে।

কাব্যাদর্শের দিক দিয়া শিবায়নকে কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলকাব্য বলা চলে না। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—উদ্দেশ্যমূলকতা ইহাতে নাই। শিব-পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে অথবা শিবের শ্রেষ্ঠতার বিজ্ঞাপনের জন্য শিবায়ন রচিত নহে। ইহাব কাহিনীও মঙ্গল-কাব্যোচিত নহে। দেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও পার্থিব মানবের জীবন-কথা মঙ্গল-কাব্যে বর্ণনীয়; কিন্তু শিবায়নে বর্ণনীয় দেব-জীবন মাত্র। চাঁদ সদাগর, কালকেতু বা লাউসেনের মতো মানব নায়ক বা বেহুলা, খুল্লনা, রঞ্জাবতীর মতো মানবী নায়িকা ইহাতে নাই; ইহার

নায়ক-নায়িকা শিবদুর্গা, এবং বর্ণনীয় উভয়ের দাম্পত্য-লীলা। তাছাড়া প্রাণধর্মের উত্তেজনাই মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য; অথচ শিবায়নে দাম্পত্য-কলহ ব্যতীত কোন প্রকার উত্তেজক ব্যাপার নাই, যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, জয়-পরাজয়—রোমাঞ্চকর কোন ঘটনাই নাই। ঘটনার দ্রুততা বা নাটকীয় পরিস্থিতি নাই, সমস্তই ধীর মন্থর ও প্রশান্ত; একটা দৈব অভিশাপ পর্যন্ত নাই। এমনকি কাব্যরচনার কৈফিয়তস্বরূপ কবির প্রতি দেবতার স্বপ্নাদেশও নাই—কবি নিজেই গ্রন্থরচনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শিবায়নের এইপ্রকার উদ্দেশ্যহীনতা, প্রাণধর্মের পরিবর্তে মনোধর্মের বা মাধুর্যরসের প্রাধান্য, নাটকীয়তার অভাব ও লেখকের গ্রন্থ দায়িত্ব স্বীকার কেবল যে মঙ্গলকাব্যবিরোধী তাহা নহে, ইহা প্রাচীন কাব্য-প্রথারই বিরোধী, ইহা আধুনিক কাব্য ধর্মেরই বিস্ময়কর পূর্ব-প্রকাশ। ৮

শিবদুর্গার দাম্পত্যজীবন লইয়া কাব্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—অমর কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় কবির শিবায়ন কালিদাসের কাব্যের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কুমারসম্ভবের শিবকথা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৌরাণিক, কিন্তু শিবায়নের শিবকথা একেবারে লৌকিক না হইলেও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ লৌকিক। লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইতরতায় পৌরাণিক গাম্ভীর্য-চ্যুতি অনিবার্য। জানা উচিত, স্বর্গলোকের দেব-দেবীকে ঘিরিয়া পাঠকচিত্তে একটি ভাবের জ্যোতির্মণ্ডল বিরাজ করে, সেখানে প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ইতরতা স্থান পাইতে পারে না। সেই জন্য দেবদেবী-জীবনে বাস্তব-জীবনের ইতরতা দেখাইলে তাঁহাদের জ্যোতি-হীনতা ও রস-হানি ঘটে। স্বর্গকে মাটির পৃথিবীতে টানিয়া আনিলে মাটি স্বর্গ হইয়া যায় না, স্বর্গই মাটি হইয়া যায়। দেব-দম্পতীর মধ্যে লৌকিক ভাব দেখাইতে গিয়া এমনকি কালিদাসও কতকটা মর্যাদাহানি করিয়া ফেলিয়াছেন। সেক্ষেত্রে শিবায়নের দুর্বল কবি যে দেবতার সর্বনাশ ঘটাইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি। শিবায়নের সম্বন্ধে কোন সমালোচক লিখিয়াছেন—"এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস-জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরানীর জীবন-কাহিনী।"[১]

১ পৃঃ ২৬-২৭ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, (নন্দগোপাল সেনগুপ্ত)

সত্য কথা বলিতে কি, শিবায়নের শিবদুর্গা বাংলার ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও নহেন, শিব প্রথমে বঙ্গপল্লীর ভিক্ষুকবেশে এবং পরে কৃষকরূপেই শিবায়নে দেখা দিযাছেন এবং পার্বতীও মাছ ধরিবার জন্য কোমরে আঁচল জড়াইয়া বাগ্দিনী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শিবায়নে শিব-লাঞ্ছনার তুলনা নাই। পৌরাণিক কল্পনায় যিনি দেবাদিদেব মৃত্যুঞ্জয় 'মহা'দেব, রজতগিরির ন্যায় বিশাল সুন্দর যাঁহার মূর্তি, যাঁহার কপালে শশী, জটায় গঙ্গা, নয়নে অগ্নি ও মুখে আগম-নিগম তত্ত্ব, বঙ্গীয় কল্পনায় তিনি হইয়াছেন—অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল ও তরুণী ভার্যার উপহাসাস্পদ বৃদ্ধ স্বামী। যিনি ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার জন্য সমুদ্রমন্থনকালে দুঃসহ গরলজ্বালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কবি তাঁহাকে করিয়াছেন গাঁজাখোর সিদ্ধিখোর ও অর্ধোন্মাদ। মহাপ্রলয়ে যাঁহার তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, শিবায়নের কবি তাঁহাকে ভিক্ষার জন্য বৃদ্ধের নাচ নাচাইয়াছেন। যিনি যোগীশ্বর, যাঁহার নেত্রাগ্নি মুহূর্তের মধ্যে কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তিনি বাঙ্গালী জন-কবির পাল্লায় পড়িয়া বৃদ্ধ লম্পট রূপে চিত্রিত হইয়াছেন এবং কোচ-যুবতী ও বাগ্দিনীর যৌবন দেখিয়াই বেসামাল হইয়াছেন। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত ভারত মহিম্নস্তব রচনা করিয়াছে, বঙ্গদেশ তাঁহাকে অর্ঘ্য দিয়াছে জনতারূপ দক্ষের ছাগমুণ্ডোচ্চারিত শিবস্তুতি।

আরও দুঃখের বিষয় শিবায়নে বর্ণিত শিবের কৃষকবৃত্তি, কামুকতা ও লাম্পট্যের সমর্থন করিতে গিয়া কোন আধুনিক গবেষক শিব-মহিমার শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। তিনি বহু গবেষণা করিয়া জনতার আদিম শিব ধারণার মধ্যে কৃষিকার্য, প্রজনন-প্রক্রিয়া এবং 'ইডিপাস-কমপ্লেক্স' ও 'লিবিডো' আবিষ্কার করিয়া তাহা সাহিত্যের শিবের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে ইতরতাই শিবের সত্য পরিচয় এবং শিবায়নের শিবে ইতরতার কল্পনা তথ্য-সম্মত। "রামেশ্বর ধার্মিকতাকে অস্বীকার করলেন না, তার পাশে সমান স্থান দিলেন মানবিকতাকে।"[১] সেইজন্য শিবায়ন কাব্যের "কথা-শরীরে কোথাও আদিরসের আধিক্য, কোথাও বা মানব-রসের আতিশয্য দেখা দিল।"[২] এই আদি-রসের আধিক্য ভারতচন্দ্রীয়

১ ও ২ পৃঃ ১৫৯ বাংলা কাব্যে শিব

রুচিহীনতা নহে, কারণ ইহা মৌলিক তথ্যসম্মত। অতএব "তিনি (রামেশ্বর) ও তাঁর শিব উভয়েই ভারতচন্দ্রীয় হয়েও ভারতীয, অভিজাত হয়েও লোকায়ত।"[১] বলা বাহুল্য, এই ওকালতির পক্ষে কোন যুক্তি নাই। বাস্তবতার দোহাই দিয়া কেবল শিবের কেন, কাহারও শ্লীলতাহানি ভদ্রসমাজে সমর্থনীয় হইতে পারে না। শিবায়নে শিবের দেব-মর্যাদা তো বটেই, মানবিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। রামেশ্বর শিবের যে মানবিকতা দেখাইয়াছেন, তাহা ভদ্র বা সভ্য নহে—বর্বর মানবিকতা মাত্র। তাছাড়া শিবরূপের আদিম কল্পনার মধ্যে ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স প্রভৃতির আবিষ্কার মহান ব্যক্তির শরীরে মূত্র-পুরীষাদি আবিষ্কারের ন্যায় তুচ্ছ ও অবাস্তব,—সাহিত্যের রসজগতে তাহার কোনো মূল্য নাই।

অবশ্য একথা সত্য যে, শিবায়নে শিবত্বহানি ও সম্ভ্রমবোধের অভাব সত্ত্বেও রামেশ্বর কাব্যের বহু স্থলেই লিখিয়াছেন—"ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর।" এই 'ভদ্র' শব্দ আপেক্ষিক। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—তৎকালীন বঙ্গদেশে শিব-কথা যে পরিমাণে পঙ্কিল ও কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনায় রামেশ্বরের কাব্য যথেষ্ট ভদ্র। প্রাচীন বঙ্গে জনসাধারণের রুচিবোধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই সুস্পষ্ট। কৃষ্ণ-ধামালী-গানে 'লোকায়ত' জন-জীবনের আদিমতা কৃষ্ণকথাকে এতখানি অশ্লীল করিয়া তুলিয়াছিল যে উহার আসর নির্দিষ্ট হইয়াছিল গ্রামের বাহিরে।[২] বাঙালী এই ব্যাপারে শিবকেও অব্যাহতি দেয় নাই, নিজেদের মনের কালিমায় শিবকে কালিমালিপ্ত করিয়া মনের আনন্দে রচনা করিয়াছে—শিব-ধামালী। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের ভূমিকায় যে সকল শিবের গান দেখা যায়, সেগুলি শিব-ধামালীরই অপেক্ষাকৃত ভদ্র সংস্করণ। সেখানেও শিব-লাঞ্ছনা অল্প নহে। শিব-ধামালীর তুলনায় রামেশ্বরের রচনা যে "ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য," সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভুলিলে চলিবে না —জন-সাহিত্য মাত্রই জন-গণের রুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। কাজেই শিবায়নে শিবমর্যাদা হানির জন্য কবি রামেশ্বর কেবল নিজেই দায়ী নহেন।

অবশ্য শিবায়নে শিব-মর্যাদা রক্ষার একটা বাহ্য প্রয়াস আছে। রামেশ্বর

১ পৃঃ ১৪৯ বাংলা কাব্যে শিব

২ 'আসল ধামালী গ্রামের বাহিরে গীত হইয়া থাকে'—পৃঃ ২০৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

কৌশলে তাঁহার শিব-চরিত্রের ঐশ্বর্যহীনতার একটা কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহাদেবের মধ্যে "লক্ষ্মীছাড়া লোকের লক্ষণগুলি কেন?"—শিবের প্রতি পার্বতীর এই প্রশ্ন আসলে সমস্ত পাঠকের প্রশ্ন। শিব ইহার দুইটি উত্তর দিয়াছেন—একটি পৌরাণিক ও একটি দার্শনিক। রুক্মিণী-রূপিণী লক্ষ্মীর পুত্র কামকে ভস্মীভূত করিবার জন্য শিব লক্ষ্মীছাড়া—"লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী সে রোষে হৈল বাম॥" এই পৌরাণিক কৈফিয়তের পর দার্শনিক কৈফিয়ত—

শিব বলে শুন সতী সত্য সুভাষণ।
আত্মারাম নাম মোর আত্মতত্ত্ব ধন॥
শুদ্ধ সত্ত্ব স্বভাব সর্বথা সদা শিব।
যোগমায়া জন্যে যাহা জানে নাই জীব॥

দক্ষযজ্ঞের সতী ও দক্ষকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে—

জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর নির্বাণের গুরু।
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বাঞ্ছা কল্পতরু॥

অর্থাৎ তাহার লৌকিক গুণবত্তা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই কৈফিয়ত ব্যর্থ, শিবের কার্যের দ্বারা তাঁহার মৌখিক মহত্ত্ব ও দেবত্ব সমর্থিত হয় নাই। যিনি "আত্মারাম", তিনি অন্নগত-প্রাণ ও ক্ষুধাকাতর হইবেন কেন—"ভালো, তবে ভোলানাথ ভিখ্ মাগে কেন?" যিনি "শুদ্ধ সত্ত্ব স্বভাব," তিনি কোচ-যুবতীদের সঙ্গে নব-রাস-লীলা করিবেন কেন? তিনি "নির্বাণের গুরু," তাঁহার সিদ্ধির নেশা, কৃষিকর্ম এবং বাগ্দিনীর প্রতি আসক্তির সঙ্গতি কোথায়? রামেশ্বর এ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পান নাই বলিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য নারদকে দিয়া একটা মিষ্টিক উত্তর দেওয়াইয়াছেন। শিব-বিবাহের সময়ে ক্রন্দনরতা মেনকাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে—শিব 'আচাভুয়া' বটে, কিন্তু তিনি মায়াবী তাঁহার কার্যকলাপ সমস্তই "দেবমায়া"—"দেবমায়া দেখ্যা মোরে দোষ দেও তুমি॥" তথাপি রামেশ্বর পার্বতীর ন্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে শিব—"আপনার অখ্যাতি আপনি কৈল লোকে।"

শিব মর্যাদাহানির প্রধান কারণ কবির নিজের মধ্যেই বর্তমান। রামেশ্বর

সত্যকার শিবভক্ত নহেন ; তিনি কৌতুক-প্রিয় কবি। শিবের অনুচর, বাহন ও বেশভূষার অদ্ভুতত্বের জন্য পৌরাণিক শিবকাহিনীর মধ্যে কৌতুকের উপাদান প্রচুর ; কোন মানবজীবনই এত বেশী কৌতুককর হইতে পারে না। সেইজন্যই কবি শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্যের কাহিনী না লইয়া পৌরাণিক শিব-কথাকেই কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে ভূত-প্রেতের বর্ণনা —"কুলা পারা মুখ তার মূলা পারা দাঁত ," ভূতগুলা যজ্ঞ-হোতার—"চড়ায়্যা উড়াল দাঁত উপাড়িয়া দাড়ি। শিবের বিবাহে পেত্নীদের মশালজ্বালা, ভূতের আতসবাজির খেলা—"কৌতুকে কুষ্মাণ্ডগণ গড়াগড়ি যায়", এবং "চরকি হইয়া কেহ চলে সাথে সাথে।" স্ত্রী-আচারের সময়ে নারদের কৌশলে শিবের দিগম্বর হওয়া , নারীগণের পরস্পরের জামাই-নিন্দা , কোচনী পাড়ায় শিবের নাচ , ভোজনকালে শিবের পাঁচমুখ, গণেশের হাতী-মুখ ও কার্তিকের ছয় মুখ—"তিনজনে একেবারে বার মুখে খায় ," শিবের ভৃত্য বৃকোদর ভীমের ভোজনে "গণ্ডশৈল সমান নির্মাণ কৈল গ্রাস ," ঢেঁকির মর্মবেদনা জ্ঞাপন—

"নারায়ণ কৈল মোরে নারদের হাতী।
কুট্যা ধান গেল প্রাণ খাইয়া ম্যায়্যার লাথি ॥

নারদ কর্তৃক ঢেঁকিকে আদর—"শুনি মুনি সুখে তাকে করিলেন কোলে," মশার কামড়ে ভীমের সর্বাঙ্গে "সিকি আনি দুয়ানি দাগিল অঙ্গময় ," ডাঁশ মশার রূপ—

উষ্ট্র সম চরণ মাতঙ্গ সম মুণ্ড।
দুই দিকে দুই দণ্ড মধ্যে তার শুণ্ড ॥

এবং ডাঁশের অপূর্ব চরিত্র—

কানে কানে কুনু কুনু করাবে সম্ভাষ।
পায়ে পড়্যা পশ্চাৎ পিঠের খাবে মাস ॥

বাগ্দিনী মারিতে আসিতেছে দেখিয়া ভীমের ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন—"ভীমের ভাবনা হৈল ভাঙ্গিলেক ঘাড।" শাঁখা পরিবার জন্য শিবের নিকটে পার্বতীর নারীজীবনের গোপন দুঃখের কাহিনী—

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই ॥

এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত রামেশ্বরের কৌতুকপ্রিয়তার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। নারদের ঢেঁকির প্রসাধন-সজ্জাটিও কবির কৌতুক-প্রিয়তার ফল—

ঝুড়িটাক কাঁকড়া মাটির কৈল ফোঁটা।
পাতন করিয়া দিল পুরাতন চাটা॥ ··
রেকাব বাবুই-বাসা বাঁধে দুই পাশে।
কোটেক কোন্দল যার কুটার নিবাসে॥···
তিত-পলতা, পুরুলের ছোট বড ঝাটা।
মনোহর গজকা মাথায় মুড়া ঝাঁটা॥
থরে থরে থোপ দিল থুপি ঝিঙ্গা জালি।
দুটি চক্ষুদান দিল দিয়া হাঁড়ীর কালি॥

ঢেঁকির রূপ দেখিয়া নারদ নিজেই হাসিয়া অস্থির—

পুরাতন কুলার করিয়া দুই কান।
হরষিত হইয়া মুনি হাস্যা পাক যান॥

ঢেঁকিও নিজের রূপে মুগ্ধ—

ঢেঁকি বলে কি সুন্দর সাজিলাম আমি।
অতঃপর আপনার সাজ কর তুমি॥

রামেশ্বরের কৌতুকপ্রিয়তা শুধু যে শিবের শিবত্বহানি ঘটাইয়াছে তাহা নহে, ভক্তি-তত্ত্বের সূত্রকার ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদকেও বিদূষক-ভণ্ডে পরিণত করিয়াছে। খুব সম্ভব কবি নিজেই তাঁহার কাব্যে নারদ সাজিয়া দেখা দিয়াছেন। প্রতিপক্ষদলকে কুপরামর্শ দিয়া কৌশলে ঝগড়া বাধাইয়া মজা দেখাই নারদ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার হরিভক্তির সহিত কোন্দল-প্রিয়তার সঙ্গতি ঠিক বুঝা যায় না, সন্দেহ হয়, হরিভক্তি তাঁহার ছদ্ম-আবরণ মাত্র। তাঁহার গোঁফ দাড়ি ও পরচুলা খুলিয়া ফেলিলে তাঁহার ভিতর হইতে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুদত্তই বাহির হইয়া আসে। নারদের রসিকতা বহুক্ষেত্রে 'আগুন লইয়া খেলা' হইয়াছে, রঙ্গরসের পরিণামে ভয়ংকর ট্রাজেডি সৃষ্টি করিয়াছে। নারদের রঙ্গ-কৌতুকই 'সতী'র আত্মহত্যার কারণ। নারদই একদিকে দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দিয়াছে, আবার অপরদিকে শিব ও সতীকে উত্তেজিত করিয়াছে। শিবের সহিত

মাতুল সম্পর্ক স্থাপনের মূলেও রহিয়াছে নারদের দুষ্টবুদ্ধি। এই সম্পর্কসূত্রেই শিবের শাশুড়ি মেনকাকে 'দিদিমা' বলিয়া ইতর রসিকতার সুযোগ লইয়াছে। শিব-বিবাহে স্ত্রী-আচারের সময়ে নারদই শিবের কটিবন্ধনকারী সর্পের সম্মুখে তীব্রগন্ধি ওষধি দেখাইয়াছে, তৎফলে—"শাশুড়ী সম্মুখে শিব হইল উলঙ্গ।" শুধু তাই নহে, মেনকাকে—"মহেশের পিছে থাক্যা মুনি মাল্য ঠেলা।" তারপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া—"বানীরে বহস্য করে ঋষি হইয়া নাতি।" এবং এখানকার এই রঙ্গ-রহস্য অসম্ভোচিত। রঙ্গ দেখিবার জন্য সরলবিশ্বাসী পাবর্তীর কাছে শিবের চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা নিন্দা করিতেও সে কুণ্ঠিত নহে—"মামাকে করেছে বশ গোটাকত মায়্যা।" নারদই শিবকে জব্দ করিবার জন্য পার্বতীকে উড়ানি মশা, ডাঁশ ও জোঁক পাঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছে। নারদেরই চক্রান্তে দুর্গা বাগ্দিনী সাজিয়া শিবকে নানারূপ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপদস্থ করিয়াছে, আবার, শিবকে শাঁখারীরূপে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সে-ই বলিয়াছে—

বাগ্দিনী হয়্যা যত দুঃখ দিল উমা।
তার শোধ দিতে পার তবে মোর মামা॥

লক্ষ্য করিতে হইবে, নারদ শেষ পর্যন্ত হরগৌরীর নিকট হইতেও নিজের সার্টিফিকেট আদায় করিতে ছাড়ে নাই,—"বিশ্বনাথ বলে বড় যোগ্য লোক তুমি" এবং "গৌরী দেখ্যা বলে বড় গুণের ভাগিনা"। বলা বাহুল্য, নারদ সত্যকার বাঙ্গালারই একটি বাস্তব চিত্র।

শিবায়নে রামেশ্বরের কৌতুকপ্রিয়তা দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"প্রাচীন কাব্যের মধ্যে নিছক হাস্য-রসের কাব্য এই শিবায়ন।"[১] কিন্তু কৌতুক বা হাস্যরস কখনই কোন পূর্ণাঙ্গ ও অখণ্ড কাব্যের অঙ্গী রস হইতে পারে না। কৌতুক-হাস্য রস-জগতে সম্পূর্ণ অভাবাত্মক—আকস্মিক অসঙ্গতি বা ভাব-সামঞ্জস্যের অভাবের ফলই কৌতুক-হাস্য। শিবায়নে বহু কৌতুককর ব্যাপার থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহে মধুর রসেরই কাব্য। এই মধুর রস বৈষ্ণবীয় প্রেমের 'মধুর রস' নহে, অথবা ভারতচন্দ্রীয় লালসার আদি-রসও নহে। ইহা সুসঙ্গতি ও কল্যাণবোধসঞ্জাত।

১ পৃ: ৩১৭ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ১ম খণ্ড (কালিদাস রায়)

উপকারীর কাছে উপকৃতের কৃতজ্ঞতায়, সখার সখ্যে, ভৃত্যের আত্ম-নিবেদনে, পিতার পুত্রস্নেহে, সন্তানের মাতৃবৎসলতায়, প্রতিবেশীর সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় যে একটি পরিপূর্ণতা ও তৃপ্তির আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই হইতেছে মধুর রস এবং উহাই শিবায়নের ফলশ্রুতি। শিবায়নে আদ্যন্ত গৃহ-জীবনেরই জয়ধ্বনি। ইহার নায়িকা ঘরণী-রমণী পার্বতী; স্বামী-পুত্র ও ভৃত্য লইয়া ইহার সংসার; সংসার অভাবের হইলেও গৃহিণীপনার গুণে ইহার সর্বত্র একটি লক্ষ্মীশ্রী বিরাজিত। প্রেম, বাৎসল্য ও সেবাব্রতের পূর্ণচিত্ততা লইয়া পার্বতী নিজ গৃহস্থালীর প্রতিটি তুচ্ছ বস্তুকেও মধুময় করিয়া তুলিয়াছেন। রামেশ্বর দেখাইয়াছেন, পার্বতীর বালিকামূর্তি উমারূপেও এই মাধুর্য বর্তমান। বালিকা উমা খেলিবার সময়েও সংসার-খেলা খেলিয়াছে, পুতুল-কন্যা লক্ষ্মীকে পুতুল-নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে এবং বরযাত্রীদিগকে কচুপাতায় ধুলার ভাত, কুলবিচির বড়ি, খোলামকুচির পুঁটি মাছ এবং পুকুরের পাকের দই পরিবেশন করিয়াছে। তাহার নূতন গৃহিণীপনা দেখিবার মতো। পুতুল-জামাইকে বলিয়াছে—

> কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
> বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি ॥

এবং কন্যা-বিদায়কালে পুতুল-কন্যার—

> চাঁদ মুখে চুম্বন করিয়া তার পর।
> চক্ষে জল দিয়া কান্দে কর্যা কলস্বর ॥

উমার এই 'চক্ষে জল দিয়া' অশ্রুজলের অভিনয়ে ও সুমিষ্ট কলকণ্ঠে কান্নার অনুকরণে কন্যাবৎসল কবির স্নিগ্ধ হাস্য দ্রষ্টব্য। সত্যকার সংসার-চিত্রের পার্বতী কবি-চক্ষে অপূর্ব রমণীয়। পুত্র কার্তিক গণেশের কলহ মিটানো ব্যাপারে, স্বামিপুত্রের সেবায়, রন্ধনাদি গৃহকর্মে তাঁহার কল্যাণী মূর্তি অপূর্ব আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর ব্যঙ্গোক্তি, সন্তানের দুষ্টামি তাঁহার অন্তরের মধুচক্রে আঘাত দিয়া কেবল মধুক্ষরণই করাইয়াছে। অন্ন পরিবেশন কালে পিতাপুত্র উভয়েই পার্বতীকে বিব্রত করিয়াছে; একদিকে "অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে" অন্যদিকে সেই সঙ্গেই "গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা।" এর মধ্যে আবার শিবের দুষ্টামিও আছে—

শঙ্কর শিখায়ে দেন, শিখিধ্বজ কয়—

"রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥"

কিন্তু পার্বতীর বিন্দুমাত্র বিরক্তি নাই, বরং "বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে।" অন্নপরিবেশনের এই অভিনব পরিবেশে গৌরীর কমনীয় সুকুমারীত্ব কবির দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই—

দিতে দিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর॥
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥
খর বাদ্যে সুপদ্যে নর্তকী যেন ফিরে।

এবং শেষ পর্যন্ত কোমলাঙ্গী সুকুমারীর অতিরিক্ত পরিশ্রমে—

খসিল কাঁচলি কুচে পয়োধর ভার॥

লক্ষ্য করিতে হইবে, কাব্যের বিশুদ্ধ মধুর রস শেষ পর্যন্ত আদি-মধুরে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে। দাম্পত্য-জীবনে ইহা অবশ্য প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য রসিক কবি গ্রন্থশেষে পার্বতীর শঙ্খ-পরিধান-কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে শাঁখার অভাবে পার্বতীর অভিমান, শিবের শাঁখারিবেশ ধারণ ও ছদ্মবেশে প্রিয়ার অঙ্গসম্বাহন বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার অনিবার্য পরিণতি—পার্বতীর মানান্ত-মিলন এবং দম্পতীর পূর্ণ সম্ভোগ।

মঙ্গলকাব্যের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শিবায়নই সর্বাপেক্ষা অধিক রিয়ালিস্টিক। পৌরাণিকতার আবরণে ইহা পল্লী-বাংলার সত্যকার সাধারণ জীবনের কাব্য। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে অভিজাত নাগরিক জীবনই প্রকাশিত। লাউসেন-রঞ্জাবতী, চাঁদ-বেহুলা বা ধনপতি-খুল্লনা কেহই দরিদ্রও নহে, পল্লীবাসীও নহে; অভিজাত ও নাগরিক বলিয়া সাধারণ দরিদ্র পল্লীবাসীর চক্ষে ইহারা অনেকটা রোমান্টিক। বঙ্গপল্লীতে সাধারণতঃ ব্যাধজাতি দুর্লভ বলিয়া কালকেতুর জীবনও ঠিক সাধারণতা বা রিয়ালিজমের মধ্যে পড়ে না। বলা বাহুল্য, বঙ্গ-পল্লীর সাধারণ জীবন হইতেছে দরিদ্র চাষী-গৃহস্থের জীবন। এই চাষী-গৃহস্থেরই

জীবিকা-কর্ম, আর্থিক অবস্থা, পরিজন ও অন্তঃপুরের পূর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে শিবায়নে। সেইজন্য শিবায়ন জন-জীবনে যে-পরিমাণ সহানুভূতির উদ্রেক ও রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছে তাহা অন্য মঙ্গলকাব্যের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে—শিবায়নের দেবতাও হইয়াছে সর্বাপেক্ষা মানবীয় ও বাস্তব। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের দেব-দেবী ধর্মঠাকুর, মনসা, চণ্ডী—ইঁহারা কেহই মানব-মানবী নহেন; ইঁহাদের দৈবতার মহিমা না থাকিলেও অপদেবতার শক্তি আছে। কাজেই ইঁহারাও রোমাণ্টিকই বটেন। শিবায়নের শিব, দুর্গা ও নারদকে কিন্তু এখনও পল্লীবাংলার পথেঘাটে দেখা যায়। এইখানেই শিবায়নের বিশিষ্টতা এবং এইজন্যই শিবায়ন জনপ্রিয়।

নেপথ্য-বার্তা

শিবের গান, শিব-কাব্য ও শিব-কবি

শিব প্রাগার্য দেবতা, বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণও আর্য নহে, প্রাগার্য। সুতরাং বাঙ্গালীর শিব-প্রিয়তা স্বাভাবিক। শিব নিঃস্ব ভিক্ষুক, সেইজন্য দরিদ্র বাঙ্গালীর সমবেদনার পাত্র ও আপন জন, তাহার উপর আবার ভোলানাথ, উলঙ্গ সিদ্ধিখোর ও ভূত-পতি, সেইজন্য কৌতুকের পাত্র। এ-হেন শিবকে লইয়া বাঙ্গালীরা যুগে যুগে হাস্য-কৌতুকের গান এবং কাব্য রচনা করিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।[১] অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে পল্লীগ্রামে শিবের গান প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রবাদবাক্য—

১ আধুনিক যুগের একটি কৌতুককর শিবের গান—

(বাবা) শিব ঠাকুরটি হয়ো না।
গাঁজা ছাড়া বরাতে আর অন্য কিছুই জুটবে না॥
সাপে এসে ধরবে গলা
ভূতেরা সব সাজবে চেলা
বিষম জব্দ শীতের বেলা লেপকাঁথা কেউ দেবে না॥

"ধান ভানতে শিবের গীত"। ষোড়শ শতকে রচিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥

শিব-গীতি পল্লী জন-সাহিত্যেরই অন্তর্গত এবং পুচ্ছগ্রাহিতা বঙ্গীয় জন-সাহিত্যের ধর্ম। কাজেই পরবর্তীকালের শিব-গীতির বৈশিষ্ট্য হইতে অনুমান করা চলে যে পূর্ববর্তী শিব-গীতিও পৌরাণিক ছিল না। শিবের গানের বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম্য রঙ্গরস এবং হাস্যকৌতুক। শিব গীতির প্রাচীনতম রূপ শিব-ধামালী বা নিম্নজাতীয়া নারীদের সহিত বৃদ্ধ শিবের লাম্পট্য। প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গলে সেইজন্য শিব-ধামালী দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকার শিব-গীতি শিবের কৃষি কর্ম বিষয়ক। 'শূন্য-পুরাণে' শিবকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে—

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা বাঘের ছড়॥

এখানে নিঃস্ব শিবের প্রতি বাঙ্গালী হৃদয়ের করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকার শিব-গীতি দুর্গার শাঁখা পরার সাধ—তৎফলে শিবের সহিত কোন্দল ও শেষে দাম্পত্য-মিলন। উল্লিখিত লৌকিক শিব-কাহিনীই শিবায়ন-কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শিবের গান ছাড়াও ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং নাথ গীতিকায় অন্য শিব-কাহিনী দেখা যায়। এই দুই জায়গায় শিব একজন সিদ্ধ গুরু ও ধর্মঠাকুরের পুত্র, এখানে কিন্তু শিব-চরিত্র ইতর বা কৌতুককর নহে। সপ্তদশ শতক হইতে শিব-কবিতা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র কাব্যরূপে প্রকাশ পায়। তবে সপ্তদশ শতকের

অধিকাংশ শিব-কাব্য হইয়াছে পণ্ডিতী রচনা ও পৌরাণিক কাব্য। যথার্থ মঙ্গল-কাব্য জাতীয় শিবায়ন রচিত হইয়াছে সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে ও অষ্টাদশ শতকে। আনুমানিক ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কবি 'রতিদেব'ও শিবচতুর্দশী উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'মৃগলুব্ধ' কাব্য রচনা করেন। রামরাজা বা রাম রায়ও একটি 'মৃগলুব্ধ' রচনা করিয়াছেন, তাহার রচনাকাল অজ্ঞাত। উভয় কাব্যের ভাবে ও ভাষায় ঐক্য আছে। পৌরাণিক শিব-কাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন সুপণ্ডিত রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র। কবি কাশীখণ্ড, কালিকা পুরাণ, বৃহন্নারদীয়, শান্তিপর্ব, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে শিব-কথা সংগ্রহ-পূর্বক একটি সুসঙ্গত ও সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছেন। শিবায়ন রামকৃষ্ণের যৌবনকালের কাব্য কিন্তু কোনোখানে অসংযম বা কুরুচির চিহ্ন নাই। কবি যে বঙ্গদেশে প্রচলিত শিবের লৌকিক কাহিনী ত্যাগ করিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ কবির সুরুচি। তাঁহার শিবায়ন ২৬টি পালায় বিভক্ত, তন্মধ্যে একমাত্র মনসা-পালা ছাড়া সকলগুলিই পৌরাণিক এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। সমস্ত পৌরাণিক শিব-কথায় একত্র সমাবেশের জন্য শ্রীআশুতোষ ভট্টাচায রামকৃষ্ণের শিবায়নকে 'কোষ-কাব্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মঙ্গলকাব্য-জাতীয় শিবায়ন রচয়িতাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজ কবিচন্দ্র ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য। কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতকের শেষপাদে শিবায়ন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচায মনে করেন, ইনি 'ভাগবতামৃত' ও 'অঙ্গদ রায়বার' রচয়িতা শঙ্কর কবিচন্দ্র। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের মতে ইনি মনসামঙ্গল বা 'জগতী মঙ্গল' রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র। "কবি সাজাদা রায়বংশীয় বলিয়া নিজেকে প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নামটি একবারও বলেন নাই।"[১] শিবায়নে কিন্তু কবির শঙ্কর নাম দেখা যায়। যথা—

শ্রীকবি শঙ্কর গায় হরপদ আশে।
যারে কৃপা কৈল প্রভু আসি যোগি-বেশে॥

তাছাড়া শিবায়নের ভণিতায় 'দ্বিজ কবিচন্দ্র'ও আছে, যেমন—"হরপদ আশে

১ পৃঃ ৪৯০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং)

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।" কবিচন্দ্র তাঁহার শিবায়নে শিবের কৃষিকার্যকে অবলম্বন করিয়া 'মৎস্য ধরা' পালা ও 'শঙ্খ পরা' পালার অবতারণা করিয়াছেন। ইতর-নারী-লম্পট বৃদ্ধ শিবকে বাগদিনীবেশিনী দুর্গার ছলনা 'মৎস্য ধরা' পালার বৈশিষ্ট্য। 'শঙ্খ পরা' পালায় দাম্পত্য কলহ ও দাম্পত্য মিলন বর্ণিত হইয়াছে। শিবায়নে শিবের কৃষিকার্যের সহায়ক 'ভীম'।

শিবায়নের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ইনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে (১৭১০-১১ খৃষ্টাব্দে) শিবায়ন রচনা করিয়াছিলেন। রামেশ্বরের শিবায়ন 'অষ্টমঙ্গলা' বা আটপালার কাব্য। ইনি কবিচন্দ্রের শিবায়নকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশের লৌকিক কাহিনী নয়, পদ্মপুরাণ, ভাগবত পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ হইতেও আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়াছেন। শিবের চাষ, বাগ্দিনীর পালা, শঙ্খ পরিধান পালাও যে গৃহীত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রয়ে কবি শিবায়ন রচনা করিয়াছিলেন, কাব্যমধ্যে তাহার স্বীকৃতি আছে—

> যশোমন্ত সিংহে দয়া কর হর বধু।
> রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥

রামেশ্বরের শিবায়নে পরিবেশিত কৌতুকরস ও মধুর রস সম্বন্ধে কবির কথা 'অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু' সম্পূর্ণ সার্থক। তবে রামেশ্বর ভারতচন্দ্রের ন্যায় শব্দ-শিল্পী নহেন, তাঁহার শব্দলালিত্যও উল্লেখযোগ্য নহে, অনুপ্রাসও শ্রুতিমধুর নহে—

> ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাং।
> চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান॥
>
> পদ্মাবতী পার্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
> প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে।
>
> জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
> ভণে রামেশ্বর ভবে ভাবে রাত্রিন্দিবা॥
>
> প্রণমিয়া পার্বতী প্রভুর পদতলে।
> বঙ্কিনী যে বঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥

কবির মাত্রাজ্ঞানের অভাবে তাঁহার অনুপ্রাস কবিতার অলংকার না হইয়া শৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তবে অনুপ্রাসদুষ্ট হইলেও কবির কয়েকটি উক্তিতে প্রবাদবাক্যের গাঢ়বদ্ধতা ও চমৎকৃতি আছে—

বুভুক্ষিত বালক বচনে বোধ হয়।
দুগ্ধপোষ্য ক্ষুদ্ধ নাকি চুম্ব দিলে হয়॥

তোকে দুঃখ দিতে মামী মোকে দেয় যুড়ে।
মটরের মর্দনে নুসুর গেল উড়ে॥

বর দেখে দেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে।
পুরন্ধ্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে॥

রামেশ্বরের শিবায়নের অনুকরণে লিখিত আধুনিককালে হরিচরণ আচার্যের একটি 'শিবায়ন' কাব্য দেখা যায়। বৈষ্ণবধর্মপ্রভাবে কৃষ্ণরামের অনুকরণে 'শিব-শঙ্করীর রাস' নামক একটি ক্ষুদ্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। কবির নাম জানা যায় নাই।

চতুর্দশ অধ্যায়

নাথ-সাহিত্য

নাথ-উপাধিক যোগী বা যুগী জাতির গুরুদিগের গল্প লইয়াও প্রাচীন বঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টি দেখা যায়। ইহারই নাম নাথ-সাহিত্য। এ সম্বন্ধে দুই প্রকার রচনা আবিষ্কৃত হইয়াছে—গোর্খ-বিজয় বা মীন-চেতন গ্রন্থ এবং রাজা গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের গান ও পাঁচালী। প্রথমোক্ত রচনায় গুরু গোর্খনাথের ও দ্বিতীয় প্রকার রচনায় জালন্ধরি-পাদ বা 'হাড়ি-পা'র অলৌকিক কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। নাথ-সাহিত্য কেবল গুরু-স্তুতি নহে, ধর্ম-প্রচার-গ্রন্থও বটে। হিন্দু দেবতার তুলনায় নাথ-গুরুর শ্রেষ্ঠতা ও চতুরাশ্রম ধর্মের তুলনায় সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করাও নাথ-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। পৌরাণিক দেব-বিরোধিতায় ও কাহিনী-ধর্মে নাথ-সাহিত্য মঙ্গল-কাব্য জাতীয়; ইহাতে অবশ্য 'মঙ্গল' দেব-দেবী নাই, তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন—মীননাথ, গোর্খনাথ, হাড়িপা ও ময়নামতী। ইহারা মানব-মানবী, তথাপি শক্তিতে দেবদেবীর অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ধর্মমঙ্গলের ধর্ম-ঠাকুরের ন্যায় গোর্খনাথ শিব, দুর্গা ও যমকে পরাভূত করিয়াছেন, হাড়িপা চন্দ্র-সূর্য ও ব্রহ্মদেবের উপরে প্রভুত্ব করিয়াছেন এবং ময়নামতী উৎপীড়ন করিয়াছেন—যমের উপরে। মঙ্গল-কাব্যের ন্যায় নাথ-সাহিত্যও ঐহিকতা-নিষ্ঠ ও পারলৌকিক জীবন-চেতনা-বর্জিত। ('মঙ্গল' দেবতাদের ন্যায় নাথ গুরুগণও অতিমানবীয় অন্ধ শক্তির প্রতীক। তবে নাথ-সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যোচিত ঘটনা-বিন্যাস বা সাজ-সজ্জা নাই। নাথ-ধর্মের গুহ্যতা ও নাথ-কবিদিগের সংকীর্ণতা ও সমাজ-চেতনার অভাব বশতঃ মঙ্গল-কাব্যীয় বারমাস্যা, ভোজ্য-তালিকা, পতিনিন্দা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে কবি-চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই এবং সবদেব-বন্দনার মতো উদারতাও ফুটিয়া উঠে নাই। এই সকল কারণে নাথ-সাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্য বলা চলে না।) তথাপি কবির দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া ব্যাপকতর অর্থে গোর্খ-বিজয়কে গোর্খমঙ্গল ও গোপীচন্দ্রের গানকে হাড়িপা-মঙ্গল বলা চলে)

মঙ্গলকাব্যের ন্যায় নাথ-সাহিত্যেও প্রাগার্য আদিম জনতা-ধর্ম পরিস্ফুট। "নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধন-প্রণালী" গ্রন্থে শ্রী কল্যাণী মল্লিক বহু

গবেষণা করিয়া নাথধর্মে আর্য লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—নাথ-ধর্ম আসলে শৈব ধর্ম।[১] কিন্তু নাথ-সাহিত্যের সাক্ষ্য এই ধারণায় সম্পূর্ণ বিপরীত। শৈবধর্মে শিবই আদিদেব পরমেশ্বর, কিন্তু নাথ-সাহিত্যে শিব একজন নাথগুরু মাত্র; নিরঞ্জন ধর্মই আদিপুরুষ, শিব ধর্মের পুত্র এবং মীননাথ, গোর্খনাথ, হাড়িপা প্রভৃতির ভ্রাতা মাত্র।[২] নাথ-সাহিত্যে শিব জ্যেষ্ঠগুরু ও দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ গোর্খনাথ, হাড়িপা, ময়নামতী কেহই শিবকে গুরু বা দেবতার সম্মান দেন নাই। শিব-শিবানীর প্রতি ভক্তি নাথসাহিত্যের কোনোখানে নাই। বরং সন্ন্যাসধর্মী নাথ-গুরুগণ বিবাহিত ও সংসারধর্মী শিবকে নানা স্থানে অবমানিত করিতে ছাড়েন নাই। গোর্খ-বিজয়ে দুর্গার জন্য শিবকে গোর্খনাথ ব্যঙ্গ করিয়াছেন—

> ভাঙ্গ ধুতুরা খায় তুমি কি বলিব তোরে।
> কোথাতে হারাইয়া নারী ধর আসি মোরে॥

গোপীচন্দ্রের গানেও তুষের নৌকা পূজা করিতে অস্বীকার করায় শিবকে ময়নামতী 'ন্যাদিয়া' বা লাথ তুলিয়া তাডা করিয়াছে—

> কচুবাডি দিয়া বুড়া শিব যায পলাইয়া।
> কোলা ব্যাঙ্গের মতন ময়না নিগায় ন্যাদিয়া॥

ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ—"মহাদেব হইতে ময়না গেয়ানে ডাঙ্গর।" লাঞ্ছনা হইতে কেবল শিব নহে, শিবানীরও নিষ্কৃতি নাই। এ বিষয়ে নাথ-কবি ধর্মমঙ্গলের কবিদিগেরই অনুবর্তী। ধর্মঠাকুর কেবল যে পদে পদে দুর্গাকে

---

১ "নাথ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া ও বিভিন্ন মোহন্তদের সহিত আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাদের মূলতঃ শৈব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি।" ভূমিকা পৃঃ ১৭ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী

> বদনে জন্মিল শিব যোগি-রূপ ধরি.
> শিরেতে উত্তম জটা শ্রবণেতে কড়ি।
> নাভিতে জন্মিল মীন গুরু মুচন্দর
> সাক্ষাতে সিদ্ধার বেশ ধরে কলেবর।
> হাড় হতে হাড়িফা জন্মিয়া নিকলিল……
> জটা ভেদি নিকলিল যতি গোর্খনাথ।
>
> —গোর্খবিজয়

পরাভূত করিয়াছেন তাহা নহে, ধর্ম-কবি দুর্গার চারিত্রিক কলঙ্ক প্রচার করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।[১] দুর্গালাঞ্ছনায় ধর্মপুত্র গোর্খনাথ পিতার উপযুক্ত পুত্র। বুদ্ধিহীনা দেবী কুক্ষণে গোর্খকে পরীক্ষা করিতে মাছি হইয়া গোর্খের মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেই সুযোগে গোর্খ এমনভাবে শ্বাস রুদ্ধ করিয়াছিলেন যে—"প্রকাশ না পাইয়া দেবী ছটফট করে।" দেবী বাহিব হইবার জন্য অনেক কাকুতিমিনতি করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই গোর্খ তাঁহাকে মুখ দিয়া বাহির হইতে দেন নাই, শেষে দেবীকে বিষ্ঠাব ন্যায় মলদ্বার দিয়া বাহির করিয়াছেন—"মার্গপথে যতিনাথে তারে এড়ি দিল।" শিবশিবানীকে ভক্তি করার পরিবর্তে এইরূপ বর্বরভাবে লাঞ্ছিত কবাব মধ্যে নাথ-গুরুদিগের আর যাহাই হউক "শৈবত্ব" প্রমাণিত হয় না।

বাংলার জন-সাহিত্যে বিশেষ কবিয়া মঙ্গলকাব্যে নাথ সাহিত্যে ও ধামালী-গানে হিন্দু পৌবাণিক দেবদেবীব অমর্যাদা, লঘূকরণ ও লাঞ্ছনাব বিশেষ কারণ আছে। বাংলাব জন-সাধাবণেব রক্তেব মধ্যেই কাবণ নিহিত। বঙ্গের জন-সাধাবণ মূলে আর্যগোত্রীয় নহে, কযেকটি প্রাগার্য আদিম কোমেব (tribe) সমষ্টি মাত্র। আদিম কৌম সংস্কাবই ইহাদেব মজ্জাগত। কৌম সংস্কাবই হিন্দু পুরাণের দেবতার পরিবর্তে মনসা, দক্ষিণবায়, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্ম-ঠাকুর পঞ্চানন্দ প্রভৃতি গ্রাম-দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাছাড়া পৌরাণিক শিব ও কৃষ্ণকে লম্পট বানাইয়াছে এবং ভক্তপ্রবর নারদকে ঢেঁকিতে চাপাইয়া কোন্দলেশ্বব কবিয়া তুলিয়াছে। হিন্দু পৌবাণিক দেবতার লঘূকরণের জন্য অনার্য প্রভাব দায়ী হইলেও কিন্তু লাঞ্ছনাব জন্য দায়ী বৌদ্ধ প্রভাব। বৌদ্ধদের বেদ-বিবোধিতা, জাতিভেদ-হীনতা ও নিরীশ্বরতাই হিন্দু বৌদ্ধ বিবাদের মূল কারণ। রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ইতিহাস-বিখ্যাত। ভিনসেন্ট স্মিথ দেখাইয়াছেন—ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ রাজা হর্ষবর্ধনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিতেও

---

১ জানিল এখন তোর দুর্গা বড় সতী।
বাহাব সতীপনাএ পালায়্যা গেল খিতি॥
মন দিয়া শুনহ দুর্গার খেতার।
যাহার উঠিল কলঙ্ক আইবড় ভাতার॥
—লক্ষ্মণের অনিলপুরাণ

দ্বিধা করে নাই। [১] কাজেই বৌদ্ধেরাও যে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। এ-হেন বৌদ্ধদের কেন্দ্র হিসাবে বঙ্গদেশ বিখ্যাত। বঙ্গভূমিই অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, জেতারি, শান্ত রক্ষিত প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যদিগের জননী। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে ৭০টি বৌদ্ধবিহার দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে এক পুণ্ড্রবর্ধন বিহারেই তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। বৌদ্ধ পালরাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশের জনসাধারণেব অধিকাংশই যে রাজধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। হিন্দু সেনরাজাদের সময়ে আবার বৌদ্ধ-বঙ্গ হিন্দুত্ব গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুত্ব তাহার পক্ষে সম্ভবপব ছিল না। বৌদ্ধ হইবার সময়েও বঙ্গদেশ আর্য বৌদ্ধ হয় নাই, অনার্য-বৌদ্ধই হইয়াছিল। সেইভাবে হিন্দু হইবার সময়েও প্রাচীন মজ্জাগত অনার্য সংস্কার ও বৌদ্ধ সংস্কাব বর্জন করিয়া হিন্দু হইতে পারে নাই। সেইজন্য তথাকথিত হিন্দু বাঙালী জনকবিও মঙ্গলকাব্যে ও নাথ-সাহিত্যে দেব-বিদ্বেষ রূপ বৌদ্ধ সংস্কার প্রকাশ না কবিয়া পারেন নাই। বৌদ্ধ-সংস্কারেব জন্যই ধামালী-গানেও দেবে-অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। তবে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষ কোন সম্প্রদাযেব কুক্ষিগত না থাকায এবং বারংবার ব্রাহ্মণকবিদের দ্বারা রচিত হওয়ায় এই অশ্রদ্ধা উৎকট হইয়া উঠে নাই, কিন্তু ধর্মমঙ্গল ও নাথ-সাহিত্য যথাক্রমে ডোম ও যুগী জাতির করায়ত্ত থাকায় উহাদের আদিম ভাবের কোন পরিমার্জনা হয় নাই,—বৌদ্ধ দেব-বিদ্বেষ উৎকট ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভদ্র-সমাজে প্রচলিত না থাকায় ধামালীকাব্যেবও হইয়াছে এই দশা।

নাথ-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্ন্যাস-প্রিয়তা ও নারী-বিদ্বেষ। সংসারধর্মের পরাজয় ও সন্ন্যাস-ধর্মের বিজয়ই হইতেছে 'গোর্খ-বিজয়'। ইহাতে দেখা যায়—গোর্খ-গুরু মীননাথ কমলা ও মঙ্গলাকে রানী করিয়া 'কদলী' রাজ্যে রাজা হওয়ায় পতিত হইয়াছেন এবং নর্তকীর বেশে গোর্খনাথ গুরুকে পুনর্বার বৈরাগী করিয়া দিয়া সন্ন্যাস-ধর্মকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। গোপীচন্দ্রের গানেও সংসারভোগী রাজা গোপীচন্দ্রকে রাজমাতা ময়নামতী নানা কৌশলে পত্নীত্যাগে ও

১ P. 86; Early History of India (4th Ed)

সন্ন্যাসগ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। সন্ন্যাস-প্রচারের একটা কৈফিয়ত আছে। নাথ-পন্থীদের মৃত্যুভয় অত্যধিক (এবং সেইজন্য যম-বিদ্বেষ তুলনা-রহিত)। তাহাদের বিশ্বাস—যোগার্জিত 'মহাজ্ঞানে'র দ্বারা দেহকে চিরস্থায়ী করা যায়। দৈহিক অমরতাই নাথপন্থীর মোক্ষ। নারী-সহবাসে সাধারণ ব্যক্তির আয়ুক্ষয় হয়, অতএব স্ত্রী-সংসর্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয়, এবং সেইজন্যই সন্ন্যাস বাঞ্ছনীয়। গোপীচাঁদের গানে ময়নামতী পুত্রকে বলিয়াছেন—

সরু সরু কথা বধূ কানের কাছে কয়।
হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরাণ কাড়ি লয়॥

গোর্খনাথও গুরু মীননাথকে বলিয়াছেন—

কামিনীর কোল এড়ি তুমি না যাইবা,
আপনার দোষে তুমি সব হারাইবা।…
বৈরীর হাতেতে তুমি সঁপিলা ভাণ্ডার,
শঠের হাতেতে তুমি সঁপিলা কাণ্ডার।
মৎস্যের প্রহরী তুমি রাখিয়াছ উদ।
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ।

স্ত্রী-জাতিকে এইভাবে মৃত্যুর একমাত্র কারণ মনে করা এবং সর্বত্র 'বাঘিনী' বলিয়া অভিহিত করা নাথ-সাহিত্যের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এই নারী-বিদ্বেষ কখনই আদিম কৌম সংস্কারের ফল হইতে পারে না—আদিম জীবনে নারী-সঙ্গপ্রিয়তাই অত্যধিক। ইহার অন্য গূঢ় কারণ আছে। লক্ষ্য করিতে হইবে—গোপীচন্দ্রের নিকট স্ত্রী-বিদ্বেষ-প্রচারিণী ময়নামতী নিজেই নারী। ইনি শুধু স্বামি-সংসর্গ করিয়া পুত্রবতী হইয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার সহিত গুরু-ভ্রাতা হাড়িপার অবৈধ যৌনসম্পর্ক ঘটিয়াছে বলিয়া নাথ-কবিদের বিশ্বাস; অথচ হাড়িপা ও ময়নামতীকে নাথ-কবিগণ কিছুমাত্র অসম্মান করেন নাই। যৌনসম্ভোগের ফলে হাড়িপা ও ময়নামতীর 'মহাজ্ঞান' নষ্ট হইয়াছে, নাথ-কবিরা এইরূপ সংশয়ও পোষণ করেন নাই, ইহার কারণ কি? সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে—আসলে গার্হস্থ্য ধর্মই নাথ-পন্থীদের আক্রমণের বস্তু, নারী তাহার অবলম্বন বলিয়াই নিন্দনীয়। হাড়িপা ময়নামতীর সহিত ব্যভিচার করিলেও ভবঘুরে জীবন অব্যাহত রাখিয়াছেন বলিয়াই 'মহাজ্ঞান'ও

অটুট রাখিতে পারিয়াছেন এবং গোপীচন্দ্রের গুরুগিরি করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু যেহেতু মীননাথ ভিক্ষু-জীবন ত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রমীর আদর্শে সংসার করিয়া নারী-সংসর্গ করিয়াছেন, সেইহেতু পতিত হইয়াছেন এবং মহাজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। নাথ-ধর্মে বৌদ্ধ ভিক্ষু-জীবনের প্রভাব ও হিন্দু বর্ণাশ্রম বিদ্বেষই নাথ-কবিদিগের নারী-নিন্দার প্রকৃত কারণ।

সাহিত্য-বিচারে গোর্খ-বিজয় হইতেছে অন্ধ তমসাবৃত প্রেত-রাজ্য। অতিমানবীয় জড়শক্তিই ইহার অধিপতি। এখানে স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভক্তি নাই, হৃদয় স্পন্দনের কোন চিহ্ন নাই, এই জগতে বহিঃপ্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করিয়া দৈহিক অমরতার লোভে নাথধর্ম এখানে স্থানু হইয়া বসিয়া আছে এবং হঠযোগের হঠকারিতা গোর্খনাথের ছদ্মবেশে 'কায়া সাধ' 'কায়া সাধ' বুলির মাদল বাজাইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছে। এই জগতের জীবন দানবীয়, ভাষা হেঁয়ালী, উচ্চার্য ডাকিনী-মন্ত্র। একটা অস্পষ্টতা ও রহস্যের ধূমল ছায়া ইহাকে হিমশীতল মৃত্যুপুরীতে পরিণত করিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয়—গোর্খবিজয়ের গোর্খ-চরিত্র সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র, তাহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্-নিদেশক স্তম্ভ।"[১] কিন্তু সত্য বলিতে কি, একমাত্র নাথ-সংস্কারের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মহৎগুণ গোর্খ-চরিত্রে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বরং আকাশস্পর্শী দম্ভ, অহংকার, ক্রূরতা, হৃদয়হীনতা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা গোর্খ-চরিত্রে সুস্পষ্ট। গীতোক্ত জ্ঞানের লক্ষণ অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা প্রভৃতির একটিও গোর্খ-চরিত্রে দেখা যায় না। বকুলগাছের নীচে গোর্খ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কান-পা যোগী যোগ-প্রভাবে শূন্যপথে যাইতেছেন, ইহাতে গোর্খের অভিমান ও দম্ভ ফণা তুলিয়া গর্জন করিয়াছে—"মোরে না মানিয়া যায় কিসের অন্তর?" এবং সঙ্গে সঙ্গে গোর্খ কান-পার প্রতি জুতা নিক্ষেপ করিয়াছেন—"বান্ধিয়া আনিতে তারে পানাই পাঠাইল।" তারপর গোর্খগুরু মীননাথের মাত্র তিনদিন আয়ু আছে, ইহার জন্য যম দায়ী

১ পৃঃ ৬০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

নহেন, যম সম্পূর্ণ নিরপরাধ। এই অবস্থায় যমের কাছে গিয়া গোর্খের আস্ফালন—"ভাল মতে ভাবি চাও আঙ্গি কুন জনা" এবং—

আমার যতেক বল জানিবা এখন।
যমপুরী সমে তোরে করিমু গ্রহণ॥

বলা বাহুল্য, এইগুলি সন্ন্যাসিধর্ম বা অমানিত্ব-অদম্ভিত্ব নহে। তারপর যে নারীজাতিকে গোর্খনাথ অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, সেই নারীবেশ ধারণ করিয়া নর্তকীরূপে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ নিশ্চয়ই গোর্খনাথের সত্যনিষ্ঠা ও সরলতার পরিচয় নহে—কূটনীতি ও ছলনারই দৃষ্টান্ত। শিষ্য গোর্খ কর্তৃক অধঃপতিত গুরু মীননাথের "চৈতন্য সম্পাদন (?)" ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন—"বস্তুতঃ সমগ্র পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন মহনীয় কাহিনী আর নাই। এবং বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করি।"[১] কিন্তু যে-ভাবে এই "চৈতন্য-সম্পাদন" হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়—বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ বীভৎস কাহিনী অদ্বিতীয়। মীননাথের ক্ষেত্রে তথা গোপীচন্দ্রের ক্ষেত্রে—কোনো ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক চৈতন্য সম্পাদন হয় নাই, হইয়াছে জবরদস্তিমূলক সন্ন্যাসিকরণ। গোর্খনাথ নর্তকীবেশে মাদলে "কায়া সাধ" বাজাইয়া অনেকক্ষণ নাচানাচি করিয়াও মীননাথের সংসারাসক্তি দূর করিতে পারেন নাই। "যোগ পরিচয় কর চাহ চক্ষে চক্ষে" বলিয়া হাতে তুড়ি মারিয়া যোগ-প্রক্রিয়ার অনেক কসরৎ করিয়াছেন। তাহাতেও যোগবল ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত গোর্খনাথ অবলম্বন করিয়াছেন অমোঘ কৌটিল্য-নীতি—"বলং বলং বাহুবলম্"। মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে রাক্ষসের মতো ধরিয়া—

নখের আচড় দিয়া বুকখানি চিরে।
পেট ফাড়ি বিন্দুনাথের ঝুলি খসাইল॥
ধোপার কাপড় যেন আছাড়ি থুইল॥

এই কাণ্ডের পর "চৈতন্যোদয়" না হইয়া পারে না। বৃদ্ধ মীননাথ সন্ন্যাসী হইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। শেষে অবশ্য গোর্খনাথ যোগবলে মৃতশিশুর জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে গোর্খের রাক্ষস-মূর্তির বীভৎসতা ঢাকা

১ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিত ভূমিকা, গোর্খবিজয় (বিশ্বভারতী)

পড়িয়া যায় নাই। ইহার পরেও গোর্খনাথ আবার যোগশক্তির কেরামতি দেখাইয়া দিয়াছেন—গুরুপত্নীদিগকে বাদুড়ে পরিণত করিয়া। চিত্ত-সংযমে অসমর্থ হইয়া মীননাথ করিয়াছিলেন পাপ, তাহাতে তাঁহার কিছুই দণ্ড হইল না এবং নিরপরাধা হইয়াও কমলা মঙ্গলা পাইল শাস্তি—এই হেঁয়ালিই গোর্খ-বিজয়ের ফলশ্রুতি এবং এইখানেও গোর্খনাথের চরিত্র-মাহাত্ম্য।

নাথ-সাহিত্যে হাড়িপা-চরিত্র গোর্খ-চরিত্রের চেয়েও বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর। গোর্খের তবু ব্রহ্মচর্য-নিষ্ঠা আছে, হাড়িপা-র তাহাও নাই। তিনি 'মহাজ্ঞানী' হইয়াও কামুক ও চরিত্রহীন। গোর্খ-বিজয়ে হাড়িপার কামনা—

কদাচিৎ এমন সুন্দরী যদি পাই॥
হাড়ি-কর্ম করি যদি থাকি তার পাশ।
পৃথিবী পুরিয়া মনের পুরাইতাম আশ॥

জীবনধর্মে হাড়িপা—চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গের সগোত্রীয়; পীড়ন করিয়াই তিনি আনন্দ পান, উৎপীড়নই তাঁহাব স্বভাবধর্ম। গোপীচন্দ্রের গানে দেখা যায়, তিনি যম, বিশ্বকর্মা, ইন্দ্র, হনুমান—সকলের উপরেই নির্বিচারে উৎপীড়ন করিয়াছেন এবং বিনা মাহিনার চাকরগিরি করাইয়াছেন। রাজ-শিষ্য গোপীচন্দ্রের উপর উৎপীড়নে তিনি যমদূতকেও হার মানাইয়াছেন। নির্যাতনের বৈচিত্র্য-উদ্ভাবনে তাঁহার প্রতিভা অদ্বিতীয়। দুর্বহ ভার বহাইয়া, জঙ্গলের মধ্যে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া, তেবোটি সূর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াও হাড়িপার আশা মিটে নাই, "একনা দুঃখ দিম বেটাক কলিঙ্গা বন্দর"—এই সংকল্প করিয়া গোপীচন্দ্রকে উপযুক্ত পরিমাণে নির্যাতিত করিতে তিনি তাহাকে হীরানটীর দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন। একেবারে মারিয়া ফেলেন নাই, ইহা গুরুজীর করুণা বা কৃপা নহে, ইহার কারণ ময়না-ভীতি—

আইজ যদি রাজপুত্র জঙ্গলে যায় মরিয়া।
কাইল ময়না মারিবে আমায় লোহার ছুরি দিয়া॥

যদি না বার বৎসর পরে ময়নামতী হাড়িপাকে 'বজ্র চাপড' না মারিতেন তাহা হইলে রাজাকে উদ্ধার করিবার চিন্তাও তাহার মনে স্থান পাইত না। হাড়িপার মূর্তি-পরিচ্ছদ, অশন ব্যসন প্রতিটি দেখিবার মতো—

বায়ান্নমনী কাঁথা নিল কোমরে বান্ধিয়া।
আশীমনী সোড়া নিল কপালে ভাবিয়া॥
নয়মনিয়া খড়ম নিল চরণে লাগায়া।
মন পঞ্চাশেক ভাঙ্গের গুড়া মুখের মধ্যে দিয়া।
কলসীদশেক জল দিয়া ফেলাইল গিলিযা॥

....

একনা পাও বাড়াইয়া ফেলায় আশে আর পাশে।
আর এক পাও বাড়াইয়া ফেলায় বিরাশী কোশে॥

নাথ-কবি এ-হেন গুরুজীর রসিকতার পরিচয় দিবারও লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া হনুমান গোপনে হাড়িপাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়াছে, জানিতে পারিযা তিনি তাহাকে 'বর দান' করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

যারে বেটা হনুমান তোকে দিলাম বর।
মুখপোড়া হৈয়া থাক শয়ালের ভিতর॥

হাড়িপার গুরুগিরি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গোপীচন্দ্রেব গান আসলে হইতেছে রূপকথা। শিশু চিত্ত লইয়াই ইহাব কাহিনী অনুধাবন করিতে হইবে। দেবতা ভূত পশু কীট উদ্ভিদ সকলেই এখানে মানুষের সহচর ও সমধর্মী, কোন অলৌকিকতাই এখানে অবিশ্বাস্য নহে। গোপীচন্দ্রের গানে মানিকচন্দ্র রাজাব প্রাণ লইয়া পলায়নকালে ময়নামতীর ভয়ে 'গোদা' যমের বারংবার বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তিধারণ এবং অনুসারিণী ময়নার ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিশালী প্রাণীতে নিজেকে পরিবর্তন রূপকথার কৌতূহলই চরিতার্থ করে। দীনেশচন্দ্র সেন এই কাহিনীতে কেলটিক উপকথার টুরিয়েনের গল্প এবং গ্যালিক রূপকথার গুইনবাচ ও করিডয়েনের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। ময়নামতী কর্তৃক মহাজ্ঞানের পরীক্ষা প্রদান-কালে নানা অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন, গোপীচাঁদের সোনার ভ্রমর হইয়া উড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি রূপকথা জগতেরই অলৌকিকতা। কেবল অলৌকিকতা নহে, রূপকথার আঙ্গিক ও বর্ণনাও গোপীচন্দ্রের গানে দেখা যায়। শুক সারি কর্তৃক গোপীচন্দ্রকে অন্বেষণ—রূপ-জগতেরই কল্পনা। একঠেঙ্গিয়ার দেশ, কান-পড়ার

দেশ, মশা-রাজার দেশ প্রভৃতি বিচিত্র দেশের কাহিনী এই রূপ-জগৎ হইতেই গোপীচন্দ্রের গানে সংগৃহীত হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের রূপ বর্ণনা—"হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম রাজার কপালে রতন জ্বলে", ময়নামতীর "এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন"; অদুনা রানীর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 'হাটে ট্যাংরা', 'চ্যাং ব্যাং' 'ভ্রমর-গুঞ্জরি' প্রভৃতি খোঁপা বাঁধা, কিংবা 'কাকরঙ্গি', 'গৌর-রঙ্গি' 'লক্ষীবিলাসী' শাড়ী পরা, গোপীচন্দ্রের জীবনের সহিত 'সত্যের পাশা' 'রত্নবাতি' 'বিনা-আগুনের অন্ন' 'জোড় দামা' (দামামা) প্রভৃতির অদৃশ্য যোগাযোগ, যাহার ফলে—যখন গোপীচন্দ্র বিদেশে বিপদে পড়িয়াছে তখন "সত্যের পাশার চিহ্ন চালত আউলাইয়া পড়িল", আবার যখন বার বৎসর পরে ছদ্মবেশে গোপীচন্দ্র বাড়ী ফিরিয়াছে তখন হঠাৎ আপনা হইতেই "দুয়ারের জোড় নাগরা বাজিয়া উঠিল" এবং "বিনা-রন্ধনায় সত্যের অন্ন উথলিয়া পৈল"—এ সমস্তই রূপকথার আঙ্গিক।

গোপীচন্দ্রের গান গোর্খবিজয়ের মতো নাথ শাস্ত্র নহে, নাথ-সাহিত্যই বটে। ইহাতে ধর্মের কথা থাকিলেও ধর্মানুবর্তিতা কবির আন্তরিক নহে। বাহ্যতঃ সন্ন্যাসের জয়গান থাকিলেও এখানে গৃহ-জীবনের উপরেই কবির আন্তরিক মমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাথ-ক বিরএখানে ধর্ম-বিবোধী মনোবৃত্তির গূঢ় কারণ আছে। কবি পাঠককে ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন—গোপীচন্দ্রকে ধর্মকথা বলিয়া সন্ন্যাসী করা রানী ময়নামতীর একটা অছিলা মাত্র, প্রকৃত সন্ন্যাসপ্রীতি থাকিলে তিনি নিজে পুত্রের বিবাহই দিতেন না। তাছাড়া হাড়িপার অপেক্ষা ময়নামতীর জ্ঞান কম নহে—"মহাদেব হইতে ময়না গেয়ানে ডাঙ্গর।" তিনি স্বামী মানিকচন্দ্রকেও দীক্ষিত করিয়া শিষ্য করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রকে নিজেই মহাজ্ঞান দিলেন না কেন? ইহার মূলে হাড়িপা-ময়নামতীর একটা গোপন ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া কবির বিশ্বাস। এখানে সন্ন্যাস গৌতম বুদ্ধের সন্ন্যাসের মতো স্বাভাবিক প্রেরণা-জাত সত্যবস্তু নহে বলিয়াই কবি মনে করিয়াছেন। সেইজন্য কবি সন্ন্যাস-পন্থী হইয়াও সন্ন্যাস-মহিমা প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তৎপরিবর্তে তরুণ গোপীচন্দ্র ও কিশোরী অদুনা পদুনার বেদনাকে বড় করিয়া পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অদুনা-পদুনার বুকফাটা আর্তনাদ, গোপীচন্দ্রের গম্ভীর অন্তর্গূঢ় মর্মদাহ ও মাতার প্রতি রুদ্ধ-অভিমানে

ভিখারীবেশে প্রথমে মায়ের নিকটেই ভিক্ষা গ্রহণ, গুরুর উৎপীড়নে নিজেকে বাঁধা রাখিয়া রাজার দাসত্ববরণের প্রস্তাব, হীরা নটীর অকথ্য উৎপীড়নে মাতৃ-সমীপে নিজের রক্ত-লিখিত পত্র প্রেরণ প্রভৃতি কাহিনীকে কবি এমন দরদ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে পাঠকের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠে। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি দ্রষ্টব্য—

সন্ন্যাস-কালে অদুনা-পদুনার ক্রন্দন—

কাকে দিবেন রাজ্যভার কাকে দিবেন কড়ি।
কাকে সপিয়া যায়েন তোমার দালান কোঠাবাড়ি॥

....

নিন্দেব স্বপন রাজা হইব চৈতন।
পালঙ্কে ফেলায়্যা হস্ত নাই প্রাণধন॥

পত্নীর প্রতি রাজার সান্ত্বনা—

দুধের হাবিলাস (অভিলাষ) জলেতে রাখিও।
আমাব নাম বলি ভাই খেতুকে ডাকিও॥

সন্ন্যাসী হইয়া বাজার প্রথম মাতৃ-সম্ভাষণ—

ভিক্ষা দেও ভিক্ষা দেও জননী লক্ষ্মী বাই।
তোমার হস্তের ভিক্ষা পাইলে বৈদেশে যাই॥

সন্ন্যাসের সময়ে রাজ্যে দুর্নিমিত্ত—

দক্ষিণদুয়ারি বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল।
হাটি হাটি প্রদীপ রাজার নিবিতে লাগিল॥

সন্ন্যাস গ্রহণে রাজ্যের শোক—

পিঞ্জিরার মধ্যে কান্দে টিটির ময়ূব।
শিকার করিতে কান্দে নয় বুড়ি কুকুর॥...
পানিতে কান্দে পানকৌড়ি স্থটাতে কান্দে রুত।
গাভীর বাছুর ছাড়িয়া কান্দে না খায় মায়ের দুধ॥

নির্বাতিত রাজার মাতৃ-সমীপে পত্র—

কোদাল-চাঁছি ময়লা পইছে মা শরীরের উপর।
ঝেচু পঙ্খি বাসা কইছে মা মস্তকের উপর॥

হীরা নটী গা ধোয় মা মোক বক্ষেতে চড়িয়া।
পাঞ্জরের কাঠি মা মোক ফেলাইছে ভাঙ্গিয়া॥

কাহিনীর উপসংহারে বার বৎসরের পরে যখন রাজা ছদ্মভিক্ষুক বেশে রাজপুরীতে ফিরিয়াছেন তখন পাগলা হাতীর সঙ্গে সঙ্গে কবিও নিজের অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই—

আঠার দেউড়ি আইসে হস্তী মার মার করিয়া।
কিসের মারবে—কান্দে রাজার গলাটা ধরিয়া॥···
শুঁড় উঠাইয়া হস্তী রাজাকে প্রণাম করিল।
শুঁড় দিয়া মহারাজকে পৃষ্ঠে তুলি নিল॥

গোপীচন্দ্রের গানে মণিমানিক্যের ন্যায় অনেক সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত উক্তি ছড়ানো আছে। অমার্জিত গ্রাম্য ও স্থূল হইলেও এগুলির মধ্যে সত্যকার কবি-কৃতি সুস্পষ্ট—

দুগ্ধমিঠা, চিনি মিঠা, আরো মিঠা ননী।
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী॥

আকাশ নড়ে, জমিন নড়ে, নড়ে পবন পানি।
সপ্তহাজার আনল নড়ে—নিনড় কপালখানি॥

ছোট লোকের ছেলিয়া যদি বড় বিষয় পায়।
টেড়িয়া করি পাগড়ী বান্ধি ছায়ার দিকে চায়॥

মাওর কান্দন ওলাঝোলা বোনের কান্দন সার।
কোলার স্ত্রী তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যবহার॥

রাত্রি করে ঝিকিমিকি কোকিলায় কাড়ে রাও।
শ্বেত কাগায় বলে—রাত্রি প্রভাও প্রভাও॥

মাছে চিনে গহীন জমিন পক্ষী চিনে ডাল।
মায় চিনে পুত্তের দয়া যার বক্ষে শাল॥

নেপথ্য-বার্তা

গোপীচন্দ্রের ও নাথ-গুরুগণের ঐতিহাসিকতা ও নাথ-কবি

উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে মীনচেতন বা গোর্খবিজয়ের পুথি আবিষ্কৃত হয় এবং রঙ্গপুর হইতে সংগৃহীত হয় গোপীচাঁদের গান; সংগ্রহকর্তা বিখ্যাত গ্রীয়ারসন সাহেব। এই আবিষ্কারের ফলে পণ্ডিত-মহলে গবেষণা আরম্ভ হইয়া যায়। প্রথমতঃ গোপীচন্দ্রের ও দ্বিতীয়তঃ হাড়িপা (জালন্ধরি পাদ), মীননাথ ও গোর্খনাথের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা গবেষণা করেন। উড়িষ্যার তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের (১০৬৩-১১১২ খ্রীঃ) শিলালিপিতে একজন পরাজিত বাঙ্গালী রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ আছে। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন—নাথ-গীতিকার গোপীচন্দ্র এবং ইতিহাসের গোবিন্দচন্দ্র একই ব্যক্তি, কাজেই গোপীচন্দ্র নিশ্চয়ই একাদশ বা দ্বাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌র ধারণা হয়, গীতিকার গোপীচন্দ্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং সপ্তম শতকে বর্তমান ছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণের ধারণা—গোপীচন্দ্র মোটেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, কাল্পনিক ব্যক্তি, উহার সম্বন্ধে গবেষণা করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

গোর্খ-বিজয়ে উল্লেখিত কানুপা যোগী (কাহ্নপাদ) চর্যা-গীতিকার একজন পদকর্তা; তাছাড়া জালন্ধরি পাদ ও মীননাথের নাম যথাক্রমে চর্যাপদে ও চর্যা-টীকায় দেখা যায়। এইজন্য ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃত 'গোরক্ষ-সংহিতা'র লেখক হিসাবে এবং সর্বভারতীয় গোরখ্‌পন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে একজন গোর্খনাথের নামও প্রচলিত আছে। ডাঃ ভাণ্ডারকরের ধারণা, গোর্খনাথ দ্বাদশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু গোর্খনাথ যে বাস্তবিক গোরক্ষ-সংহিতাকার ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী মীননাথের শিষ্য বা মীননাথের সমকালে বর্তমান ছিলেন তাহা কেহই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

মীন-চেতন বিষয়ক ছড়া রাজপুতানা প্রভৃতি পশ্চিম ভারতেও প্রচলিত আছে। গোপীচাঁদ সম্বন্ধীয় কাহিনী ষোড়শ শতকের হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জৈসীর পদুমাবৎ কাব্যে উল্লেখিত দেখা যায়। তাছাড়া গোপীচন্দ্র-কাহিনী

গুজরাটী মারাঠী উড়িয়া ও পাঞ্জাবী উপাখ্যানেও প্রচলিত আছে। সপ্তদশ শতকে নেপালে বাঙ্গালা ও নেওয়ারী ভাষায় লিখিত একটি 'গোপীচন্দ্র নাটক'ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়—গোপীচন্দ্র-কাহিনী ও মীন-চেতন কাহিনী নাথপন্থী যোগীদিগের দ্বারা বঙ্গদেশ হইতেই ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই দুই কাহিনীর ভারতব্যাপী প্রসার ইহাদের প্রাচীনতা প্রমাণ করে।

বঙ্গসাহিত্যে মীন-চেতন কাহিনী সর্বপ্রথম দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত ধর্মঠাকুর-ভক্ত সহদেব চক্রবর্তীর ও দ্বিজ লক্ষ্মণের 'অনিল পুরাণে'। অনিল পুরাণ ডোম ও যুগী উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য স্থাপনের চিহ্ন। সম্ভবতঃ হিন্দুভাব-বিরোধিতাই উভয়ের সংযোগসূত্র, নচেৎ ডোম ও যুগী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপরীত ধর্মাদর্শই বিদ্যমান। ডোম-ধর্মেব প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্তানকামনা ও বংশরক্ষা কিন্তু যুগীধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিঃসন্তান সন্ন্যাসি-জীবন।

গোর্খ-বিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানের পুথিগুলি অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে রচিত বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণের ধারণা। মৌলবী আবদুল করিম যে পুথি-গুলি হইতে 'গোর্খ-বিজয়' প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। গোর্খ-বিজয় বা মীনচেতন গ্রন্থের ভণিতায় ভীমসেন রায়, ভীম দাস, শ্যামাদাস সেন, কবীন্দ্র দাস, ও ফৈজুল্লা নাম দেখা যায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন—"ভীমসেন রায় ও ভীম দাস একই ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রদাস ভীমসেন অথবা শ্যামাদাসের নামান্তর হওয়া বিচিত্র নয়।...শ্যামাদাস-সেন ও ফৈজুল্লার রচনার মধ্যে ঐক্য এতটা গভীর যে দুই-জনকে স্বতন্ত্র কবি ভাবা দুরূহ। হয় দুইজনই পূর্ববর্তী ছড়ার গায়ন ছিলেন, নতুবা একজন ছিলেন ছড়ার লেখক, আর একজন গায়ক।"[১]

গোপীচন্দ্র বিষয়ক প্রাচীনতম বাংলা পুথি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। কবি দুর্লভ মল্লিক। অন্যান্য পুথির কবি ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ। যে ছড়াটি গ্রীয়ারসন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভবানী দাসের রচনারই সংক্ষিপ্ত রূপ। দুর্লভ মল্লিকের

১ পৃঃ ৭৫২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (২য় সং)

গীতিকায় একটি নূতন চরিত্র পাওয়া যায়—জালন্ধরি-পার পুত্র শিশুপা। সাধারণতঃ নাথ-কবিদিগের রুচি জঘন্য, কিন্তু দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে ভদ্ররুচি যথাসম্ভব রক্ষা করা হইয়াছে। ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে কিংবা ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' রচনা করিয়াছেন। ভবানী দাসের গীতে হাড়িপাকে মাটিতে পুতিয়া ফেলিবার কথা নাই। ইনি অদুনাপদুনা ছাড়া আরও দুই রাণীর নাম করিয়াছেন—রতন মালা ও কাঞ্চনমালা। সুকুর মামুদের গ্রন্থে অদুনাপদুনা ছাড়া অতিরিক্ত দুই জন রানী হইতেছেন চন্দনা ও ফন্দনা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কাশীদাসী মহাভারত

মহাভারত গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের বিরাট সাহিত্য-কীর্তি। ইহার শ্লোক-সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং বিশ্বকোষের ন্যায় ইহা সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির কুবের-ভাণ্ডার। তত্ত্ব-জ্ঞানের বহু আলোচনা এবং রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির বিচিত্র কাহিনী ইহার গুরুত্ব বর্ধন করিয়াছে। তথাপি ইহা শাস্ত্র-গ্রন্থ নহে, ইহা কাব্য। তত্ত্ব ও কাহিনীর সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যেও ইহা সুবিন্যস্ত সুসমঞ্জস ও ঐককেন্দ্রিক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ধারা-উপধারায় প্রবাহিত বিপুল ঘটনাস্রোতের ভয়ঙ্কর আবর্ত ইহাকে বিশাল সমুদ্র-শোভা দান করিয়াছে এবং পাঠককে দিয়াছে মহাজীবনের রসাস্বাদন। কাব্য পাঠকের কাছে মহাভারতের অন্তর্গত বহুতত্ত্ব ও কাহিনী কেন্দ্রীয় ঘটনার দিক হইতে আপাতত অবান্তর* মনে হইলেও অবাঞ্ছনীয় নহে। ইহারা কাব্য-সভার গৌরব-বর্ধন-কারী সভাসদ; ইহাদের সমাবেশের বিপুলতার জন্যই কেন্দ্রীয় ঘটনা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজচক্রবর্তীব শোভা ধারণ করিয়াছে। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও মানবজীবনের মহাকাব্যই বটে।

এইরূপ মহাকাব্যকে নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া আস্বাদন করিবার ইচ্ছা করা সকল সভ্য দেশের পক্ষেই স্বাভাবিক। আধুনিক ভারতীয় ভাষার পক্ষে ইহাকে ভাষান্তরিত করিয়া নিজস্ব করিতে না পারিলে অর্বাচীন প্রদেশে-ভাষা কিছুতেই আভিজাত্য ও কুলমর্যাদা লাভ করিতে পারে না। সৌভাগ্যেব বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে বাঙ্গালী জাতি পশ্চাৎপদ হয় নাই। বিপুল ধৈর্য, বিরাট অধ্যবসায় এবং তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক-বুদ্ধির সাহায্যে সুদীর্ঘ কালের সাধনায় বাঙ্গালী ইহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য মাইকেল মধুসূদন কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদকে ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের

---

* দীনেশচন্দ্র সেন মহাভারতের উপাখ্যান-বহুলতা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, উপগল্পগুলি "ছোট ছোট অবান্তর চিত্রের ন্যায় মহাভারতের মলাট শোভিত করিতেছেন মাত্র।......দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তাহারা একরূপ অফুরন্ত।......গল্পের অকূল সমুদ্র পড়িয়া পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা।"

—পৃঃ ৪৩৭ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৭ম সং

সহিত তুলনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর নিত্যানন্দ ঘোষ, কাশীরাম দাস ও নন্দরাম দাস প্রভৃতি কবিগণের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর জয়-গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ভাষা-সংস্কারকগণের সমবেত চেষ্টায় বাংলা মহাভারতের রূপায়ণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, মূল মহাভারত যেমন যুগে যুগে বহু কবির দ্বারা রচিত ও রূপান্তরিত হইলেও[১] ব্যাসের নামেই পরিচিত, ঠিক তেমনি বিভিন্ন বঙ্গীয় কবির রচনা গ্রাস করিয়াও প্রধান বাংলা মহাভাবত কবি কাশীদাসের ভণিতাতেই প্রচলিত হইয়াছে।

মহাভাবত মূলে বা অনুবাদে চিরকালই সভা-সাহিত্য। মূল রামায়ণ ভ্রাম্যমাণ কুশীলবের দ্বারা গীত হইত, কিন্তু মহাভারত কখনই গেয় নহে, ইহা সভা-পাঠকেব দ্বাবা পাঠ্য। মূল মহাভাবতেই দেখা যায়, রাজা জনমেজয়ের রাজসভায় ইহা বৈশম্পায়ন কর্তৃক প্রথম পঠিত হইয়াছিল। এই ঐতিহ্য যুগে যুগে চলিযা আসিয়াছে। বানভট্টের কাদম্বরী কাব্যে দেখা যায়—উজ্জয়িনীর মন্দিরে মহাভারত পাঠ হইতেছে এবং বানী বিলাসবতী তাহা শ্রবণ করিতেছেন। ইতিহাসবিখ্যাত মদনপাল দেবের অনুশাসন হইতে জানা যায়—বানী চিত্রমতিকা দেবীব সভায় মহাভারত পাঠ হইত। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা মহাভারতের আবির্ভাবকালেও সেই একই প্রথা অনুসৃত হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহের জনৈক কর্মচাবী পরাগল খাঁব[২] সভাতে বাংলা মহাভারত প্রথম

১ মূল মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ, দীর্ঘ আটশত বৎসর ধরিয়া বহু কবির দ্বারা রচিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল—ইহাই আধুনিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

২ পরাগল খাঁর পরিচয়—ইনি ছিলেন হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের জমিদার। সম্ভবতঃ ইনি মুসলমান ছিলেন না। খাঁ-উপাধি দেখিয়াই কাহাকেও মুসলমান সাব্যস্ত কবা সঙ্গত নহে। খাঁটি মুসলমানের পক্ষে পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ প্রচারে সাহায্য কবা সম্ভবপর ও স্বাভাবিক নহে। 'দবির খাস' ও 'সাকর মল্লিক'—এই মুসলমানী পদবির অধিকারী ছিলেন, খাঁটি ব্রাহ্মণ রূপ সনাতন। এই রূপ সনাতনই প্রমাণ যে গুণবান হইলে হিন্দুও হোসেন শাহের উচ্চ রাজ-কর্মচারী হইতে পারিত। 'পরাগল' নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। উপরন্তু 'পরাগল' মুসলমানী শব্দই নহে। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"আরবী বা ফারসী ভাষায়ও নামটির অর্থ বা ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না।" (পৃঃ ২৫৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় সং)। পরাগল-পুত্র ছোটি খাঁর ভালো নাম 'পাতুর খাঁ', ইহাও মুসলমানী শব্দ নহে; আর্য-তদ্ভব শব্দ (গর্ভরূপ)। সুতরাং হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ মহাভারত অনুবাদের প্রথম উৎসাহদাতা পরাগলকে মুসলমান বলিয়া প্রচার করিবার কোন যুক্তি নাই।

সংক্ষিপ্তভাবে রচিত ও পঠিত হয়। তারপর অনিরুদ্ধ রামসরস্বতীর 'ভারত-পয়ার' সুরু হয় চিলারায়ের সভায়। পরে ক্রমশঃ রাজপুরুষের পরিবর্তে জনসাধারণই মহাভারতের শ্রোতা হইয়া দেখা দেয়, কিন্তু প্রাচীন সভারীতি ও গম্ভীর পরিবেশ অপরিবর্তিত থাকে। মহাভারতের 'পাঠক'ই ক্রমশঃ 'কথক' নামে চিহ্নিত হয় এবং অভিনয়হীন, নৃত্যহীন, বাদ্যহীন পরিবেশে উপবিষ্ট কথকের একক কণ্ঠের উদাত্ত গম্ভীর আবৃত্তিতে আভিজাত্য পূর্ণ রাজসভার প্রাচীন রীতিই অনুসৃত হইতে থাকে।

বাঙ্গালী-জীবনে রামায়ণের প্রতিষ্ঠা ও মহাভারতের প্রতিষ্ঠার মধ্যে প্রায় শতাধিক বৎসরের ব্যবধান। মহাভারতের জনপ্রিয়তার এই পরবর্তিতার গভীরতর কারণ আছে। মহাভারত-কাহিনী রামায়ণ-কাহিনীর ন্যায় বাঙ্গালী জীবনের সমধর্মী নহে। ইহাকে বাঙ্গালী জীবনে থাপ খাওয়াইয়া লইতে সেইজন্য সময় লাগিয়াছে। বাঙ্গালী যুদ্ধ-প্রিয় জাতি নহে, ক্ষত্রিয় বীর্যের কাহিনীতে তাহার কৌতূহল থাকিলেও নেশা নাই। শান্ত রসাস্পদ স্নেহ-প্রেমপূর্ণ গার্হস্থ্য-জীবনই তাহার পক্ষে সত্য বস্তু। রামায়ণেও রাম-রাবণের যুদ্ধ নহে, রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ-ভরতের ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্য, সীতার পতিপ্রেম, হনুমানের প্রভুভক্তি প্রভৃতি গৃহধর্মই বাঙ্গালীর চিত্ত হরণ করিয়াছিল। সেইজন্য রামায়ণের অনুবাদই হইয়াছিল তাহার প্রাথমিক ও স্বাভাবিক কার্য। কিন্তু মহাভারত রামায়ণ নহে, এখানে ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রধর্মের কাছে গৃহধর্ম পরাজিত। এখানে উদ্ধত পৌরুষ, প্রচণ্ড আত্মাভিমান ও মর্যাদাবোধ ব্যক্তিজীবনের উর্ধ্বে উঠিয়াছে, রাষ্ট্রজীবন ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ভুলাইয়াছে, প্রেম ভুলাইয়াছে, পুত্রশোককেও অগ্রাহ্য করাইয়াছে, ক্ষাত্র প্রতিহিংসা প্রতিপক্ষের বক্ষোরক্ত পান করিতেও দ্বিধা করে নাই। মহাভারতের মানুষ অনায়াসে প্রাণ বলি দিয়াছে, কিন্তু মান দেয় নাই। মহাভারতের কেবল মানবমানবী নহে, পরিবেশও সামরিক; কুরু-পাণ্ডব কাহারও গৃহজীবন নাই। দ্রৌপদী নামেমাত্র পাণ্ডবপত্নী, কিন্তু আসলে ষষ্ঠ পাণ্ডব; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইন্ধন প্রদানেই তাহার নারীত্ব নিঃশেষিত। যে অর্জুন দ্রৌপদীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই অর্জুনই দ্রৌপদীর নিকট হইতে সকল সময়ে দূরে দূরে থাকিয়াছে; উভয়ের হৃদয়ের আসক্তির বাষ্পরাশি প্রেমের প্রাণবর্ষী মেঘপুঞ্জে প্রগাঢ় হইবার

পূর্বেই রাজনৈতিক আকাশের দিগন্তরেখায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও বনবাসের কাহিনী আছে বটে কিন্তু রামায়ণে নায়ক-নায়িকার বনবাস আসলে পুনর্বাসন, মহাভারতেই তাহা সত্যকার নির্বাসন। রামায়ণের বনভূমিও সজীব ও সচিত্র; পঞ্চবটী, মাল্যবান, পম্পা—সকলেই প্রাণময় ও স্বমহিমায় স্বতন্ত্র; পাঠক কখনই ইহাদিগকে ভুলিতে পারে না। কিন্তু মহাভারতের বনভূমি একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, মূর্তিহীন, নিঃশব্দ রহস্যপুরী; তাহা পাণ্ডবগণের আত্মরক্ষার আশ্রয়-দুর্গ। সমগ্র মহাভারত আসলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিণাম; যুদ্ধ ছাড়া এখানে সব কথাই অবান্তর। সত্য বটে কয়েকটি আনুষঙ্গিক ছোট ছোট উপাখ্যানে—সাবিত্রী, দেবযানী, চিত্রাঙ্গদা, উলুপী, সুভদ্রা প্রভৃতির চরিত্রে হৃদয়ধর্মের বা প্রণয়ের কথা কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ও উদ্বেগে ভারাচ্ছন্ন বিষন্ন পরিবেশে কাহিনীগুলি রক্তহীন পাংশু-বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে প্রেম মিথ্যা, হাস্য বিরক্তিকর, চপলতা অবাঞ্ছনীয়। এইরূপ কাব্য যে হৃদয়ধর্মী বাঙ্গালী জাতির নিকটে প্রকৃতিবিরুদ্ধবোধে বহুকাল প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকিবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

বাঙ্গালী যে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়াছে তাহার মূলে সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক কারন নহে, ধর্মীয় কারণই বর্তমান। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম প্রচারই বাঙ্গালীকে মহাভারত অনুবাদে প্রেরণা দিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক এবং মহাভারত কৃষ্ণলীলার আদি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ কথা সত্য যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা এবং এই কাব্যের অঙ্গী রস বীররস, ভক্তিরস নহে, তথাপি ইহাতে কৃষ্ণ-ভক্তির প্রকাশও নিতান্ত অল্প নহে। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের নায়ক নহেন, তিনি যুদ্ধও করেন নাই, পার্থ-সারথি হইয়া কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণই মহাভারতের পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত চক্রের চক্রী, সমস্ত শক্তির উৎস এবং সমস্ত কর্মের নিয়ামক। রামায়ণের বিভীষণ যেমন কাব্যের নায়ক না হইয়াও রামচন্দ্রের মিত্র, মন্ত্রণাদাতা ও রক্ষাকর্তা, পাণ্ডব সম্পর্কে মূল মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের স্থান কতকটা তেমনই। দুর্বাসা-পারণে, ভীষ্ম-দ্রোণের যুদ্ধে, অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র নিক্ষেপে যখনই পাণ্ডব-গণ দুর্লঙ্ঘ্য সংকটে পড়িয়াছে তখনই কৃষ্ণ রক্ষাকর্তা রূপে উপস্থিত হইয়াছেন।

তিনিই কুরুসভায় দুঃশাসন-ধর্ষিতা দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন, পাণ্ডবদিগের রক্ষার্থ কেবল যে সারথি-রূপে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াছেন তাহা নহে, পাণ্ডববধার্থে নিক্ষিপ্ত অমোঘ নারায়ণাস্ত্র ও বৈষ্ণবাস্ত্র নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। মহাভারতের কবি শ্রীকৃষ্ণকে কেবল যে লজ্জা-নিবারণ ও বিপদভঞ্জন পাণ্ডব-সখা রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব ও ভগবত্তাও স্বীকার করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ তো স্তব করিবেই, বিপক্ষীয় ভীষ্ম, বিদুর এমনকি গান্ধারীও কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়া ভক্তি নিবেদন করিয়াছে। কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যপূর্ণ এইরূপ একটি গ্রন্থকে প্রচারার্থে কৃষ্ণভক্ত বাঙ্গালী অনুবাদ না করিয়া পারে না।

বাঙ্গালী কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছে বটে, কিন্তু মহাভারতের অঙ্গী রসকে বীররস হইতে ভক্তিরসে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। মূল মহাভারতের সমস্ত তেজোদীপ্ত ক্ষত্রধর্মী ঘটনাকে যথাসম্ভব কৃষ্ণলীলার দিক হইতে ভক্তিমণ্ডিত করিয়া মহাভারতকে নূতন কৃষ্ণায়ণ কাব্যে পরিণত করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ তাহার মানবিক অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার অর্থ হইয়াছে—'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' ভগবৎ-লীলা। বাংলা মহাভারতেই আধ্যাত্মিক ভাবের আলোকে কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন—সমস্ত শক্তির উৎস, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী ও সমস্ত ঘটনার নিয়ামক ও নায়ক। তিনি অতি কূটকৌশলী ছলনাময় ও মায়াবী। কিন্তু এই ছলনা স্বার্থসাধনের ঘৃণ্য কুটিলতা নহে, ইহা তাঁহার সর্বভূতে করুণারই অপর দিক, ইহা অল্পবুদ্ধি মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও রহস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় মাত্র। বাংলা মহাভারতেই সহজে বুঝা যায় যে কৃষ্ণের কপট নিদ্রার কারণ কেবল পাণ্ডবপ্রীতি নহে, নারায়ণীসেনার প্রতি তাঁহার বাঞ্ছাকল্পতরুত্ব, দ্রৌপদীর কাছে ক্ষুধার্ততার ভান করিয়া অন্নকণা ভোজনের কারণ দুর্বাসার ক্ষুধামান্দ্য উৎপাদন করিয়া তাহার অভিশাপ হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা ; অকালে মায়িক আম্রের উৎপাদন কেবল দ্রৌপদীকে দিয়া তাহার ষষ্ঠপতি-লাভের ইচ্ছা স্বীকার করাইয়া তাহার দর্পহরণ ও চিত্তশোধনের জন্য। বাঙ্গালী কবিই দেখাইয়াছেন—উদ্যোগপর্বে কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যের প্রধান উদ্দেশ্য দরিদ্র বিদুরের খুদ খাইয়া ভক্তকে কৃতার্থকরণ। তাছাড়া রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান, অর্জুনকে দুর্যোধনের মুকুট প্রদান,

পারিজাত হরণ প্রভৃতি মূল মহাভারত-বহির্ভূত বহু কাহিনী রচনা করিয়া বাঙ্গালী কবি দেখাইয়া দিয়াছেন—কৃষ্ণের আপাত কপটতার কারণ তাঁহার অন্তর্যামিত্ব, সর্বজ্ঞতা, সর্বভূতে করুণা এবং প্রধানতঃ ভক্তবৎসলতা। বাংলা মহাভারতের কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ বলে আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর॥
ভক্তাধীন করি মোরে স্বজিল বিধাতা।
ভক্তই কেবল মম সুখদুঃখ দাতা॥

তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞকালে প্রণাম করার কৈফিয়ত-স্বরূপে বলিয়াছেন—

তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে॥

প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের ভক্তবৎসলতা আছে, কিন্তু ভক্তাধীনতা নাই। কাশীরাম প্রচারিত ভগবানের ভক্তাধীনতা চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি-ধর্মেরই নূতন সৃষ্টি। তাছাড়া বঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা প্রচার করিয়াছিলেন—ভগবানের অপেক্ষা ভগবানের নাম বড। বাঙ্গালী পদকর্তা লিখিয়াছেন—

সাগর লঙ্ঘিয়া ফিরে হনুমান
লইয়া রামের নাম।
সেই সে সাগর আপনি তরিল
পাথরে বান্ধিয়া রাম॥ —প্রেমানন্দ

ইহারই দৃষ্টান্ত হিসাবে কাশীরাম সত্যভামার তুলাব্রতের কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণকে ওজন করিতে যখন সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, তখন ভক্ত উদ্ধব—

এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণ নাম॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হইল তুলসী উর্ধ্বেতে জগন্নাথ॥

বলা বাহুল্য, চৈতন্যদেবের ভক্তির আলোকে বাংলা মহাভারত নূতনতর রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালীর অতিরিক্ত কৃষ্ণভক্তি মূল মহাভারতকে খর্বও করিয়াছে

অনেকখানি। কৃষ্ণভক্তিকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু করিয়া তোলায় সাংসারিক ও ব্যবহারিক জীবন নিরর্থক ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী কবি মূল মহাভারতের রাজধর্মানুশাসন পর্ব আপদ্ধর্ম পর্ব ও আনুশাসনিক পর্ব একেবারে বর্জন করিয়াছেন। তৎফলে বাঙ্গালীপাঠক রাজনীতি ও সমাজনীতির বহু কাহিনী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। পার্থিব জীবনের মূল্য উপেক্ষিত হওয়ায় বিদুলা উপাখ্যানের ন্যায় বহু তেজোদীপ্ত ক্ষত্র-কাহিনীও বর্জিত হইয়াছে। ভীষ্মদ্রোণাদি বড় বড় বীর হইয়া গিয়াছে ভগবদ্-ইচ্ছার যন্ত্র বা উপলক্ষ মাত্র। ভক্তির আলোকে পাণ্ডবগণকে মধুরতর দেখাইলেও ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে হইয়া পড়িয়াছেন কৃষ্ণমুখাপেক্ষী নিস্তেজ বৈষ্ণব। সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হইয়াছে দ্রৌপদীর। মূল মহাভারতের পঞ্চপতিগর্বিতা বজ্রাগ্নিরূপিণী দ্রৌপদী বাংলা কাব্যে হইয়া পড়িয়াছেন—অবলা ও ব্যাকুলা বাঙ্গালী বধূ। সভাপর্বে দুঃশাসন কর্তৃক চরম অবমাননার সময়েও মূল দ্রৌপদীর ক্ষাত্র তেজ ও মর্যাদা-বোধ বিস্ময়কর। বস্ত্রহরণকালে কৃষ্ণা যেন বজ্রগর্ভ কাদম্বিনী—অন্তরে অসহ্য দুঃখ-জ্বালা কিন্তু বাহিরে বিহ্বলতা নাই, ভয়ার্ততা নাই, আর্তনাদ নাই, বিন্দুমাত্র অধীরতা নাই —মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কৃষ্ণচিন্তায় হইয়াছে সংহত—"আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ"। পাছে কেহ উদ্গত অশ্রু দেখিতে পায়, এইজন্য দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিয়াছেন—"প্রারুদদ্ দুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী।" সেই দ্রৌপদী কাশীরামের কাব্যে ইনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ কৃষ্ণস্তুতি ও আর্তনাদ করিয়াছে। মূল মহাভারতে কৃষ্ণস্তুতির অভাব নাই, কিন্তু তাহা সংযত প্রগাঢ় ও গম্ভীর। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মবধার্থ অগ্রসর হইলে ভক্ত ভীষ্ম বলিয়া উঠিয়াছেন—

> এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ দেবদেব নমোঽস্তুতে।
> মামদ্য সাত্বত শ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে॥
> সম্ভাবিতোঽস্মি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যেনাদ্য সংযুগে।
> প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসোঽস্মি তব চানঘ॥

[হে দেবদেব, যদুশ্রেষ্ঠ, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমাকে নমস্কার। এসো মহাযুদ্ধে আমাকে নিপাতিত কর। আজ যুদ্ধে ত্রিভুবনে সম্মানিত হইলাম। হে অনঘ আমি তোমার দাস, আমাকে যেমন ইচ্ছা প্রহার কর।]

এ স্থলে কাশীরামের ভীষ্ম বলিয়াছে—

শীঘ্র এস কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥
তব হস্তে যদি আমি সমরে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব॥…
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন।
নমস্তে সুদাম-বিপ্র-দারিদ্র্য-ভঞ্জন॥
ধ্রুব ধ্রুবলোক পায় তোমার প্রসাদে।
হিরণ্যকশিপু বধি রক্ষিলে প্রহ্লাদে॥
নমস্তে বামন-মূর্তি নমো জনার্দন।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ-বিনাশন॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলে সমরে॥

লক্ষ্য করিতে হইবে বাংলা মহাভারতের ভীষ্মের ভক্তিপ্রকাশের মধ্যেই তাহার আনুষঙ্গিক মুক্তিকামনা, ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার জন্য উল্লাস ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যই তাঁহার ভক্তিও লঘু ও খর্ব হইয়া গিয়াছে। মূল মহাভারতের ভীষ্মের মিতভাষিতা সেক্ষেত্রে প্রগাঢ় আত্মসমর্পণ ও গভীরতর ভক্তিই প্রকাশ করিয়াছে। আবার বাঙ্গালী কবি যেখানে অভিভাষণ ত্যাগ করিয়া বাকসংক্ষেপ করিয়াছেন, সেখানেও মূল বর্ণনার রসের গাঢ়তা নষ্ট হইয়াছে। দ্রোণপর্বে সংস্কৃত কবি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকে চুয়াল্লিশ চরণে রক্তনদী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বাংলার কবি সেখানে মাত্র ছয়টি চরণে বর্ণনা করিয়া মিতভাষিতা দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সংস্কৃত কবি যে ভয়ঙ্কর গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালী কবি তাহা পারেন নাই। বাঙ্গালীর হস্তে যে মূল মহাভারতের রসের অবমাননা ঘটিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।[৮] কাশীরামের অনুবাদ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"কাশীদাসের মহাভারত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ নহে।…নদী জলের শ্রেষ্ঠ আধার, এজন্য ঘরের নিকটে নদী বহাইয়া দেওয়া নিরাপদ বা সুবিধাজনক নহে। পাত্রে পুরিয়া জল আনিলে গৃহীর সুখসেব্য হয়। কলসীর জল শিশুকে ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইতে হয়।

মহাভারতকে এইভাবে ক্ষুদ্র করিয়া, প্রয়োজনের ঠিক উপযোগী করিয়া প্রাচীন লেখকগণ সাধারণের নিকটে আনিয়াছিলেন।"[১] বাঙ্গালীর দ্বারা মূল মহাভারতের ক্ষুদ্রীকরণকে দীনেশচন্দ্র সমর্থন করিলেও আসলে তাহা লঘূকরণই বটে এবং তাহা জাতিগত দুর্বলতারই পরিচায়ক।

✓মহাভারত অনুবাদে বাঙ্গালী কবির কবিত্ব ও রচনাশক্তির পরিচয় নাই, তাহা নহে, কবি মূল সংস্কৃত মহাভারতের কল্পনার ও ভাবের বিশালতা এবং গাম্ভীর্য সর্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই—ইহাই প্রকৃত বক্তব্য। বাংলা মহাভারতে মোটামুটিভাবে মূলের পৌরাণিক গম্ভীর পরিবেশ অব্যাহতই আছে জীবনের সাধারণ কথায়—যেখানে বিশেষ ভাব সৃষ্টির অবকাশ নাই—সেখানে বাঙ্গালী কবি সবল সংযত ও মূলানুসারী। অনেক স্থলেই মূলের অর্থগৌরব ও গাঢবদ্ধতা বর্তমান আছে। যথা—

(১) শূদ্রগণে যজ্ঞ করে বজ্র তার সেহি।
বৈশ্যগণ দান কবে বজ্র তারে কহি॥

—অঙ্গারপর্ণের উপাখ্যানে, আদিপর্ব

(২) নির্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবারে কৈলে দোষ দণ্ড দিবে তার॥ —মার্কণ্ডের উপদেশ, বনপর্ব

(৩) অনর্থের মূল অর্থ—কর অবগতি॥
উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে॥ —শৌনকের উপদেশ, বনপর্ব

বাঙ্গালী কবির কবিত্ব এখানে ক্লাসিকধর্মী ও জীবনানুগ। কবিত্বপূর্ণ পংক্তি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে বলিয়াই হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যেমন—

(১) মন আত্মা পাণ্ডবের কৃষ্ণ সহ গেল।
কেবল শরীর লয়ে পাণ্ডব ফিরিল॥ —সভাপর্বে কৃষ্ণের বিদায়

(২) কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্মের নির্বন্ধ এই জানিবে তেমন॥ —শ্রীবৎস রাজার বিবাহ

(৩) বৃকোদর শুনিয়া কর্ণের কটূত্তর।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে কচালে করে কর॥

---

১ কাশীদাসী মহাভারতের ভূমিকা পৃঃ ৵০

ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্তকুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি গর্জে যেন কাদম্বিনী ॥

—সভাপর্বে দ্রৌপদীর অপমানে ভীমের আত্মসংযম

(৪) সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর 'প্রভু'-পণে।
দাসী জ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবে চরণে ॥ —কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদী

(৫) কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥

—চক্রভেদ সন্দেহে রাজাদিগের প্রতি অর্জুনের উক্তি

(৬) মহাবীর যেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত ॥

—দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে ছদ্মবেশী অর্জুনের মূর্তি

বাংলা মহাভারতের কবির ক্লাসিক কবিত্বের অন্যতম লক্ষণ জীবনের বৈচিত্র্যকে স্বীকার। তাহারই ফল—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিবেশেও জীবনজাত ও পরিবেশিত হাস্যের অবতারণা। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে এই হাস্য কবির গভীর সহানুভূতি ও মানব-চরিত্রজ্ঞতার পরিচায়ক, এই হাস্য মোটেই বিদূষকোচিত চপল বা প্রগলভ নহে, ইহা সত্য ও পরিবেশ-সঙ্গত।

(১) দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ বাধিবার পরবর্তী আতঙ্ক—

ক্ষত্রে দেখি ব্রাহ্মণ 'পলায়' উভরড়ে।
দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় 'লুকায়' ঝাড়ে ঝোড়ে ॥
দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্রে দ্বিজ ভয়।
দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয় ॥

['পলায়' ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণত্ব এবং 'লুকায়' ক্রিয়ায় ক্ষত্রিয়ত্ব দ্রষ্টব্য]

(২) একচক্রা গ্রামে বকরাক্ষসের ভয়ে পত্নী ও কন্যার সহিত ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে ব্রাহ্মণ-শিশুর আশ্বাস—

এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ ॥

হাতে এক তৃণ লইয়া বলে সেই শিশু।
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিস কিছু॥
রাক্ষসে মারিব এই তৃণের প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে॥

(৩) কীচকের মৃতদেহ দর্শনে জনতার মুরুব্বিয়ানা ও অভিজ্ঞতার ভান—

কোথা গেল হস্তপদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর॥
কেহ বলে গন্ধর্ব মারয়ে এই মত।

(৪) শ্বশুর দ্রুপদ রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ভীমের গোঁয়ার্তুমি—

কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পাঞ্চাল নৃপতির॥
পুনঃ পুনঃ ধর্মবাক্য কবেন হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি নিতাম জীবন॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরুমধ্যে গণি।
তাই ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি॥

কেবল কাব্য-গ্রন্থ হিসাবে নহে, লোকশিক্ষা-গ্রন্থ হিসাবেও কাশীদাসী মহাভারত বঙ্গসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। ইহা বহুকাল ধরিয়া জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অতিথিসেবা, জীবে দয়া, পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। বাঙ্গালীকে ধর্মপ্রাণতা, সত্যনিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরভক্তি শিখাইয়াছে এই গ্রন্থ। প্রাণশক্তির গুণে ইহা আপামর জনসাধারণের চিত্তবিজয়ী,—রাজসভা হইতে দরিদ্র মুদীর দোকান পর্যন্ত ইহার একচ্ছত্র অধিকার। শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"তাহার পর (ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে) দীর্ঘ তিন শতাব্দী পার হইয়া দেখি কলিকাতা কলিঙ্গা বাজারের মুসলমান দোকানদার নিজের পড়িবার জন্য কাশীরাম দাসের ভারত পাচালীর পুথি নকল করিয়া লইতেছে।"[১] কাশীদাসী মহাভারত পরবর্তী যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির উৎসও বটে; মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি

১ ভূমিকা পৃঃ ৫০ কাশীদাসী মহাভারত (বিনোদলাল চক্রবর্তীর দ্বারা সম্পাদিত)

সাহিত্যিকগণের রচনার উপাদান জোগাইয়াছে এই গ্রন্থ। ইহার পুণ্যকর্মের তুলনা নাই। মহাভারত অনুবাদকালে কবির ধারণা হইয়াছিল—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান ॥

গত তিন শতাব্দীর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে : কবির সে ধারণা আদৌ কল্পনা নহে, অতিশয়োক্তি নহে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য এবং সার্থক।

নেপথ্য-বার্তা

বিভিন্ন বাংলা মহাভারত

বাংলায় মহাভারত রচনার দৃষ্টান্ত অল্প নহে। দীনেশচন্দ্র সেন ৩১জন, মণীন্দ্রমোহন বসু ৩৬জন ও শ্রীসুকুমার সেন প্রায় ৭৬জন কবির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা অধিকাংশই মহাভারতের কোন কোন পর্ব বা পর্বাংশের অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহাদের অধিকাংশের রচনাই বৃহত্তর মহাভারতের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য সমগ্র মহাভারত কথার যথার্থ অনুবাদ একজনের দ্বারা সম্ভাব্য নহে। কবীন্দ্র বা কবীন্দ্রপরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালিকা'ই বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনতম ভারত-কথা। ইনি সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৫-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষিত কবি। পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন, ইনি ধর্মে মুসলমান ছিলেন কিনা জানা যায় নাই। (পরমেশ্বরের কাব্যে "রুদ্রবংশ-রত্নাকর" রূপে পরাগলের প্রশস্তি করা হইয়াছে।) পরাগলের পৃষ্ঠপোষিত বলিয়া কবীন্দ্রপরমেশ্বরের কাব্য 'পরাগলী মহাভারত' নামে বিখ্যাত। পরাগল কবীন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—

এইসব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাচালী রচিয়া ॥

কাজেই পরাগলী মহাভারত অতি সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হইয়াছিল। তবে

ইহা যে সমগ্রাংশে সম্পূর্ণ রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে কবীন্দ্রের নামে প্রচলিত গ্রন্থে প্রায় সতের হাজার শ্লোক আছে, ইহা যে "দিনেক" শ্রবণের মতো নহে, বহু কবির প্রক্ষেপে সুপরিবর্ধিত বৃহৎ সংস্করণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে একটি প্রাচীন পুথি পাইয়া প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রচার করেন—পশ্চিমবঙ্গ বাসী বিজয় পণ্ডিতই মহাভারতের আদি অনুবাদক। ইহার গ্রন্থই চট্টগ্রামে পরাগলী মহাভারত রূপে প্রচারিত হয়। মণীন্দ্রনাথ বসু অপরপক্ষে প্রচার করিয়াছেন—"কবীন্দ্রের রচনা প্রয়োজনমত গ্রহণ ও বর্জন করিয়া ব্যাস ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বিজয় পণ্ডিতের গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে।"[১] শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন—"পুথির শেষ ভণিতায় 'বিজয়পাণ্ডব' কথার স্থানে লিপিকর প্রমাদে 'বিজয় পণ্ডিত কথা' পাইয়া ইনি (নগেন্দ্র বসু) এটিকে বিজয় পণ্ডিত বলিয়া এক কল্পিত প্রাচীন কবির রচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।"[২] এই গ্রন্থ অনুকরণ-জাত হইলেও ইহা নকল ও পরিবর্ধিত গ্রন্থেরই অনুকরণ, মূল গ্রন্থের অনুকরণ নহে। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মূল মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব সমাপ্ত হয় নাই অথবা বাদ পড়িয়াছিল, সেইজন্য পরে শ্রীকর নন্দী উহা পুনর্বার রচনা করিয়া মূল মহাভারতের পূর্ণতা দান করেন। প্রচলিত ধারণা—পরাগল-পুত্র ছুটিখান বা ছোটিখান শ্রীকর নন্দীকে অনুবাদের আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"আদেশদাতা বলিয়া কোথাও ছুটি খাঁর উল্লেখ নাই।"[৩] যৌবনাশ্ব, অনুশাল্ব, নীলধ্বজ-জনা, চণ্ডিকা-সুধন্বা, সুরথ, হংসধ্বজ প্রমীলা-অর্জুন, বভ্রুবাহন, তাম্রধ্বজ ও চন্দ্রহাস—ইহাদের উপাখ্যান শ্রীকর নন্দীর রচনার বিষয়বস্তু। শ্রীকর নন্দী ব্যাস মহাভারত অবলম্বন না করিয়া জৈমিনীয় ভারতই অবলম্বন করিয়াছিলেন,—

> শুনস্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
> মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীকর নন্দীর পরে যাহারা অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন

১ পৃ: ২৭ বাঙ্গালা সাহিত্য (২য় খণ্ড)

২ পৃঃ ২২৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

৩ পৃঃ ২৪১ পাদটীকা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (৩য় সং)

তাহাদের অধিকাংশই জৈমিনি-ভারতই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্যাসদেবের অশ্বমেধ পর্বে সন্তুষ্ট হন নাই।

পূর্ববঙ্গ হইতে পরাগলী মহাভারত ব্যতীত আরও একটি মহাভারতের বৃহৎ অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সঞ্জয়ের ভণিতা আছে। দীনেশচন্দ্র সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে সঞ্জয়ের মহাভারতই বাংলা ভাষায় আদি মহাভারত এবং পরাগলী মহাভারতের পূর্বে রচিত। কিন্তু সঞ্জয়ের পুথির ভণিতা আলোচনা করিয়া অনেকেই সঞ্জযের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া পডেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ কবিয়া বলেন যে এই সঞ্জয় কোন বাঙ্গালী লেখক নহেন, ইনি পৌরাণিক সঞ্জয়—"পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়" । ইহার উত্তরে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেবই মানুষ।"[১] মণীন্দ্র বসু মনে করেন এই সঞ্জয় একটা উপনাম মাত্র, আসল নাম হরিনারায়ণ দেব। ইনি কবীন্দ্র-পরমেশ্বরেরও পূর্বে মহাভারত রচনা করেন এবং এই মহাভারত কবীন্দ্রের কাব্যের পূর্বে পরাগলেব রাজসভায় পঠিত হইত। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের ধারণা—"পূর্ববঙ্গের ভারত পাঁচালী বচয়িতাদের কাব্যপ্রবাহ মিলিত হইয়া গিয়া তথাকথিত সঞ্জয়-মহাভারতের সৃষ্টি কবিয়াছে। এই বিরাট ভারত পাঁচালীর সর্বাপেক্ষা পুরানো পুথি লেখা হইযাছিল ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে। আদি পর্বে রাজেন্দ্র দাসের ভণিতা আছে, অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের ও স্বর্গারোহণপর্বে ষষ্ঠীবরের।··· সঞ্জয় কোন বাঙ্গালী কবিব নাম মনে করিবার কারণ নাই।"[২]

ব্যাস-মহাভাবত বিরোধী ও জৈমিনীয় কথানুসারী উপাখ্যান রচনা সঞ্জয় মহাভারতের বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য সঞ্জয় মহাভারতে কয়েকটি অপ্রচলিত ও বিস্ময়-কর কাহিনী দেখা যায়। ব্রহ্মশাপের জন্য রাজা পরীক্ষিৎকে দংশনকারী বিষধর সর্প তক্ষক পরীক্ষিতেরই শ্বশুর। জনমেজয় তক্ষক-কন্যা সারদারই গর্ভজাত। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মস্তকে আঘাত করিবার অপরাধে জনমেজয়ের মহাব্যাধি এবং জৈমিনির নিকটে ভারত শ্রবণে পাপক্ষয় ও রোগমুক্তি। মহীনামক বানর কর্তৃক গঙ্গাকে কামনা এবং ঐ বানরের শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ,

১ পৃ: ১৪২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

২ পৃ: ৪৬৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড. (২য় সং)

দণ্ডীরাজার কাহিনী, গান্ধারীর দ্বাদশবর্ষ গর্ভধারণ ও গর্ভচিকিৎসা, রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে হনুমানের উপর দিয়া অর্জুনের সসৈন্যে লঙ্কাগমন, খাণ্ডব দাহনকালে নাগিনী ও তৎপুত্রসহ অর্জুনের যুদ্ধ প্রভৃতি বহু নূতন সংবাদ সঞ্জয় মহাভারতে পাওয়া যায়। এইগুলি জৈমিনি ভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন। জানা উচিত, সংস্কৃত জৈমিনি সংহিতার মধ্যে বর্তমানে কেবল অশ্বমেধ পর্বটিরই সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই সঞ্জয় মহাভারতের অদ্ভুত কাহিনীগুলি বাস্তবিকই জৈমিনি ভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে কিনা, বলা কঠিন।

ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহার-কামতা রাজ্যেও পাঁচালীর আকারে মহাভারত অনুবাদ দেখা যায়। বিশু কোঁচ বা রাজা বিশ্বসিংহের সভায় প্রথম ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি পীতাম্বর 'নলদয়মন্তী' উপাখ্যান রচনা করিয়া মহাভারত অনুবাদের গোড়াপত্তন করেন। বিশ্বসিংহের সুযোগ্য পুত্র মহাবীর শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের সভায় তাঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃতজ্ঞ বিখ্যাত সভাপণ্ডিত অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী যথাক্রমে বনপর্ব, উদ্যোগ পর্ব ও ভীষ্ম পর্ব অনুবাদ করেন। তৎপরে তৎপুত্র গোপীনাথ পাঠকের দ্বারা দ্রোণ পর্ব পর্যন্ত অনূদিত হয়। এই রাজবংশের উৎসাহে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক পর্যন্ত মহাভারতের অনুবাদকার্য চলিতে থাকে। পূর্বোক্ত কবিগণ ভিন্ন আঠারো উনিশ শতকের প্রায় তেইশ জন কবি মহাপ্রস্থানিক পর্ব পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন।

কোচবিহারের মহাভারত-কাব্য প্রধানতঃ বর্ণনামূলক পাঁচালী। ধারাবাহিক ভারত-কথার মধ্যে মধ্যে দুই একটি পদ সমাবেশ ইহাতে দেখা যায়। যথা—

> নমো নন্দসুত তনু মেঘ সম শ্যাম।
> গলে বনমালা পীত বস্ত্র অনুপাম ॥
> কর্ণত গুঞ্জার থোপা হাতত পাঁচনি।
> গোপর বালক সমে করে বংশীধ্বনি ॥
> হেনয় কৃষ্ণক দুই অরুণ চরণে।
> মোর মন ভ্রমরে বহুক সর্বক্ষণে ॥

তুমি প্রভু পতিত জনর নিজ গতি।
কাকুতি করিয়া মাগোঁ রামসরস্বতী ॥

পশ্চিমবঙ্গে রচিত মহাভারত পাঁচালীর মধ্যে চৈতন্য সমকালবর্তী রামচন্দ্র খানের ১৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত অশ্বমেধ পর্বই প্রাচীনতম। এই কালের অপর কবি হইতেছেন অশ্বমেধ পর্ব রচয়িতা দ্বিজ রঘুনাথ (১৫৬৭ খ্রীঃ)। এই দুই কবির রচনাও খুব সম্ভব কাশীরামের কাব্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ১৩০৯ সালে প্রদীপ পত্রিকায় রামচন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব প্রকাশিত হয়। রঘুনাথের অশ্বমেধ পর্বের বিবরণ প্রকাশিত হয় বঙ্গসাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৫ সালে। উভয়ের রচনাই জৈমিনি ভারতের অনুসরণ। রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধ পর্বে কবি লিখিয়াছেন—

সপ্তদশ-পব কথা সংস্কৃত বন্ধ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পবাকৃত ছন্দ ॥

ইহা হইতে মনে হয় জৈমিনি-ভারতে সম্ভবতঃ সপ্তদশ পর্বেই অশ্বমেধ কথা ছিল, ব্যাস-ভারতের ন্যায় পঞ্চদশ পর্বে ছিল না। দ্বিজ রঘুনাথ উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সভায় তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব পাঠ করিয়াছিলেন। এই মুকুন্দদেব ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থলেমান কররানী কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। কাশীদাসী মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রসঙ্গে লবকুশের সহিত রামের যুদ্ধের কথা সংক্ষেপে আছে, কিন্তু রঘুনাথ জৈমিনি ভারতের আদর্শে এক্ষেত্রে রামের সীতা-নির্বাসন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়— এক রজকের স্ত্রী তাহার পিতৃগৃহে গমন করিয়া চারিদিন মাত্র বাস করিয়াছিল। এইজন্যই রজক স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া বলে—

তুমাক বর্জিল আমি যাহ বাপ-স্থানে।
রাম রাজা হেন আমি না চিন্তিহ মনে ॥

ইহাই নাকি সীতা বর্জনের কারণ।

মহাভারত-পাঁচালীর পশ্চিমবঙ্গীয় অপর কবি নিত্যানন্দ ঘোষকে পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে কাশীরাম পূর্ববর্তী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—

অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ ॥

কিন্তু শ্রী সুকুমার সেনের মতে পৃথ্বী-চন্দ্রের ধারণা ভ্রান্ত। নিত্যানন্দ কাশীরাম-পরবর্তী। "কবির কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আগে ফেলা যায় না।"[১] নিত্যানন্দের রচনা সংক্ষিপ্ত। ইনি মহাভারতের সাতটি পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

মহাভারত অনুবাদকদিগের মধ্যে সবাপেক্ষা বিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দেব। ইনি কায়স্থ-সন্তান। বিষ্ণুভক্ত কবি বিনয়বশতঃ নিজেকে 'দাস' বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। কাশীদাসী মহাভারতই সবাপেক্ষা সুপরিণত ও সুসম্পূর্ণ। বর্ধমান জেলার ইন্দ্রানী পরগনায় সিঙ্গিগ্রামে কবির জন্ম। গদাধরের 'জগৎ মঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় কবির পিতার নাম কমলাকান্ত—

কমলাকান্তের হৈল এ তিন কোঙর।
প্রথমে সে কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর॥
দ্বিতীয় শ্রী কাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎ মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥

ইহাই কবির বংশ-পরিচয়।

কাশীরাম সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ ১৬০২-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্বোক্ত গৌরীমঙ্গল কাব্যে কাশীরামকে সমগ্র অষ্টাদশ পর্বের অনুবাদক বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও বহু পণ্ডিতের ধারণা যে কবি মাত্র চারিটি পর্বই রচনা করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে উদ্ধৃত একটি প্রাচীন প্রবাদ দেখা যায়—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

নন্দরাম দাস রচিত উদ্যোগপর্বে কবির কাব্য-রচনার কৈফিয়তে উল্লিখিত প্রবাদ সমর্থিত হইয়াছে। অনুবাদকার্যে কবি হরিহরপুরের অভিরাম মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়—

১ পৃঃ ৪৬৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং)

হরিহরপুর গ্রাম সর্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখুটি অভিরাম॥
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে॥

কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম উদ্যোগপর্ব ও দ্রোণপর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাশীদাসী মহাভারতের শান্তিপর্ব কৃষ্ণানন্দ বসুর এবং স্বর্গারোহণপর্ব জয়ন্ত দাসের রচিত বলিয়া জানা যায়, স্ত্রীপর্ব সম্ভবতঃ নিত্যানন্দ ঘোষের। অষ্টাদশ শতকের কবি দ্বৈপায়ন দাসের বনপর্ব, গদাপব ও সভাপর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির সহিত ও কাশীদাসী মহাভারতের রচনা সাদৃশ্য আছে। শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"দ্বৈপায়ন দাস কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়া মনে করি না।"[১] দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণা—কাশীরাম গদাধর ও নন্দবামের চেষ্টায় কাশীদাসী মহাভারত সম্পূর্ণ হইয়াছে। যদিও কাশীদাসের নিজের রচিত অংশ আদি, সভা, বন প্রভৃতি পর্বেব বহুছত্রে মূল সংস্কৃত শ্লোকের হুবহু অনুবাদ দেখা যায়, তথাপি অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন, কাশীরাম নাকি সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের মুখে শুনিয়াই নাকি অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সন্দেহের কোন যুক্তি নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্ব চারিখণ্ড ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় সংস্করণে সমগ্র কাব্য ছাপা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগরের গুরু সুবিখ্যাত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ইনি কাশীদাসী ভাষার কিছু কিছু কালোচিত পরিবর্তন করিয়া প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন যে জয়গোপাল কাশীদাসী ভাষার আমূল পরিবর্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কাশীদাসী মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত, জয়গোপাল অতি অল্পই পরিবর্তিত করিয়াছিলেন।

কাশীদাসী মহাভারত মোটামুটিভাবে ব্যাস-ভারতের অবলম্বনে রচিত

১ পৃঃ ৬৯২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং)

হইলেও অনেক উপাখ্যান ও ঘটনার ব্যাপারে ব্যাস-ভারত হইতে পৃথক। ব্যাস-সংহিতার বহু কাহিনী বর্জিত হইয়াছে এবং অনেক নূতন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহাভারত-কথার সূচনা হইয়াছে ব্যাস-ভারতে পৌষ্য পর্বে কিন্তু কাশীদাসী ভারতে 'পৌলম পর্বে'র ভৃগুবংশের বিবরণে। কাশীদাস পৌষ্যপর্ব হইতে কেবল উতঙ্কের কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত আছে যে ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষালনের জন্য রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের নিকট ভারত-কথা শ্রবণ করেন, এই ব্রহ্মহত্যা পাপের কথা ব্যাস-ভারতে নাই। রুরু-প্রমদ্বরার প্রেম, বিদুলার তেজস্বিতা, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুযজ্ঞ প্রভৃতি ব্যাস-ভারতের সুন্দর সুন্দর বহু কাহিনী কাশীদাসী ভারতে বাদ পড়িয়াছে। তৎপরিবর্তে বহু নূতন কাহিনী যথা অকাল-আম্রের বিবরণ, শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান, জনা-প্রবীবের উপাখ্যান, ভানুমতীর স্বয়ংবর, লক্ষণার স্বয়ংবর প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেকে সন্দেহ করেন, অধুনালুপ্ত জৈমিনি-সংহিতা বা বৃহৎ ব্যাস-সংহিতা হইতে নূতন নূতন গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলা মহাভারতে কিন্তু আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি হইয়াছে বেশী। ব্যাস-ভারতে শান্তি-পর্ব বহু তত্ত্বকথাপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ। ইহার রাজধর্মানুশাসন, আপদ্ধর্ম ও অনুশাসনিক পর্ব প্রায় সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। মোক্ষধর্মের সম্বন্ধে যে অল্প কয়েকটি কথা বলা হইয়াছে তাহাও ব্যাসের মহাভারতের কথা নহে। বন-পর্বের প্রধান অঙ্গ তীর্থযাত্রা পর্ব ও মার্কণ্ডেয়পর্ব বর্জিত হইয়াছে। ব্যাস-ভারতে দ্বৈতবনে বকরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রায় শতাধিক তত্ত্বমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কাশী-রামের কাব্যে মাত্র চারিটি প্রশ্ন আছে। সমগ্র গীতা ব্যাস-মহাভারতের অন্তর্গত, তাহার সমস্ত তত্ত্বকথাই কাশীদাসে পরিত্যক্ত হইয়াছে কেবল কাহিনীর জন্য অতি সামান্য অংশ কয়েক পংক্তিতে মাত্র বিবৃত হইয়াছে। কেবল 'গীতা' নহে মূল মহাভারতের 'অনুগীতা'ও বাদ পড়িয়াছে।

কাশীদাসে ব্যাস-ভারতের কাহিনীকে বিকৃত করা হইয়াছে অনেক পরিমাণে। কাশীদাসের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ভীম লক্ষ্যভেদ করিতে উঠিয়া শিখণ্ডীকে দেখিয়া ধনুত্যাগ করেন, দ্রোণ ও কর্ণের বাণ সুদর্শনচক্রে প্রতিহত হইয়াছিল। এসকল কথা ব্যাস-ভারতে নাই; তৎপরিবর্তে আছে লক্ষ্যভেদে

হস্তক্ষেপে এই উৎপীড়ন নিবারিত হয়। কবি ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

বিদ্যাসুন্দর-কাব্য অন্নদামঙ্গল-কাব্যের অন্তর্গত হইলেও ইহার কাহিনী অন্নদামঙ্গল-কাহিনীর ন্যায় ভারতচন্দ্র-রচিত মৌলিক কাহিনী নহে; বর্ধমান, শুকপক্ষী ও হীরা মালিনী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব। কিন্তু মূলগল্প বহু দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। সুদূর আরাকানে রচিত পদ্মাবতী কাব্যেও বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, মুসলমানী কেচ্ছা হইতে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর জন্ম। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের মতে ষোড়শ শতাব্দীর নসরৎ শাহার পুত্র যুবরাজ ফীরুজ শাহার অনুচর কবি শ্রীধর কর্তৃক বিদ্যাসুন্দর প্রণয়কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। তবে সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের কাশ্মীরী কবি বিল্হণের 'চৌর পঞ্চাশিকা' নামক সংস্কৃত কাব্যই বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎস বলিয়া মনে হয়। চৌর পঞ্চাশিকা আদিরসাশ্রিত গোপন প্রেমের কাব্য ইহাতে কালিকা বা অন্য কোন দেবীর সম্বন্ধ নাই। এই চৌর পঞ্চাশিকা শ্লোকগুলি পরে বাঙ্গালী কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়ক সুন্দরের মুখে বসাইয়া দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে যে চৌর পঞ্চাশিকার বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা নন্দকুমার নামক এক অর্বাচীন কবির রচনা।

ভারতচন্দ্রের পূর্বে ও পরে বহু কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবি কঙ্ক শ্রীধর, সাবিরিদ খাঁ, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, ও বলরাম কবিশেখর সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের পূর্বেই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গোবিন্দদাসের কাব্যে বীরসিংহের রাজধানী রত্নপুর, সুন্দরের পিতা গুণিসার, মাতা কলাবতী, জন্মস্থান কাঞ্চননগর। কবি কঙ্ককে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি বলিতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"মনে হয় অশিক্ষিত অর্বাচীন পল্লীকবির কাছে কবিকঙ্কণ ণ-কার ত্যাগ করিয়া কবি কঙ্ক হইয়াছে। কবি কঙ্কের কবিতা অর্থাৎ ছড়াটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী মাত্র, বিষয় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী, সত্যনারায়ণ পাঁচালী সপ্তদশ শতকের শেষের পূর্বে উদ্ভূত হয় নাই·· কবি কঙ্ককে বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি মনে করা চরম বিচারমূঢ়তা" (পৃঃ ৮২৮ বা-সা-ই ২য় সং)। শ্রীধর, সা-বিরিদ খাঁ ও বলরাম কবিশেখরের পুথি খণ্ডিত, গোবিন্দদাস ও

কৃষ্ণরামের পুথির রচনাকাল-জ্ঞাপক শ্লোক অতি দুর্বোধ্য, রচনাও দুর্বল এবং পঙ্গু, ইহাদের সহিত ভাবতচন্দ্রেব কাব্যের তুলনা চলে না। ভাবতচন্দ্রের পরেও নিধিরাম আচার্য, দ্বিজ রাধাকান্ত ও কবীন্দ্র বিদ্যাসুন্দব বচনা করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির ধারণা—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দব ভারতচন্দ্র পূর্ববর্তী, কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহাকে ভারত-পববর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য অন্যান্য কবির কথা দূরে থাকুক, শক্তিমান কবি বামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দর প্রতিযোগিতায ভাবতচন্দ্রের কাছে পরাভূত হইযা গিয়াছেন। দীনেশ চন্দ্র সেন ভারতচন্দ্রের অনুকারক প্রাণারাম চক্রবর্তী নামক একজন কবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীব তীবে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন।"[১] ভাবতচন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য সকল বিদ্যাসুন্দব-বচয়িতা সম্বন্ধেই এইকথা প্রযোজ্য।

১ পৃঃ ৫০৫ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

নেপথ্য-বার্তা

রামপ্রসাদ-সমস্যা

শ্যামা-সঙ্গীতের প্রবর্তক কবি রামপ্রসাদ সেন আনুমানিক ১৭২১-২৬ খ্রীষ্টাব্দে হালি সহরে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম ধনী ছিলেন না, কিন্তু পুত্র রামপ্রসাদকে তৎকালোচিত শিক্ষায় সুশিক্ষিত করেন। রামপ্রসাদ যে সংস্কৃত কাব্য নাটক ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সংস্কৃত ব্যতীত ফারসী ও হিন্দী ভাষাও জানিতেন, তদ্-রচিত সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে। তৎকালে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কৃষ্ণনগরের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। রামপ্রসাদের কবিত্বে তিনি মুগ্ধ হন। যাহাতে কবি জীবিকার্জনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে সাহিত্য সাধনা করিতে পারেন, সেইজন্য রাজা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদকে ৫১ বিঘা জমি সনন্দ করিয়া দেন। রামপ্রসাদ তাঁহার কাব্যের বহুস্থলে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। এই উপাধি সম্ভবতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই প্রদত্ত। রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রাজার মনোরঞ্জনার্থে 'বিদ্যাসুন্দর' বা কালিকামঙ্গল রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার প্রদান করেন, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর আদৃত হয় নাই। রামপ্রসাদের প্রতিষ্ঠা হয় উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীতে। কেবল গান নহে, সুরেরও তিনি স্রষ্টা। রামপ্রসাদ প্রবর্তিত শ্যামাসঙ্গীতের বিশিষ্ট সুর 'প্রসাদী সুর' নামে বিখ্যাত। এই প্রসাদী সুর এবং শ্যামা-পদাবলী রামপ্রসাদকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কবি রামপ্রসাদ কয়জন—ইহা লইয়াও পণ্ডিত মহলে বিতণ্ডা দেখা যায়। প্রসাদী সঙ্গীতের ভণিতার মধ্যেই বিতণ্ডার বীজ নিহিত আছে। প্রসাদী শ্যামা-পদাবলীর ভণিতায় 'শ্রীরামপ্রসাদ', 'দীন রামপ্রসাদ', 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ও 'দাস রামপ্রসাদ' দেখা যায়। বলা বাহুল্য, রামপ্রসাদ সেনের স্বহস্ত লিখিত সঙ্গীতের পুথি এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; উল্লিখিত প্রকারের ভণিতা যুক্ত গানগুলি গায়ক কণ্ঠ হইতেই বিভিন্ন সংগ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তথাপি পণ্ডিতমণ্ডলী মনে করেন প্রসাদী গানের ভণিতাভেদ বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ।

রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশজাত ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তিনি 'শ্রী' বা 'দীন' লিখিতে পারেন, কিন্তু অব্রাহ্মণ হইয়া 'দ্বিজ' বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিবেন, ইহা কোন কোন পণ্ডিত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সেইজন্য কিছুদিন যাবৎ দ্বিতীয় রামপ্রসাদের অনুসন্ধান কার্য চলিয়াছিল। দয়াল চন্দ্র ঘোষ, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতকের ব্রাহ্মণবংশীয় কালী-সাধক একজন 'রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী'কে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ ঢাকা বিক্রমপুরের ভরাকৈ গ্রামের কিংবা মহেশ্বরদি পরগণার চিনিশপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রচাব করিয়াছেন, এই দ্বিজ-রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' সেন-রামপ্রসাদেব প্রায় সমসাময়িক, বরং কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠই ছিলেন; সেন-রামপ্রসাদের কন্যাব ন্যায ইহাবও কন্যার নাম ছিল জগদীশ্বরী এবং ইহাকে অবলম্বন কবিয়াও দেবী কালিকার বেড়াবাঁধার অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল। দীনেশ বাবুব ধারণা—যেহেতু এই পূর্ববঙ্গীয় রামপ্রসাদ কালীভক্ত এবং 'দ্বিজ', সেইজন্যই প্রসাদী শ্যামাসঙ্গীতের 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই ইহার রচনা, পশ্চিমবঙ্গেব বৈদ্য রামপ্রসাদ কালক্রমে এইগুলি অপহবণ করিয়া বসিয়া আছেন। যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণ বামপ্রসাদের হস্তলিখিত অথবা তাঁহার অনুলিখিত কোন পুরাতন পুথি পূর্ববঙ্গ হইতে পাওয়া যায় নাই, কাজেই ব্রাহ্মণ বামপ্রসাদের কবিত্ব সন্দেহজনক ও অপ্রামাণিক; তাহার উত্তরে দীনেশবাবুব পক্ষের পণ্ডিতগণেব বক্তব্য—'দ্বিজ বামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত পদগুলি যে বৈদ্য-রামপ্রসাদের তাহার প্রমাণ কোথায়? ভণিতার 'দ্বিজ' শব্দই প্রমাণ কবে যে ঐগুলি ব্রাহ্মণ-রচিত এবং বৈদ্য কবির দ্বারা অপহৃত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামপ্রসাদগবেষক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বিশ্বাস যে দ্বিজ-ভণিতাযুক্ত হউক আব না-হউক, যে সকল প্রসাদী পদে পূর্ববঙ্গের ভাষা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলি পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদেরই রচনা, পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্য-রামপ্রসাদের নহে। আবার অপব পক্ষে পূর্ববঙ্গের ঐতিহাসিক বৈদ্যবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বৈদ্যেরা অব্রাহ্মণ নহে, এবং সেন-রামপ্রসাদেব দ্বিজ-ভণিতা গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল; কাজেই দ্বিজ-ভণিতা যুক্ত পদগুলি সেন-রামপ্রসাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি, উহাতে ভাগ বসাইবাব কোন অধিকার ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের নাই। তাছাড়া পূর্ববঙ্গবাসী

সাহিত্যিক "রামপ্রসাদ" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীঅতুল প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন—"চিনিষপুবের রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী আমাদের চিব নমস্য। তিনি সিদ্ধ হইয়া যে তথায কালীস্থাপনা করিয়াছেন, ইহাতেও সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু কবিরঞ্জনের নামের সহিত তাঁহাব নামেব সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই যে তাঁহার বিষয়ে কতকগুলি প্রবাদ ও স্বপ্নমূলক আধ্যাত্মিক। রচনা কবিয়া তাঁহাকে পদকর্তা বামপ্রসাদ বলিয়া সাজাইতে হইবে, আধুনিক সাহিত্যিক লুপ্তরত্নোদ্ধাবেব নিযমাবলীতে এইরূপ কোন বিধি লিপিবদ্ধ হয় নাই।"

কবি রামপ্রসাদেব একাধিকত্ব সম্বন্ধে উল্লিখিত বিতণ্ডা কিন্তু সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে পর্যন্ত প্রামাণিক পুথিব আবিষ্কাব না হইতেছে, সে পযন্ত কোন একটি গানের প্রকৃত ভণিতা সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। প্রসাদী সঙ্গীত এ-যাবৎ গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে চলিযা আসিয়াছে, কোন্ গানটির কী ভণিতা ছিল, বর্তমান অবস্থায় তাহা নির্ণয় করাই সম্ভব নহে, কাবণ গায়ক-কণ্ঠে "দীন রামপ্রসাদে বলে" সহজেই "দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে" হইয়া যাইতে পাবে। তাছাড়া কবি-রঞ্জনের দ্বিজ-পরিচয়ও অস্বাভাবিক নহে, বৈদ্য জাতি ব্রাহ্মণ হউন আর না হউন, জাতি বর্ণ নির্বিশেযে অধ্যাত্মসাধক মাত্রেই যে দ্বিজ-উপাধি ব্যবহাবের অধিকাবী, একথা শাস্ত্র-সম্মত। "সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে"—একথা অস্বীকাব করা চলে না। কাজেই দ্বিজ-শব্দকে ভিত্তি কবিয়া প্রসাদী পদাবলীব পদকর্তা সম্বন্ধীয় সন্দেহ ও বিতণ্ডা চলিতে পাবে না। তাছাড়া কেবল ভাষা বিচাবেব দ্বারা সঙ্গীত বিশেষের কবি-নির্ণয়ের পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নহে, কাবণ স্থানকালভেদে একই গানেব শব্দগত উচ্চারণ-ভেদ ও পাঠান্তব অসম্ভব নহে। হাস্যরসিক রাজশেখর বসুব দ্বারা বিকৃত—"বৈরাগ্ সাধন-যোগ সো হমার নেহি।"—এই পংক্তির শব্দগুলি হিন্দী হইলেও মূল পংক্তিটি বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথেরই বটে, কোন হিন্দী কবিব নহে। পশ্চিমবঙ্গীয় রামপ্রসাদের পূর্ববঙ্গীয় সংস্করণও অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নহে। পূর্ববঙ্গীয় রামপ্রসাদ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ প্রণিধান যোগ্য :—"(প্রসাদী সঙ্গীতের) দ্বিজ চিহ্নিত কোন পদে দৃষ্টিভঙ্গীব পার্থক্য বা সাধনাস্বাতন্ত্র্যেব কোন ইঙ্গিত আবিষ্কাব করা কঠিন।…(পূর্ববঙ্গীয় রামপ্রসাদ) অপর রামপ্রসাদের সমকালীন হইলে ও প্রায় তুল্যরূপ জনপ্রিয় হইলে

লোকের মুখে মুখে তাঁহার অনেক পদ প্রচলিত থাকিত ও উহাদের ব্যাপক বিলুপ্তি সম্ভব হইত না।"[১]

শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা অন্যান্য কবিদের মধ্যে "সাধক রঞ্জন" গ্রন্থ প্রণেতা সাধক কমলাকান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি "১৮০০ খ্রীঃ অব্দে অম্বিকাকালনা হইতে বর্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বর্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।"[২] ইঁহার পরেই স্থান দিতে হয় 'প্রেমিক' নামে বিখ্যাত সাধক মহেন্দ্র ভট্টাচাযকে।

"বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন শাক্ত। এই সকল জমিদার বংশের অনেক রাজা, মহারাজা, কুমার শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ রামকৃষ্ণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। পরবর্তীকালে মহারাজ মহাতাপ চাঁদ, মহারাজ শিবচন্দ্র রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা মহেন্দ্রনাথ খাঁ, কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় ইত্যাদি ভূস্বামিগণ পদ রচনা করিয়াছেন। রাজা মহারাজাদের দেওয়ানরাও পদ রচনা করিতেন। দেওয়ান রঘুনাথের পদও সর্বজন পরিচিত। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রচিত পদও পাওয়া যায়।"[৩] মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন কবি মূর্জা হুসেন আলি এবং আধুনিক কবি কাজি নজরুল শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

---

১ ভূমিকা পৃঃ ১৷/০ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য)

২ পৃঃ ৫২৭ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩ ৩৯২ প্রা-ব-সা. (৩য়-৪র্থ খণ্ড) কালিদাস রায়

উনবিংশ অধ্যায়

বাউল সঙ্গীত

বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে বাউল সঙ্গীত। ভাষা ভঙ্গী ও সুরের এতখানি সরলতা, সাবলীলতা ও বাঙ্গালীভাব বাংলার অন্য কোন সঙ্গীতে দেখা যায় না। বাউল সুর মৌলিক এবং বঙ্গজ। ইহা লঘু, তরল ও দ্রুতলয় বিশিষ্ট, স্বভাবধর্মে গ্রাম্য। শ্যামাসঙ্গীতের প্রসাদী সুর এই জাতীয় বটে কিন্তু এতখানি লঘু ও তরল নহে। উহাতে অধ্যাত্ম-মহিমা বর্তমান। উহা ভাষায় লঘু কিন্তু ভাবে গম্ভীব, এমন কি প্রয়োজন হইলে সাধুভাষাব ভারও বহন করিতে পারে। তাছাড়া প্রসাদী সুর কখনই নাচে না। কিন্তু বাউল সঙ্গীত সর্ববিধ ভার হইতে মুক্ত, ইহার সুর সহজ প্রাণের সুর, অমার্জিত পল্লীভাষাব নিত্য-সহচর, তাছাড়া নৃত্য-সহচরও বটে। গানের সময়ে বাউল একতারা বাজাইয়া নাচিয়া উঠে। ইহাব কাবণ নৃত্য-তালেই বাউল সঙ্গীত রচিত। কবিতাব চরণের পূর্বে 'স্বগত' উক্তিরূপে তিন বা দুই মাত্রার শব্দ ব্যবহার বাউল সঙ্গীতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, ইহাতেই গানে নৃত্যবেগ আসে। যেমন—

(আছে যার) মনের মানুষ আপনমনে—
(সে কি আব) জপে মালা ?
নির্জনে সে
বসে বসে দেখছে খেলা।
(কাছে রয়) ডাকে তারে
উচ্চ স্বরে
কোন পাগেলা।
(ওবে) যে যা বোঝে
তাই সে বুঝে থাকে ভোলা।
(যেথা যার) ব্যথা নেহাৎ
সেইখানে হাত ডলা মলা।
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা॥

গঠন গুণেই ইহার মধ্যে একতারা যন্ত্রের "গাব্ গুবা গুব্" ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে এবং ইহারই তালে তালে ভাষা নাচিতেছে।

বাউল হইতেছে বঙ্গদেশের একটি বিশেষ সাধক-সম্প্রদায়। বাউল সঙ্গীত ইহাদেরই সাধন সঙ্গীত। "আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউল ধর্ম এক পূর্ণরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।"[১] হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনে বাউল্ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। উভয় সম্প্রদায়েরই বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বাউলেরা প্রচার করেন যে সর্বসংস্কার মুক্ত সহজ জীবন বরণ করাই বাউল সাধনার বৈশিষ্ট্য। সহজ হইবার জন্য সর্ববিধ সামাজিক নীতি ইহারা অস্বীকার করেন। ইহাদের জীবন অনেকটা উন্মাদের ন্যায় অসামাজিক বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় 'বাউল' (বাতুল) বা আউলিয়া (আরবী 'ওয়ালিয়া' বা দেওয়ানা)। আশ্চর্যের বিষয় ইহারা নিজেরাও আপনাদিগকে পাগল ও ঘৃণ্য বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। বাউল গানের ভণিতায় দেখা যায় কবিরা অকারণে আপনাদিগকে 'ওঁছা' 'বোঁচা' 'নচ্ছার' 'মেড়া' 'ভেড়া' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক বিশেসণে লাঞ্ছিত করিয়াছেন[২] স্বেচ্ছায় 'দীনুক্ষ্যাপা', 'রেজো ক্ষ্যাপা' 'কাঙাল ক্ষেপা চাঁদ' ও 'পাগলা কানাই' আপনদিগকে উন্মাদ প্রচার করিয়াছেন, এমন কি সুপণ্ডিত বাউল মতিলাল সান্নালও স্বরচিত গানে নিজেকে 'হাউড়ে (পাগল) গোঁসাই' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই প্রকার আত্মাবমাননা স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। ইহাকে বৈষ্ণবীয় দীনতা বা বিনয়ও বলা চলে না, কারণ বাউলের সাধনা বৈষ্ণব ভক্তিসাধনা বা দাস্যভাব সাধনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতপক্ষে বাউলের আত্মাবমাননা অভিমানজাত একপ্রকার অহমিকার ছদ্মরূপ। ভদ্র সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও তির্যক ব্যঙ্গ এই আত্মনিন্দার মধ্যে নিহিত আছে। সত্য সত্যই

১ পৃঃ ২৮৯ বাংলার বাউল ও বাউল গান (ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)

২ (ক) লালন 'ভেড়ে'র লোক জানানো হরি বলা

(খ) (দিলে) মোয়ান ভাড়া মূর্খ 'মেড়া'
(আপনার) দোষে মোল্লা

(গ) (জগতে) জেলে 'ওঁছা'
(এ যাদু) বিন্দু 'বোঁচা' —ইত্যাদি

নিজেদিগকে তুচ্ছ বা উন্মাদ বলিয়া বিশ্বাস করিলে ইহারা কখনই অন্য ধর্মের অসারতা ও স্বধর্মের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতেন না। সহজতার অহংকার বাউল সঙ্গীতে সুস্পষ্ট, এইজন্যই কবি পদ্মলোচন নিজের নাম বিকৃত করিয়া বলিয়াছেন—'পোদো', কুবের হইয়াছেন 'কুবীর' এবং নিত্যানন্দ সাজিয়াছেন 'নিতে'।

বাউলেরা সাধারণতঃ আপনাদিগকে 'সহজ মানুষ' বলিয়া প্রচাব করেন। কিন্তু বাউল সঙ্গীত আসলে সহজভাব বা সুস্থ মনের সাহিত্য নহে। বাউলধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই অসুস্থতার কারণ নিহিত। ইহাদের সাধনা গুরুকেন্দ্রিক 'চক্রে' গোপনভাবে অনুষ্ঠেয়। এই সাধন প্রক্রিয়া সমাজবিরোধী, সভ্যতা-বিরোধী, জঘন্য, উৎকট ও ভয়ঙ্কর। 'চাবি চন্দ্র-ভেদে'র নামে বিষ্ঠাভক্ষণ এবং মূত্র শুক্র ও স্ত্রী-রজ পান ইহাদের সাধারণ সাধন-পদ্ধতি। তাছাড়া সক্ষম সাধকেরা 'পঞ্চবাণ-সাধনা'র নামে নারীদেহ লইয়া নিষ্ঠুরভাবে ছিনিমিনি খেলা খেলিয়া থাকে। কাজেই বাউলেরা যে জন-সমাজে ঘৃণিত হইবেন ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। ঘৃণার প্রতিক্রিয়ারূপে প্রতিহিংসার উদ্রেক স্বাভাবিক, অথচ সমাজবদ্ধ বিপুল জনসাধারণের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় বাউলের প্রতিহিংসা প্রকাশ সম্ভবপর নহে। ধর্মপ্রচারার্থে বিশেষতঃ জীবিকার্জনের জন্য সমস্ত প্রতিহিংসা মনের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া বাউলদিগকে সামাজিক লোকেরই দ্বারস্থ হইতে হয়। মনের দুঃখ মনে রাখিয়া বাউলদিগকে হাসিমুখে প্রচার করিতে হয় যে তাহারা মানাপমানের ঊর্ধ্বে জীবন্মুক্ত আনন্দময় পুরুষ। এইজন্যই বাউলদিগকে একতারা বাজাইয়া নাচিতে গাহিতে হয়। নিজেদের গরজে মনের জটিল পীড়িত অবস্থাতেই ইহাদের সঙ্গীত রচনা। নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে এই সঙ্গীতের দ্বারাই নির্বোধ মুক্তিলোভীদিগকে ভুলাইয়া ইহাদিগকে শিষ্য-সংগ্রহ করিতে হয়। এইখানেই রহিয়াছে বাউল গানের উৎপত্তির ইতিহাস।

নিপীড়িত মনের সাহিত্য বলিয়া বাউল গানের অনেকগুলিই অভাবাত্মক 'ভাঙার গান'। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের নিন্দাই ইহাদের উদ্দেশ্য। অবশ্য ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া নহে, হিন্দু-মুসলমানের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধেই বাউলের আক্রোশ—

(ব্রেথা তারে) খুঁইজে মরা
(মাটির এই) বৃন্দাবনে।...
ব্রেথা সে য- মুনার কূলে,
ব্রেথা সে ক- দম্ব মূলে,
ব্রেথা কুঞ্জে মরিস ঘুরে দেখনা চেঞে আপন মনে॥

কিংবা—

(তোমার) পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে
মসজিদে।...
পুরাণ কোরান তসবী মালা,
হায় গুরু এই বিষম জ্বালা,
কাঁ্যাইন্দ্যা মদন মরে খে-দে॥

এই সকল গানে কেবল একদেশদর্শী নিন্দামূলক 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' লক্ষণীয়, তীর্থযাত্রা ও মন্দির প্রতিষ্ঠানাদির অসারতাই প্রচার করা হইয়াছে। বাহ্য উপাসনা যে আন্তর উপাসনার বহিঃপ্রকাশ—বাহ্য পূজা যে মানস পূজারই প্রাথমিক সোপান, তাহা বাউল কবি বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, প্রতিহিংসার অন্ধতা না থাকিলে বুঝিতে পারিতেন—তাঁহাদের নিজেদের সাধনাও অনুষ্ঠান-মূলক। নিজেদের জঘন্য অনুষ্ঠানেরও মহিমা কীর্তন করিতে তাঁহাদের বাধে নাই—

'চার চন্দ্রে'র নিরূপণ
জান্‌গা মন তার বিবরণ
জানলে পরে জীবদেহেতে ঘুচে যেত কুমতি।

বাউল সাধনা হঠযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হঠযোগ আসলে বৌদ্ধসাধনা। বৌদ্ধ পাল রাজাদিগের সময় হইতে ইহা বঙ্গদেশে চলিয়া আসিতেছে। কখনও বৌদ্ধ সহজিয়া, কখনও বৈষ্ণব সহজিয়া, কখনও বা নাথ-ধর্ম রূপে ইহার প্রকাশ হইয়াছে। বাউল ধর্ম ইহারই সুপরিণত রূপ। হঠযোগ মূলে বৌদ্ধ বলিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দু সাধনার সম্পূর্ণ বিরোধী। হিন্দু সাধনা মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক মনে করিলেও দেহবাদী নহে; দেহের ঊর্ধ্বে মন, মনের

ঊর্ধ্বে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আত্মাকে স্বীকার করে।[১] বৈরাগ্য ও অভ্যাস অবলম্বনে জ্ঞান, ভক্তি অথবা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা স্থূল জড় জগৎ হইতে সূক্ষ্ম আত্মিক জগতে উন্নতিই হিন্দু সাধনার উদ্দেশ্য। হঠযোগ সাধনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা কায়া-কেন্দ্রিক, স্থূল জড় দেহই ইহার একমাত্র অবলম্বন। মানবের জড় দেহের সার বস্তু শুক্র। সেইজন্য হঠযোগ সাধনা আসলে শুক্র-সাধনা। শুক্রকে দেহের মধ্যে স্থিরীকৃত করিতে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বা 'কুম্ভক' কৌশলেব প্রয়োজন। নাথ-ধর্ম দৈহিক অমরতা প্রার্থী, সেইজন্য কম্ভকের সাহায্যে উর্ধ্বরেতা হওয়াই নাথধর্মের লক্ষ্য এবং নারী অতি ঘৃণ্য পদার্থ। সহজিয়া এবং বাউলও শুক্র-সাধক, তবে 'মহাসুখ-প্রার্থী—ইন্দ্রিয়সুখ ইহাদের প্রয়োজন, সেইজন্য পরকীয়া নারী ইহাদের সাধন-সঙ্গিনী। ইহারাও কুম্ভকের সাহায্যে শুক্র স্তম্ভন করিয়া নারী সঙ্গ করে। বৈষ্ণব সহজিয়ার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের অনুকরণে প্রেমের সাধনাও আছে, কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউলের কাছে স্নেহ-মমতা মানসিক দুর্বলতা মাত্র, ইহাদের মতে শুক্রের অধোগমনের নাম কাম এবং উর্ধ্বগমনের নাম প্রেম। নারী ইহাদের কাছে কেবল ইন্দ্রিয়-বিলাসের উপকরণ মাত্র। ইহারা শ্বাস প্রশ্বাস ও পেশী-সংকোচন প্রক্রিয়ায় প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুগ্ধাদি তরল পদার্থ শোষণের অভ্যাস করে, পরে নারী সঙ্গম করিয়া ইন্দ্রিয়পথে নারী-রজকে নিজের দেহের মধ্যে টানিয়া লয় এবং একটা উৎকট স্নায়বিক উত্তেজনা উপভোগ করে। উহাদের বিশ্বাস এই উত্তেজনাই মুক্তাবস্থার আনন্দ বা 'মহাসুখ'। উহারা বিশ্বাস করে যে বায়ুর আকর্ষণে পুংশুক্র ও স্ত্রী-রজ উল্টাপথে দেহ মধ্যবর্তী বিভিন্ন কাল্পনিক চক্র ভেদ করিয়া মস্তক পর্যন্ত যায়। ইহাই সাধক-দেহে যুগল-মিলন বা 'মহাযোগ'। এই মিলন-সাধনই সক্ষম বাউলের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহারই অপর নাম 'বাণ-সাধনা। এই সাধনা নারীর পক্ষে সম্ভব নহে, ফলে হত-ভাগিনী নারী ধর্ষিতা হয় মাত্র, গর্ভধারণ্ করিয়া তাহার জননী হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। ইহাই সংক্ষেপে বাউলের গূহ্য সাধন-তত্ত্ব। ইহা

১ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা ৩ অঃ ৪২ শ্লোক

সহজিয়াদেরও তত্ত্ব। এই তত্ত্ব না বুঝিলে অধিকাংশ বাউল গানের অর্থ বুঝা সম্ভব হয় না। যেমন—

দেখবি যদি চিকনকালা শ্বাসের মালা জপ' না।
মনরে ভোলা, কাঠের মালা জপলে জ্বালা যাবে না॥

কিংবা—

দেখবি যদি 'সোনার মানুষ' দেখ্‌সে তোরা আয়।
... ...
আত্মায় আত্মা মিশায়ে
দু' আত্মায় এক আত্মা হয়
(তারা) দমের ঘরে বসত করে নিত্য-বৃন্দাবনে যায়॥

[সোনার মানুষ = সিদ্ধ বাউল, দম — কুম্ভক]

বাউল কবিতা সাধারণতঃ রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। কিন্তু এই রহস্য বুদ্ধিগত, অতীন্দ্রিয় মিষ্টিক কবিতার রহস্যের ন্যায় ভাব-গত নহে। সেইজন্য ইহাকে রোমান্টিক কবিতাই বলা উচিত। অর্থের দিক দিয়া মিষ্টিক কবিতাও অস্পষ্ট বটে, তবে তাহার কারণ স্বতন্ত্র। মিষ্টিক কবিতার ভাষাগত অর্থ অনির্বচনীয়, কিন্তু বাউল কবিতার অর্থ 'অকথ্য'। অবশ্য ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব বাউল কবিতায় স্পষ্টতাই স্বাভাবিক। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ইহাতে থাকিতে পারে না, তথাপি কবিতায় সাধনা-সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষণ বাউল কবির পক্ষে নিরাপদ নহে। সেইজন্য তত্ত্ব, ক্রিয়া ও অবস্থা বুঝাইতে 'মহাযোগ' 'ত্রিবেণী' 'অম্বুবাচি' 'রাগ' 'চন্দ্র' 'রস' 'ফুল' 'ক্ষীর' প্রভৃতি ভদ্র শব্দের সংকেতে বাউল কবিতাকে রহস্যায়িত করা হইয়াছে—"বুঝ সাধু যে জান সন্ধান"। দ্বিতীয়তঃ রোমান্টিক কবি-কল্পনার দ্বারা কবিতা রহস্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। বাউল কবি মানব-দেহকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দেহ যেন অলকা-পুরী, ইহাতে বিচিত্র আলোক, বিচিত্র ধ্বনি, বিচিত্র সরোবর, পদ্মবন ও আয়না-নির্মিত শীষ্‌-মহল বর্তমান এবং তাহার মধ্যে এক অচিন পুরুষের বাস—

(আমি) একদিনও না দেখিলাম তারে।
(আমার) বাড়ীর কাছে আরশী-নগর এক পড়শী বাস করে॥

এই দেহ-নগরীর অভ্যন্তরে—

(আট) কুঠারি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
(তার) উপর আছে সদর কোঠা আয়না-মহল তায়।
খাঁচার মাঝে অচিন পাখী ক্যামনে আসে যায়॥

বাউল-সাধনা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিপরীত উল্টা-সাধন, সেইজন্য—

(সে দেশের) উল্টা কথা
(ফুলে খায়) ফলের মাথা
(হুঙ্কারে) ঝুলছে লতা
(আজব) তরু তলে।

বাস্তবতা-বর্জিত কাল্পনিক তত্ত্বের আকাশ-কুসুম রসিক মনে আনন্দের উদ্রেক করিলেও স্থায়ী করিতে পারে না। বাউল গানে দেখা যায়—অবিরত একঘেয়ে তত্ত্বের রূপায়ণে কবি-মনও মধ্যে মধ্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য তত্ত্বকে সম্মুখে শিখণ্ডীর মতো স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চাতে জীবন-সত্যকেও প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্ববহুল বাউল সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে সেইজন্য বাংলার পল্লী-চিত্র দেখা যায়। যেমন মাছ ধরার ছবি—

(যদি হয়) ভাবুক জেলে
(ধর্ম মাছ) ধরতে পারে
(গুরু ভাব) ভক্তি-জালে।
(সদা সু-) সঙ্গে থাকে,
(পড়ে না) মায়ার ফাঁকে
(চলে সে) ফাঁকে ফাঁকে
(গুরুর ঐ) কৃপা বলে॥

কিংবা ঢেঁকিতে ধান-ভানার চিত্র—

(ওগো) সুখের ধান ভানা।
কর প্রেমের ভানা কুটা কষ্ট তোমার থাকবে না॥
(তোমার) দেহ ঢেঁকশালে
(অনুরাগ) ঢেঁকি বসালে

(আবার) ভজন সাধন দুটো পাড়ুই দুদিকে দিলে
(ঢেঁকি) চলবে ও সে টলবে না ॥

তাছাড়া বাউল জীবনের ট্রাজেডির চিত্রও আছে। বাউল ধর্মের মধ্যেই এই ট্রাজেডির বীজ নিহিত—

(দেহে) কাম থাকিতে সময়েতে রস্ ভিয়ান করো।

ইহাই বাউল ধর্মের নির্দেশ। বার্ধক্যে এই সাধনা বিড়ম্বনা মাত্র। অথচ বৃদ্ধত্ব অপরিহার্য। এইখানেই ট্রাজেডি। পদ্মলোচনের গানে এই ট্রাজেডিই ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ভাঙা ঘরে টিকবে কিরে রসের মানুষ আর !...
দৈব মায়া ঘটে যার সনে—
(যেমন) নারিকেলের জল আসে যায় কেবা তা জানে ?
(তার) গুটি পোকায় গুটি বাঁধে আপন মরণ ক'রে সার ॥

স্বাভাবিক হিন্দু-জীবনে নারী সহধর্মিনী এবং জীবনের সর্ব অবস্থাতেই পরম আশ্রয়, কিন্তু সাধনার্থে গৃহীতা নারী বাউলের বৃদ্ধাবস্থায় একটা ভয়ঙ্কর অভিশাপ—

(একটা) বিষম সাপিনী—
মনের সাধে দুগ্ধ দিয়ে পুষলাম কাল ফণী।
(তার) নিঃশ্বাসে বয় বিষের ধোঁয়া
(আমায়) খায় কি রাখে ভাবছি আর।
(ওরে) ও পোদো নচ্ছার
(কি) করলি রে গোঁয়ার !
(তোর) মস্তকে দংশেছে ফণী—তাগা বাঁধা হলো সার।
ভাঙা ঘরে টিকবে কিরে রসের মানুষ আর ॥

এই গানে বাহিরের একতারা-বাদ্য ও নৃত্যধ্বনি ভেদ করিয়া বাউল-জীবনের নিঃশব্দ হাহাকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাউল গানের অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ নহে। বাউল জীবনের ব্যর্থতা-জ্ঞাপক মাত্র দু'একটি পদই প্রকৃত কবিতা হইয়া উঠিয়াছে, উপরি-উদ্ধৃত পদ্মলোচনের পদ উহারই একটি দৃষ্টান্ত। দুঃখের বিষয়, তত্ত্ব-প্রচারের মোহে বাউল কবি

হৃদয়ভাবের উদ্দীপক বিষয়গুলি উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ঈশ্বর ভক্তিই সাধন-সঙ্গীতের অবলম্বন; কিন্তু 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—সহজিয়ার এই নাস্তিক বাণী গ্রহণ করিয়া বাউলেরা জগদীশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। উহাতেই ভক্তিভাবের গোড়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য 'মনের মানুষ' বা 'সাঁই'কে বাউলেরা ব্যক্তিগত 'জীবন-দেবতা' রূপে কল্পনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বাউলেরা রবীন্দ্রনাথের মতো অথবা বৈষ্ণব সহজিয়ার মতো প্রেমাস্পদ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। 'মনের মানুষ'কে 'মনের কথা' বলাই স্বাভাবিক; কিন্তু ইনি নামেই মনের মানুষ কাযতঃ 'দেহের মানুষ'। বাউলও ইহাকে না করিয়াছেন ভক্তি না দিয়াছেন ভালোবাসা। অবশ্য কবি লালন ফকির এই 'সাঁই'কে বলিয়াছেন—'দীন দরদী'—

(কোথা) দীন-দরদী সাঁই!

কিন্তু 'সাঁই'এর প্রতি অনুরাগ-ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় নাই, কারণ কবির উদ্দেশ্য গুরু-বাদ প্রচাব, তাই দ্বিতীয় চরণেই—

চেতন-গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই!

তাছাড়া সাঁই নামে মাত্র 'দীন-দরদী', সমগ্র বাউল-সঙ্গীতে তাঁহার দরদের কোন চিহ্ন নাই, সর্বত্রই ইনি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা। লালনের গানেও—

চক্ষু আঁধাব দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই বসে নিগম ঠাঁই।
(কোথা) দীন দরদী সাঁই॥

'রক্তকরবী'র রাজার মতোই এই সাঁই বাউল গানে অন্তরাল-বাসী—"(আমি) একদিনও না দেখিলাম তারে।" সেইজন্য কবিও তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন।

তবে ব্যতিক্রমও আছে। উপেন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত পাঁচশতাধিক বাউল গানের মধ্যে এমন একটি গান আছে যেখানে বাউল ধর্মের ঈশ্বর-বিরোধী জবরদস্তি অস্বীকার করিয়া সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ঈশ্বর-ভক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাউল কবি শেষ পর্যন্ত 'মনের মানুষকে' ঈশ্বরার্থেই ব্যবহার

করিয়া ফেলিয়াছেন ; জীবন-সমুদ্রে দিশাহারা ও বিপর্যস্ত হইয়া ঈশ্বরের হাতেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন—

(আরে) মন মাঝি, তোর বৈঠা নে রে
(আর) বাইতে পারলাম না।
(আমি) জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা,
(তবী) ভাইটায় বই আর উজায় না॥
(ওবে) জাঙ্গি রসি যতই কষি হাইলেতে জল মানে না।
(নায়ের) তলী খসা গুরা ভাঙ্গা
(নাও) গাবগায়ানি মানে না॥

[জাঙ্গি রসি=দড়াদড়ি, তলী=তলা, গুরা=গোড়া, গাবগায়ানি=জলরোধক প্রলেপ]

এই জীবন-নৈরাশ্য ও ঈশ্বরার্পণের গভীর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করিয়া এই গানের মধ্যে বাউল কবি তাঁহার বাউলত্ব ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং হইয়া উঠিয়াছেন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ। সেইজন্যই এই রচনা হইয়া উঠিয়াছে সুন্দর ও সার্থক কবিতা।

বাউল সম্বন্ধীয় আলোচনায় উনবিংশ শতাব্দীর নকল বাউল কবিতার কথা না বলিয়া পারা যায় না। উনবিংশ শতকে বাউল সুরের অনুরাগী কয়েকজন সুশিক্ষিত কবি শৌখিন বাউল কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইঁহারা কেহই বাউল ধর্মের সাধক বা বাউল-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে হরিনাথ মজুমদার 'কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ' নামে এবং গোলক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দীন বাউল' নামে অনেকগুলি বাউল সুরের গান রচনা করেন। এই সকল গানে বাউল ধর্মতত্ত্ব বা সাধনতত্ত্বের কিছুই নাই, তৎপরিবর্তে আছে চিরন্তন হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসাধনার কথা। বাউল সুরের জন্য অনেকে এইগুলিকেই আসল বাউল গান মনে করিতেন। এইজন্য হরিনাথ মজুমদারের—

বাঁশের দো- লাতে চেপে কে হে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।

কিংবা—

সাধের খাঁচা—পড়ে রইল তোর।

প্রভৃতি গানের সংসার-বৈরাগ্যকে খাঁটি বাউল-তত্ত্ব মনে করিয়া স্বয়ং দীনেশচন্দ্র

সেন লিখিয়াছিলেন—"বাউল দুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাজকে সংসার বিমুখতায় দীক্ষিত করিল·· বাউল শুধু মড়াকান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়।"১

বাউল সুরের মোহে কেবল দীনেশচন্দ্র নহেন, অধিকাংশ বাঙালী পাঠকই কয়েকটি কৃত্রিম গানকে বাউল সঙ্গীত ভাবিয়া বহুকাল যাবৎ বিড়ম্বিত হইয়া আসিয়াছেন। খাঁটি বাউল-তত্ত্ব ভদ্রসমাজে না জানা থাকায় এই ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। আশ্চর্যের কথা, রবীন্দ্র-পার্ষদ সুপণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বাউল সুরে রচিত কয়েকটি সঙ্গীতকে খাঁটি সঙ্গীত বলিয়া প্রচার করেন। এইগুলি চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিতা-সংগ্রহ-গ্রন্থ "বঙ্গবীণা"য় প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত চরণের গানগুলি সুবিখ্যাত—

(ক) নিঠুর গরজী—
(তুই কি) মানস মুকুল ভাজবি আগুনে ?

(খ) হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে যুগ যুগ ধরি।

(গ) ধন্য আমি বাঁশীতে তোর আপন মুখের ফুঁক।

(ঘ) (আমি) মজেছি মনে।

(ঙ) (আমি) মেলুম না নয়ন—

(চ) চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি।

(ছ) ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।

(জ) পরাণ আমার সোঁতের দীয়া। [সোঁতের দীয়া=স্রোতে-ভাসা দীপ]

(ঝ) গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?

বাউল গানের সংগ্রাহক ও বাউল তত্ত্বের গবেষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই গানগুলির প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিয়া পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই গানগুলিকে কৃত্রিম ও আধুনিক বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাউল ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় গানই প্রকৃত পক্ষে খাঁটি বাউল সঙ্গীত। ভুলিলে চলিবে না, প্রকৃত বাউল গান বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত নিরক্ষর গ্রাম্য কবিগণেরই রচনা; কাজেই ইহাতে ইংরেজিযুগের আধুনিক ভাব ও ভাষাশৈলী থাকিতে পারে না। কিন্তু উল্লিখিত গানগুলির মধ্যে এই প্রকার বাউল-বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। উপরন্তু এই গানগুলি অভূত-পূর্ব কবিত্ব সম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন ও সুমার্জিত।

১ পৃ: ৫২২-৫২৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

এই পদগুলি ভাষায় ভাবে ও কবিত্বে এতই উচ্চশ্রেণীর যে এইগুলিকে স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া অনায়াসে চালাইয়া দেওয়া যায়। এইগুলির ভাষা, কল্পনা, রুচি, এমন কি দার্শনিকতাও রাবীন্দ্রিক। উল্লিখিত গানগুলি হইতে উদ্ধৃত নিম্নের চরণগুলি দ্রষ্টব্য—

অরুণ এসে দোলা দিল রাতের শয়নে—(ঙ) গানের অন্তর্গত

[প্রিয়াকে জাগাইতে এই কোমল দোলা দেওয়া]

অচিন ফুলে নদীর কূলে ডাকে গো কারা ?—(জ)

[পুষ্প ভার র এই আহ্বান]

রূপের রসের ফুল ফুটে যায় মরম সুতা কই ?—(চ)

[রূপের মালা গাঁথিবার সুতা]

তারার তলে কেবল চলে নিশীথ রাতের ধারা।—(জ)

[নদীর মত প্রবহমানা রাত্রি

ইহাদের ভাবগত প্রগাঢ় সুমসৃণ ভাষা, লীলায়িত বাগ্‌ভঙ্গি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপূর্ণ কল্পনা-চিত্র কখনই কোন অশিক্ষিত, অমার্জিত গ্রাম্য কবির হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—

তোমার বুকে নিবুম সুখে
জুড়াইয়া গিয়া। (জ) এর অন্তর্গত "সাঁঝের দীপ"

[নিবুম—নিভিয়া যাইয়া সে ত-ভাষা প্রদীপের পরিণতি]

কিংবা—

(আমি) মেলুম না নয়ন—
(যদি) না দেখি তায় প্রথম চাওনে। (ঙ) এর অন্তর্গত

[তুলনীয়—কবীরের "আঁখি ন খোলুঁ রূপতা" এবং "না মৈঁ দেখা ঔর কুঁ"]

এইগুলি গভীরতম ঈশ্বরপ্রেমের কথা, ইহা দেহবাদী ও নিরীশ্বর বাউলের মুখে অসম্ভব। তৃতীয়তঃ বাউল কখনই বলিতে পারে না—"গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?" কারণ ইহা গুরু-বাদী বাউল ধর্মের বিরোধী, এই প্রকার গুরু-বিরোধিতা ব্রাহ্মধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ—

(তোরা) গন্ধে আমায় বল—
বলরে শ্রবণে—
'সে এসেছে, সে এসেছে পূরব গগনে'।—(চ) গান

কিংবা—

কমল বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি ?
নিকষে কষয়ে কমল আ-মরি মরি !
—লীলা বক্তৃতা, কঃ বিঃ (ক্ষিতিমোহন সেন)

কিংবা—

গুরু যে তোর বরণ-ডালা
গুরু যে তোর মরণ-জ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা
(যে) ঝরায় দুনয়ন ! —(ঝ) গান

অথবা—

ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী—
জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী। —(ছ) গান

এইরূপ রাবীন্দ্রিক রচনা প্রাচীন বঙ্গে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। এই সকল গানের কবি যিনিই হউন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।* এই কবিতাগুলিকে প্রাচীন বঙ্গের নিরক্ষর গ্রাম্য বাউলের রচনা বলিলে বিশ্বাস করিতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে বাংলার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা লইয়া বহু কবিই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের আবিভাব এমন একটা কিছু বিশেষ ঘটনা নহে, তাছাড়া রবীন্দ্রত্ব শিক্ষানিরপেক্ষ। বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন পুথির দলিল ব্যতীত ক্ষিতিমোহন সেন-প্রচারিত গানগুলিকে অকৃত্রিম বাউল গান বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

বঙ্গসাহিত্যে বাউল সঙ্গীতের প্রভাব অল্প নহে। বাউল গানের সুর, সংস্কারমুক্ত ভাব এবং অকৃত্রিম সাবলীল ভাষা আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে। 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্যে'র রবীন্দ্রনাথের উপরে বাউল-বাণীর সহজভাবের প্রভাব সর্বাধিক। বাউলের অনুকরণেই 'পত্রপুট' কাব্যে

* অবশ্য সকল বাউল সঙ্গীতগুলি যে ভানুসিংহের নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'ব্রাত্য', 'মন্ত্রহীন', 'জাতিহারা', 'পংক্তিহারা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য এই 'বাউল' রবীন্দ্রনাথের কল্পিত বাউল মাত্র। আধুনিক যুগের কবিতা কীভাবে বাউলগানের ছন্দকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নোদ্ধৃত কবিতা—

(সে আসে) গুনগুনিয়ে—
(চেনে তায়) ভ্রমর চেনে।
(অরসিক) হুল চেনে তার, রসিক চেনে 'রসভিয়েনে'।
(কালো তার) অঙ্গেরি রং,
(মাখা তায়) পরাগ হিরণ,
(চলে যায়) বাজে সারং হিয়ার সোহাগ হাওয়ায় টেনে॥

—সত্যেন্দ্রনাথ।

নেপথ্য-বার্তা

কবি-পরিচিতি

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিনশত বৎসর বাউল গানের উৎপত্তি পরিণতি ও প্রতিষ্ঠার কাল। তবে বাউল গানের অ-সামাজিকতার জন্য বাউলগান ভদ্র-সমাজে বহুকাল উপেক্ষিত ছিল। প্রথম রবীন্দ্রনাথই বাউল গানের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, রবীন্দ্রনাথই বাউল গানের প্রথম সংগ্রাহক; তাঁহার পর বাউল গান সংগ্রহ করেন ক্ষিতিমোহন সেন, মৌলবী মহম্মদ মনসুরউদ্দীন এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মনসুরউদ্দীনের সংগ্রহ 'হারামণি' নামে এবং উপেন্দ্রবাবুর সংগ্রহ 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উপেন্দ্রবাবুর সংগ্রহই বৃহত্তম, বহু বাউল কবির বহু গান ইহাতে সংকলিত হইয়াছে।

বাউল কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। উপেন্দ্রবাবু বহু কবির নাম

করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'লালন সাহ', 'পাঞ্জশাহ', 'পদ্মলোচন', 'যাদুবিন্দু', 'হাউড়ে গোঁসাই', 'রেজোখ্যাপা', 'রসীদ', 'গোঁসাই গোপাল', 'চণ্ডীদাস গোঁসাই', 'লালশশী', 'এরফান শাহ্', 'চণ্ডীদাস গোঁসাই', 'অনন্ত বাউল' প্রভৃতি বিখ্যাত। ক্ষিতিমোহন সেনও কয়েকটি কবির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মদন বাউল, গঙ্গারাম বাউল, বিশা ভুঞিমালী, জগা কৈবর্ত অন্যতম।

লালন শাহই সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল কবি। ইনি সম্ভবতঃ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। লালন সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে—ইনি প্রথমে ছিলেন হিন্দু, জাতিতে কায়স্থ, উপাধি কর। সিরাজ সাঁই নামক মুসলমান ফকীরের কাছে ইনি বাউলধর্মে দীক্ষিত হন। বসন্ত রোগে লালনের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ইনি প্রায় ১১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার বিখ্যাত সংগ্রহ-গ্রন্থে লালনের ১৬০টি গান প্রকাশ করিয়াছেন।

লালনের পরেই উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ বাউল কবি পাঞ্জশাহ্। ইনি যশোহর জেলায় শৈলকুপা গ্রামে ১২৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম খাদেম আলি খোন্দকার। পাঞ্জশাহ্ সুফীতত্ত্ববিদ সাধু হেরাজতুল্যা খোন্দকারের নিকট বাউল ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সেইজন্য মুসলমান সমাজে নেড়ার ফকীর রূপে গণ্য হন। উপেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে পাঞ্জের ৫৪টি বাউল পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

হাউড়ে গোঁসাই বা মতিলাল সান্যাল বর্ধমানের মেড়তলা গ্রামের অধিবাসী বাউল কবি। ইনি শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত এবং উচ্চব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান। ইহার রচিত গ্রন্থ 'তত্ত্বসাধন গীতাবলী'। উপেন্দ্রবাবুর ভাষায় "তাঁহার গানে সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং শিবশক্তি-বাদের গভীর তত্ত্বোপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়।"[১] হাউড়ে গোঁসায়ের আটটি গান উপেন্দ্রবাবুর সংকলনে গৃহীত হইয়াছে।

বাউল কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রেমিক কবি 'যাদুবিন্দু'—ইহার নামের মধ্যেই ইহার প্রেমের পরিচয় রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত নাম যাদব, ইন্দু বা বিন্দু হইতেছেন ইহার সাধন-সঙ্গিনী, কাজেই উভয়ের নাম একত্র যাদবেন্দু সংক্ষেপে যাদুবিন্দু। বর্ধমান জেলার পাঁচলোকি গ্রামে কবির জন্ম। উপেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে ইহার তেরোটি পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১ পৃ. ২২৮ "বাংলার বাউল ও বাউল গান।"

চণ্ডীদাস গোঁসাই হইতেছেন—নবদ্বীপের চণ্ডীদাস-রজকিনী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। লালশশী কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। গোঁসাই গোপাল হইতেছেন শিলাইদহের ব্রাহ্মণ সন্তান রামগোপাল জোয়ারদার। পোদো হইতেছেন পদ্মলোচন। এই প্রকার রেজোখ্যাপা, নিতে খ্যাপা, রশীদ, এরফান শাহ্, অনন্ত বাউল প্রভৃতি বহু বাউল কবির পরিচয় উপেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিংশ অধ্যায়

উমা-সঙ্গীত, কবি-গান, যাত্রা ও পাঁচালী

বঙ্গসাহিত্যের যুগ-পরিবর্তনে অন্নদামঙ্গল কাব্যের গুরুত্ব অসাধারণ। ইহা যুগ-সন্ধির প্রতীক। ইহার মূল 'আখ্যান' অংশে রহিয়াছে মোটামুটি প্রাচীন কাব্যরীতি—দেব-দেবী চরিত্র, স্বর্গমর্ত্যব্যাপী পটভূমি এবং মঙ্গলকাব্যোচিত অলংকরণ পদ্ধতি, আবার এই অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্গত অন্যান্য 'উপাখ্যান'-অংশে, বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ আধুনিক কাব্যরীতি—খাঁটি বাস্তব মানব মানবী চরিত্র, মানসিংহ কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ইন্দ্রিয় বিলাসের বাস্তব চিত্র। মূল অন্নদামঙ্গলে দৈব ঘটনায় বিশ্বাস, জন্মান্তরের সংস্কার, দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি 'ভাব-নিষ্ঠ' প্রাচীন মনোবৃত্তি একেবারে লুপ্ত হয় নাই কিন্তু বিদ্যাসুন্দর-অংশে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়—উপহাস প্রবৃত্তি, সন্দেহ পরায়ণতা, আদর্শে-অবিশ্বাস প্রভৃতি 'বুদ্ধি-নিষ্ঠ' আধুনিক মনোবৃত্তি। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই প্রাচীনতা বিরোধী কাব্যরীতি ও আধুনিক মনোবৃত্তির কারণ চিন্তনীয়। ইহাকে ইংরেজের দান বলা চলে না, কারণ বিদ্যাসুন্দরের জন্ম (১৭৫৩ খ্রীঃ) পলাশী যুদ্ধের পূর্বেই বটে, পরে নহে।* তাহা হইলে এই অভিনব মনোভাব কোথা হইতে আসিল? ইহার একমাত্র উত্তর—আধুনিক মনোভাব স্বভাবজ কালধর্মে উৎপন্ন, ইংরেজি প্রভাবের পূর্বেই স্বাভাবিকভাবে বঙ্গসাহিত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বিদ্যাসুন্দরই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কাব্য। একথা যতই বিস্ময়কর হউক না কেন, ইহাই বাস্তব সত্য। মনোবিজ্ঞান বলে, স্বাভাবিক কোন মনোভাবই অপরের দান হইতে পারে না। মনোভাব বাহির হইতে আসে না, জীবনের ভিতর হইতেই বিকশিত হয়। বাহিরের প্রভাব তাহার বিকাশের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা করিতে পারে, কিন্তু মনোভাবকে সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং কোন দিক দিয়াই আধুনিক মনোবৃত্তিকে ইংরেজের দান বলিতে পারা যায় না। আধুনিক মনোবৃত্তি আসলে অষ্টাদশ শতকের ব্যর্থতাজাত মানস প্রতিক্রিয়া। জাতীয় জীবনের অবক্ষয়ই ইহার মূল কারণ। রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের কপটতা

---

* পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ খ্রীঃ

ও পাপাচরণ, ধনী ব্যক্তিদিগের লাম্পট্য, ভক্তি-সাধনার নামে নেড়ানেড়ির ব্যভিচার, ধর্মগুরুদিগের ভণ্ডামি, রাজকর্মচারীদিগের প্রতারণা ও উৎকোচ গ্রহণ এবং জমিদারগণের প্রজানির্যাতন বাঙ্গালী জাতির মানস বিক্ষোভ ও অসন্তোষের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এই যুগের সাহিত্যে সেই অসন্তোষের জ্বালা প্রচ্ছন্ন আছে। সভাসাহিত্য বিদ্যাসুন্দর, ধর্মসাহিত্য শাক্ত ও বাউল পদাবলী, জনসাহিত্য কবি-খেউড়-পাঁচালী, নগরসাহিত্য টপ্পা এবং পল্লীসাহিত্য মৈমনসিংহ-গীতিকা—ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর অল্পবিস্তর পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ মনের বিচিত্র সৃষ্টি।

একই অন্নদামঙ্গল কাব্যে দুইটি যুগের বৈশিষ্ট্য থাকা অসাধারণ ও বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য ও স্বাভাবিক। ইহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। অবশ্য এ কথা সত্য যে বিপরীত ধর্মী দুইটি বস্তুর একত্র অবস্থান সম্ভব নহে। কিন্তু আধুনিক যুগের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও উহা প্রাচীন যুগের ঠিক বিপরীত নহে। বাল্য যেমন অজ্ঞাতে যৌবনে পরিণত হয়, তেমনি নিঃশব্দে কোন নাটকীয় কাণ্ড না করিয়াই প্রাচীন যুগ আধুনিক যুগে পরিণত হইয়াছে এবং একই ব্যক্তির জীবদ্দশায় দেখা দিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতচন্দ্র হইতে আধুনিক যুগের সূচনা সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন —ইংরেজ প্রভাব-বর্জিত আধুনিক যুগ সম্ভবই হইতে পারে না, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস আধুনিক মনোবৃত্তি ইংরেজেরই দান। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০১ খ্রীঃ) হইতেই আরম্ভ হয় আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রস্তুতি, এবং মাইকেলের মধ্যেই হয় আধুনিক যুগের নবজন্ম। কাজেই ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০ খ্রীঃ) হইতে মাইকেলের আবির্ভাব (১৮৬০ খ্রীঃ-তিলোত্তমা সম্ভব) পর্যন্ত শতবর্ষ হইতেছে বঙ্গসাহিত্যের 'অন্ধ যুগ'। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় কবি-প্রতিভা একশত বৎসর ধরিয়া কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাইয়াছে এবং ইংরেজী প্রভাবের বন্দুকের খোঁচায় জাগিয়া উঠিয়াছে। এই যুগের সাহিত্য সেইজন্য জাগ্রতাবস্থার স্পষ্ট ভাষণ নহে, নিদ্রিতের অস্পষ্ট প্রলাপোক্তি। শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে লিখিয়াছেন—"Generally speaking, from the 18th, century to the middle of the 19th, we have only *rude unshaped* writings interesting to the students, but no masterpiece acceptable

to all"[১] লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'রেনেসাঁস' থিয়োরি ও 'অন্ধযুগ'-তত্ত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য সুশীলবাবু ইংরেজ-প্রভাব-শূন্য রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত, নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত ও মৈমনসিংহ গীতিকার মতো কালজয়ী রচনাকেও 'অমার্জিত' ও 'পঙ্গু' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং 'বিদ্যাসুন্দর'কে প্রাচীন কাব্যের দলে ঠেলিয়া দিয়াছেন। থিয়োরি যতই ভ্রান্ত হউক একবার চালু হইলে অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে। সেইজন্য এইযুগের অন্যতম সাহিত্য 'পাচালী গানে'র আধুনিক গবেষকও না লিখিয়া পারেন নাই—"ভারত চন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে গুপ্ত কবির মৃত্যুকাল পযন্ত শতবৎসর কালকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাত্রিকাল বলিয়া অভিহিত করা যায়।"[২]

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গীয় কবি-প্রতিভা লুপ্তও হয় নাই, গুপ্তও হয় নাই, এরং পুরাতন কাব্যের প্রশস্ত পথ না পাইয়া নূতনতর তেজে শত শত গানের রন্ধ্রপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে প্রথম প্রকাশের পরে বাঙ্গালীর নবজীবন-চেতনা রূপ লইয়াছিল দরিদ্র সমাজের জনসঙ্গীতে। ইহার কারণ অষ্টাদশ শতকের সামাজিক অবক্ষয় দরিদ্র-সমাজকেই বেশী পীড়িত করিয়াছিল। জনসঙ্গীত পীড়িত গণ-মানসের প্রতিক্রিয়া। ইহার মধ্য দিয়া জনগণ আপনাদের মনের ভার অনেকটা লঘু করিয়াছে। এই জনসঙ্গীত প্রধানতঃ চতুর্বিধ—উমা-সঙ্গীত, কবি-তর্জা-খেউড়, যাত্রা এবং পাঁচালী। প্রচলিত প্রথা অনুসারে ইহাদের বিষয় অধিকাংশই পৌরাণিক, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক; পাত্র-পাত্রী উমা, শিব, মেনকা, কৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দা প্রভৃতি; কিন্তু ইহাদের কাহারও পৌরাণিক মহিমা নাই, সকলেই ছদ্মবেশী বাঙ্গালী। ভক্তি-প্রচার নহে, বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টিই ইহাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য বাদ-প্রতিবাদ মূলক উক্তি-প্রত্যুক্তির নাটকীয় ভঙ্গিতেই এই গুলি রচিত হইয়াছে। এইগুলি দেবতার নৈবেদ্য নহে, রাজারও বিলাসোপচার নহে, জনতারই উপভোগ্য বস্তু। ইহাদের স্রষ্টাও জনতা, কারণ জনতার ভাবে আবিষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ গণ-মনেরই ইহারা রচনা। সেইজন্য ইহাদের ভাষা অমার্জিত ও গ্রাম্য, রুচি স্থূল, রচনা শিল্পকলাহীন। ইহারা পৌরাণিক কাহিনীর 'কার্টুন' চিত্র।

১ P. 87, History of Bengali Literature in the 19th Century, 1st. Ed.

২ পৃঃ ১ দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী (হরিপদ চক্রবর্তী)

জনসঙ্গীতে মহিমা নাই, কিন্তু উত্তেজনা আছে, বিদ্রূপ আছে, সমাজ-সমালোচনা ও বাস্তব-সমস্যার ইঙ্গিত আছে। 'কবি সঙ্গীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিগানের এবং দাশুরায়ের সমালোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন পাঁচালীর নিন্দা করিয়াছেন, তাহার কারণ ইঁহারা কবিগানে ও পাঁচালীতে প্রাচীনত্বেরই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, ইহাদের আধুনিকত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। 'কার্টুন' চিত্রে রোমান্টিক ভাব আশা করা অসঙ্গত। ইহার একমাত্র মাহাত্ম্য যে ইহাতে জীবন-সমালোচনা আছে। জনসঙ্গীতে যে হৃদয়-ভাবের কথা একেবারেই নাই তাহা নহে, তবে তাহা গীতিকাব্যের মুখ্য পন্থায় নহে, নাটকীয় গৌণ পন্থায় ব্যক্ত হইয়াছে। উমা-সঙ্গীতে হিমালয়-মেনকার বাদানুবাদে বঙ্গ সমাজের বৃদ্ধ ও দরিদ্র বরে কন্যা সম্প্রদানের বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, কৃষ্ণ-যাত্রায় ও কবিগানে বৃন্দাদূতীর মুখে কৃষ্ণ-তিরস্কারের ছলে পত্নীত্যাগী লম্পটের প্রতি সমাজের ঘৃণা ও ধিক্কার প্রকাশ পাইয়াছে, খেউড় ও পাঁচালী গানে বিবাদী পাত্র-পাত্রীর বাগ্‌যুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন ভণ্ডের ভণ্ডামিকে অনাবৃত করিয়া উপহাস করা হইয়াছে এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় হীরা মালিনীর মুখ দিয়া অভিজাত অন্তঃপুরের কুৎসা রটনায় দরিদ্র সমাজের বিদ্রূপ অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িয়াছে।

জনসাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে সবাগ্রে কবিগানের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। কবিগানই মূল জনসাহিত্য। উমাসঙ্গীত ও খেউড়গান হইতেছে কবিগানেরই পূর্ব পশ্চাৎ অঙ্গ এবং তর্জা, যাত্রা ও পাঁচালী হইতেছে কবিগানের অন্য পরিণত রূপ। কবিগান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পাইতে হইলে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে হইবে। অশিক্ষিত ও গ্রাম্য প্রাণধর্মী জনমণ্ডলীকে সাঙ্গীতিক উত্তেজনার দ্বারা পরিতৃপ্ত করাই কবিগানের উদ্দেশ্য। সেইজন্য ইহার প্রধান অঙ্গ হইতেছে 'লহর' অর্থাৎ গানের মাধ্যমে বাগ্‌যুদ্ধ, ইহার ভূমিকা হইতেছে 'মালসী' বা দুর্গা বন্দনা এবং পরিশিষ্ট হইতেছে 'খেউড়' বা অভদ্র গান। লহরের জন্য পুরাণের কলহমূলক পালাই কবিগানের বিষয় এবং পৌরাণিক পাত্র পাত্রীর ভূমিকায় দুইদলের পরস্পরের অভিযোগ খণ্ডন এবং পাল্টা অভিযোগ প্রদান কবি-গায়কের কার্য। খেউড় ভাষায় অশ্লীল বটে, কিন্তু বিষয়ে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ন্যায় জুগুপ্সাজনক

নহে; ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সঞ্চার নহে, বিদ্রূপাত্মক হাস্য সৃষ্টিই[১] ইহার উদ্দেশ্য। খেউড় ঠিক পুরা অশ্লীল নহে, ইহা সেকেলে এক প্রকার গ্রাম্য রসিকতা মাত্র। কবির লহর উত্তেজনা-মূলক বলিয়া যে সর্বত্র কবিত্ব-বর্জিত তাহাও নহে। অশিক্ষিত হইলেও গোঁজলা গুঁই, রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি কবিওয়ালার রচনায় মধ্যে মধ্যে সত্যকার কবিত্ব দেখা যায়। স্মরণ রাখা উচিত—ইহাদের অধিকাংশ গানই অ-প্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত প্রয়োজনে রচিত। সেইজন্য গানের অঙ্গমার্জনা বা পারিপাট্য সম্ভব হয় নাই। এই গানগুলিতে গভীর অনুভূতি, কবি-কল্পনা বা গঠন-শিল্প আশা করা যায় না, তথাপি ইহাদের রচনায় অজস্র সুন্দর সুন্দর অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষোক্তি দেখা যায়। ইহা কম কথা নহে। হরুঠাকুরের নিম্ন-লিখিত গান দ্রষ্টব্য—

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে···

প্রতিপদের চাঁদো—হরিষে বিষাদো—নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো কিঞ্চিতো প্রকাশো, তৃতীয়ের চাঁদো জগৎ দেখে॥

[প্রতিপদের চাঁদ=একক প্রেম, দ্বিতীয়ের চাঁদ=দ্বৈত প্রেম (নায়ক নায়িকার), তৃতীয়ের চাঁদ=নায়িকা, নায়ক, উপনায়িকা বা উপনায়ক, এই তিন জনের প্রেম]

ইহার শ্লেষোক্তি অতি চমৎকার এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কবি ঈশ্বর গুপ্ত উক্ত গানের শেষ চরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"একথার মূল্য নাই—অতি অমূল্য ধন।"

কবিগানের বিষয়গত কবিত্ব বুঝিতে ভাবমুগ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ঠকিতে হইবে কারণ কবিগানের বিষয় পুরাণ হইতে গৃহীত হইলেও পৌরাণিক নহে, ইহা পৌরাণিকতার ছদ্মবেশে আধুনিক জীবন-সমালোচনা। কবিওয়ালা যেমন কবি, তেমনি সমাজ-সংস্কারক। কবিগানের জনপ্রিয় পালা 'সখী সংবাদ' ও 'বিরহ' বৈষ্ণব পদাবলীরই বিষয় বটে, তথাপি ইহারা বৈষ্ণব

১ খেউড়ের দৃষ্টান্ত—

(উপপতির প্রতি) স্ত্রীর উক্তি—"ওরে আমার কালো ভ্রমর মধু লুটবি আয়।"
(স্বগতভাবে) স্বামীর উক্তি—"আমি থাকতে চাকের মধু পাঁচ ভ্রমরে খায়।"

—ভূমিকা পৃঃ ২॥০ প্রাচীন কবিওয়ালার গান

পদাবলীর অনুকরণ নহে, ইহারা বাঙ্গালী-জীবনের 'কার্টুন' চিত্র। কবি-গানের কৃষ্ণ হইতেছেন তৎকালীন লম্পট বাঙ্গালী বাবু, রাধা হইতেছেন তাঁহার হতভাগিনী পত্নী এবং চন্দ্রাবলী বা কুব্জা হইতেছেন বাবুর বারবনিতা। বৃন্দাদূতীর কৃষ্ণ-ভৎর্সনা আসলে তদানীন্তন লম্পটের প্রতি বাঙ্গালী নারী-সমাজের ধিক্কার বাণী—

ঘরে ধন ফেলে প্রাণ
পরের ধন আগ্‌লে বেড়াও।
নাহি চেনো ঘর কি বাসা, কি বসন্ত কি বরষা—
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও ॥[১]

নারী-কবি যজ্ঞেশ্বরীর এই গানে পৌরাণিক বাহ্য আবরণটুকুও খুলিয়া গিয়াছে। বাস্তব পটভূমিকা হইতে কবিগানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দেখিলে ইহার প্রতি সুবিচার সম্ভব নহে। কবিগানের 'বিরহ' অংশে বিষাদ সৃষ্টি করিতে সাধারণতঃ শ্রীরাধার নিষ্ফল অভিমানই চিত্রিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, কবিগানে প্রকাশিত প্রেমহীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অভিমান অবিমিশ্র হীনতা মাত্র—"গুরুতর অপরাধ অথবা বিশ্বাসঘাতের দ্বারা নায়ক যখন প্রেমের মূলেই কুঠারাঘাত করে, তখন যথারীতি অভিমান প্রকাশ করিতে বসিলে নিজের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হয় মাত্র।"[২] রবীন্দ্রনাথের কথা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি বাঙ্গালী অন্তঃপুরের দিকে চাহিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন—সমাজ ব্যবস্থার ফলে বহু বাঙ্গালী রাধাই এই প্রকার আত্মাবমাননা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, ইহাই বাঙ্গালী রাধা-জীবনের ট্রাজেডি। রাসু নৃসিংহ গাহিয়াছেন—

(শ্যাম) ত্যেজিলে শ্রীমতী তাহাতে কী ক্ষতি যুবতি সকলি সহিল।
ভুজঙ্গ মাণিকো হরে নিল ভেকো মরমে এ দুখো রহিল ॥
(শ্যাম) প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইলো চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
(ওহে) গোখুরের জলো জগত ব্যাপিলো সাগর শুকালো তপনে ॥[৩]

১ পৃঃ ১৭০ প্রাচীন কবিওয়ালার গান [কঃ বিঃ]
২ পৃঃ ৫০ লোক সাহিত্য—কবিসঙ্গীত
৩ পৃঃ ৭৩-৭৪ প্রাচীন কবিওয়ালার গান

লক্ষ্য করিতে হইবে—গভীব হৃদয়-বেদনা বাস্তবতার কবিকেও এখানে রোমাণ্টিক কবি করিয়া তুলিযাছে।

জীবন-সমালোচনা যখন সমাজ-সংস্কারকের আক্রমণাত্মক ভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত মনোবেদনাব আকাব গ্রহণ কবে, তখন যে তাহা করুণরসাত্মক উৎকৃষ্ট কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি কবিতে পারে, তাহার প্রমাণ উমা-সঙ্গীত। ইহা ভাষায়, রচনাভঙ্গিতে, আঙ্গিকে 'মালসী' বা ভবানীবিষয়ক কবি-গানেবই অন্তর্গত[১] এবং রামপ্রসাদ-প্রবর্তিত হইলেও প্রধানতঃ রামবসু প্রমুখ কবিওযালাগণেরই বচনা। তথাপি ইহাতে কবি-গানেব উত্তেজনা নাই। ইহা বাঙ্গালীব সামাজিক জীবনেব বিষাদ-সঙ্গীত। ইহাব পাত্রপাত্রী পৌরাণিক চবিত্র—হিমালয়, মেনকা, কন্যা উমা ও জামাতা শিব। ইহাব বর্ণনীয় বিষয কন্যাব বৎসরব্যাপী অদর্শনে স্বামীব সহিত মেনকাব কলহ, পত্নীর কথায উত্তেজিত হিমালযেব কৈলাস গমন এব শিবেব অনুমতি লইযা কন্যাকে লইয়া আগমন, তিন দিনেব জন্য উমাব পিত্রালয়ে অবস্থান এবং চতুর্থ দিনে আবাব পতিগৃহ-যাত্রা। উমাব পিত্রালযে আগমন-বিষযক গানেব নাম আগমনী এবং পতি-গৃহে প্রত্যাবর্তন-বিষযক গানের নাম বিজয়া। প্রকৃতপক্ষে আগমনী-বিজয়া গান বিশেষত্বহীন মামুলী পৌবাণিক সঙ্গীত, ইহাব মধ্যে কোন বিশেষ রচনা-চাতুয বা ভাবোদ্দীপক বর্ণনা দেখা যায না। তথাপি বাঙ্গালী জাতি ইহাকে সাধাবণভাবে দেখে না, হৃদয়েব স্নেহ ও করুণাব দ্বাবা ইহাকে মণ্ডিত কবিয়া বোমাণ্টিক কবিযা লইয়া উপভোগ করে। সমাজ-জীবনেব বিশিষ্টতায় প্রত্যেক বাঙ্গালীব পক্ষেই এই ভাব-মণ্ডন সম্ভব হয়। বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ ইউবোপীয সমাজেব ন্যায নহে। এখানে বিবাহিতা কন্যাব সহিত পিতামাতার বিচ্ছেদ স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীবে ঘটে না, বিবাহকালেই ববপক্ষ পিতামাতার ক্রোড় হইতে বালিকা কন্যাকে হঠাৎ জোব করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া যায, বিবাহের অন্ত্রোপচাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া কন্যা চিরদিনেব মতো পব হইয়া যায়, তারপর আর তাব দেখা পাওয়াও সুকঠিন। এই কন্যাবিচ্ছেদ-বেদনা প্রত্যেক

[১] "প্রাক্তন-লিখিত সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে আগমনী বিজয়া পর্যায়ের গান একমাত্র মালসী আখ্যাতেই অভিহিত হইত।" —ভূমিকা পৃঃ ১৷৷/০, প্রাচীন কবিওয়ালার গান (কঃ বিঃ)

বাঙ্গালী পিতামাতার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। উমাসঙ্গীতে বর্ণিত মেনকার কন্যা-বিরহ বাঙ্গালীর হৃদয়ের এই ক্ষত স্থানেই আঘাত করে। তাই বাঙ্গালী আপন হৃদয়ের ক্ষত-স্রুত রক্তে রঞ্জিত করিয়া উমাসঙ্গীতকে রোমাণ্টিক করিয়া তুলিতে পারে। উমাসঙ্গীতে বাঙ্গালী জীবনের এই কন্যা-বিরহ ছাড়াও আরও একটি দুঃখের কারণ নিহিত আছে। ইহা বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ও পণপ্রথা। উপযুক্ত বর বাঙ্গালীসমাজে অত্যন্ত দুর্মূল্য। সেইজন্য সাধারণ বাঙ্গালী অপাত্রেই কন্যাদান করিতে বাধ্য হয়। কন্যার পিতামাতার এ-মনোবেদনা জীবনে যায় না। তাই উমাসঙ্গীতে যখন বৃদ্ধ নেশাখোর দরিদ্র শিবের সহিত বিবাহের জন্য উমার দুর্দশা স্মরণ করিয়া মেনকা হাহাকার করে, তখন শরীর-সর্বস্ব অতিবড় পাষণ্ড ব্যক্তিও তাহার নিজের 'উমা'র দুর্দশা স্মরণ করিয়া বেদনার্ত না হইয়া পারে না। সদ্যোজাগ্রত পিতৃত্ব সহসা মহাপাষণ্ডকেও সহৃদয় ভদ্র শ্রোতার সহিত একাকার করিয়া দেয়, তখন সে গানের গিরিরানীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া মনে মনে বলিতে থাকে—

এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না।

—রামপ্রসাদ

কোলে আয় মা ভবদারা।...
বিধাতারে আরাধিব তোর মা কভু না হইব
(এবার) মেয়ে হয়ে দেখাইব মায়ের মায়া কেমন ধারা॥

—গঙ্গাগোবিন্দ

এসো মা এসো মা উমা, বলো না আর 'যাই যাই'।
মায়ের কাছে হৈমবতি ও-কথা মা বলতে নাই॥ —জ্ঞানেন্দ্র

এই মাধুর্য ও কারুণ্যের জন্যই আগমনী বিজয়া গান হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালীর সত্যকার ও চিরদিনকার জাতীয় সঙ্গীত।

[কোনো কোনো পণ্ডিতের অনুমান, মধ্যযুগীয় কৌলীন্য ও গৌরীদান প্রথাই উমাসঙ্গীতের মূলে রহিয়াছে এবং ইহাই উমাসঙ্গীতকে বাঙ্গালী-জীবনে সত্য ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই ধারণা যদি যথার্থ হইত, তাহা হইলে পরবর্তীকালে কৌলীন্য ও গৌরীদান-প্রথা বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উমাসঙ্গীতও

যাদুঘরের নিষ্প্রাণ বস্তুতে পরিণত হইত। কিন্তু ইহা এখনও বাঙ্গালী সমাজে বাঁচিয়া আছে, ইহার আবেদন এখনও বাঙ্গালী-জীবনে সমানভাবে সত্য।]

বাঙ্গালীর ধর্ম-জীবনে উমাসঙ্গীতের দান অল্প নহে। উমাসঙ্গীতই বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব দুর্গাপূজার নূতন তাৎপয প্রকাশ করিয়াছে। পুরাণে উমা-কাহিনীর সহিত দুর্গাপূজার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বাঙ্গালী জনকবির কল্পনা উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইয়াছে। উমাসঙ্গীত প্রচার করিয়াছে, বঙ্গদেশে শারদীয়া দুর্গারূপে দেবীর পূজা গ্রহণ আসলে জগজ্জননীর অভিনব কন্যালীলা মাত্র। সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীর পূজায় মৃন্ময়ী প্রতিমায় দেবীশক্তির আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে তিন দিনের জন্য কন্যা-উমা-ভাবে দেবীর পিত্রালয়ে আগমন এবং দশমীর বিসর্জন আসলে এই উমারই পতি-গৃহ-যাত্রা। উমাসঙ্গীত দেবী দুর্গাতে কন্যাভাব আরোপ করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালীর হৃদয়ের কাছে নিবিড়ভাবে টানিয়া আনিয়াছে, জগজ্জননীর মহিমাকে স্নিগ্ধ কোমল ও মাধুর্য-মণ্ডিত করিয়া ভক্তহৃদয়ে অতুলনীয় রসের সঞ্চার করিয়াছে। তাই বলিয়া উমাসঙ্গীতকে শ্যামাসঙ্গীতের মতো সাধন-সঙ্গীত মনে করা অযৌক্তিক। উমাসঙ্গীতে কোন গূঢ় সাধন-পদ্ধতি নাই, কাব্য-রসই আছে। জননীকে নিজ-কন্যারূপে চিন্তা করিলে সন্তান-হৃদয়ে যে অভিনব মধুর রসের আবির্ভাব হয়, তাহারই আস্বাদন রহিয়াছে উমাসঙ্গীতে। বাঙ্গালী জাতি এই মধুর রসের রসিক বলিয়াই জগজ্জননীকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিয়াছে—

চল্ মা আমার সঙ্গে চল।
(তোর) হাতে দিব কাঁচের চুড়ি পায়ে দিব রূপার মল॥

এমন কি দেবীর প্রতি স্নেহমিশ্রিত করুণা অনুভব করিতেও তাহার বাধে নাই—

(মা আমার) পায় না খেতে কৈলাসেতে চীনে-বাদাম ঘুগ্‌নি দানা।

বাঙ্গালী জাতি এই সকল গানে কৌতুক নহে, পিতৃ-হৃদয়ের প্রগাঢ় মাধুর্যই আস্বাদন করে।

জন-সঙ্গীতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইতেছে যাত্রা-গান। ইহাই সেকালের দৃশ্যকাব্য বা নাটক। অভিনয়ের মধ্যে গানেরই প্রাধান্য যাত্রার

বৈশিষ্ট্য। যাত্রা-গানের প্রাচীন নাম 'নাট-গীত'। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, চৈতন্যদেব বাংলা রুক্মিণীহরণ নাট-গীত অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যকার কোন প্রাচীন বাংলা যাত্রা-গ্রন্থ এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই। নেপালে প্রাপ্ত সপ্তদশ শতকের 'গোপীচন্দ্র নাটক' ঠিক বাংলা গ্রন্থ নহে, ইহার গানগুলি মাত্র বাংলা। কেহ কেহ সংস্কৃত গীতগোবিন্দকেই আদি যাত্রা-গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। ঊনবিংশ শতকেই যাত্রার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়কার যাত্রায় কিন্তু গীতগোবিন্দের প্রভাব ছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়া গিয়াছেন—"জয়দেবের পদাবলী কালিয়-দমন যাত্রার জান্ ছিল। প্রথমে পরমানন্দ অধিকারী তাঁহার পরে বদন ও গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার মধ্যে জয়দেবের পদাবলী আবৃত্তি করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, মধ্যে মধ্যে ঘটকালি ও কথোপকথন থাকিত মাত্র।"[১] বিষয়ভেদে যাত্রা প্রধানতঃ ত্রিবিধ—কৃষ্ণযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা ও রামযাত্রা। তন্মধ্যে কৃষ্ণযাত্রাই প্রাচীনতম। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যকেই কৃষ্ণ যাত্রার গান বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণযাত্রার নাম কিন্তু 'কালিয় দমন'। "শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই কালিয়দমন যাত্রায় অভিনীত হইত।"[২] জনসঙ্গীতের আসরে যাত্রার আকর্ষণ সর্বাধিক। ইহাতে শ্রোতাদিগকে একমাত্র গানের পটভূমি ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করিবার জন্য মানস প্রয়াসের প্রয়োজন নাই—কবিকল্পনা অভিনেতার আকারে একেবারে মূর্তিমান হইয়া জনতার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন যাত্রা উমাসঙ্গীতের মতোই কয়েকটি গান মাত্র। এমনকি পাত্রপাত্রীর গদ্যাত্মক কথোপকথন বা সংলাপও গানেই প্রকাশ্য। যেমন—

বিপদ-বারণ তুমি নারায়ণ—লোকে বলে তোমায় করুণা নিধান।
কী দোষ পাইয়ে পতিরে আমার কপট সমরে করিলে সংহার?
নারায়ণ তুমি একি অবিচার! কেন কাঁদাইলে অবলার প্রাণ?

—বালীবধে রামের প্রতি তারা

উমাসঙ্গীত একক গায়কের গান কিন্তু যাত্রায় পাত্র পাত্রীর হিসাবে গায়কের সংখ্যা বহু। তাছাড়া বিচিত্র চরিত্রের অভিনয়ে, তদুচিত সাজসজ্জায় এবং

১ নবজীবন পত্রিকা ১২৯১

২ পৃঃ ৫০১বঙ্গ ভাষা ও স হিত্য (৫ম সং)

বিশেষ করিয়া নৃত্যে যাত্রাসঙ্গীত বিশিষ্ট। প্রাণচাঞ্চল্যে প্রাচীন ভাবালুতা নষ্ট করিবার জন্য এবং নবজীবনের উল্লাস-প্রকাশের জন্য যাত্রাগানে নৃত্যের আমদানি হইয়াছে। নৃত্যই যাত্রার প্রধান অঙ্গ, কোন কোন ক্ষেত্রে যাত্রায় ঠাটে, ঠমকে, ভাবাভিনয়ে নৃত্যের অভাব পূরণ করা হয়। যাত্রাসঙ্গীত সাধারণতঃ নৃত্যকালীন উক্তি হিসাবে রচিত—নৃত্যছন্দে, নৃত্যের তালে ইহার বাগ্‌বিন্যাস হইয়া থাকে। যেমন বিদ্যাসুন্দর যাত্রায়—

ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছো।
(প্রেম কি) ঝালিয়ে তুলেছো ?

অথবা কৃষ্ণ-যাত্রায়—

পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই লো।
তোর মতো আর কুল-মজানী গোকুলেতে নাই লো॥
আমরি কী রূপের ছটা !
কয়লা থেকেও কালো সেটা—
(আবার) তার সঙ্গে তোর প্রেমের ঘটা—লাজে মরে যাই লো॥

রসিক সমালোচক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহ্‌তর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই নৃত্য করে।...পূর্বে বাঙ্গালা অনেক কাঁদিয়াছে; কীর্তনের ছলে অনবরত নয়নাশ্রুবর্ষণ করিয়াছে, প্রণয়ভরে, স্নেহভরে বাঙ্গালা অনেক কাঁদিয়াছে।...সে বাঙ্গালা আর নাই, বাঙ্গালা এক্ষণে নূতন। বাঙ্গালা এক্ষণে বালক। সেইজন্য এত নৃত্য।"[১] 'ঝুমুর' ও একপ্রকার যাত্রা। ইহার বৈশিষ্ট্য দ্বৈতগান 'লগনী' ও নাচ। ইহাতে গদ্য সংলাপ নাই, অভিনেতাও তিনটির বেশী নহে। ইতর ও অশ্লীল ঝুমুরের নাম 'লেটো'।

সর্বাপেক্ষা সুপরিণত জন-সাহিত্য হইতেছে পাঁচালী। ইতিহাসে রামায়ণাদি প্রাচীন আখ্যায়িকা-কাব্যগুলিকে পাঁচালী নামে অভিহিত করা হয়, কিন্তু আলোচ্য অর্বাচীন পাঁচালী এই জাতীয় বৃহৎকায় আখ্যান-কাব্য নহে, ইহা ক্ষুদ্রাকার উপাখ্যান-কাব্য মাত্র। পণ্ডিতেরা বলেন পাঁচালীর উৎপত্তি নাকি

১ 'যাত্রা-সমালোচনা'-প্রবন্ধ (১৮৭৫ খ্রীঃ)

'পঞ্চালিকা' বা পুতুলনাচ হইতে। কিন্তু প্রাচীন বা অর্বাচীন কোন পাঁচালী-গানে পুতুল বা মানুষ কাহাকেও নাচিতে দেখা যায় না, তবে আধুনিক পাঁচালী গানে, কৌতুকে, রঙ্গে, হাস্যে নর্তকীর মতোই লাস্যময়ী বটে।

অর্বাচীন পাঁচালীর কবি হইতেছেন দাশরথি রায়, সংক্ষেপে দাশু রায়। ইনি ইংরেজ-পূর্ব আধুনিক যুগের যুগন্ধর কবি। এই যুগের সমস্ত কবির সমগ্র শক্তির কেন্দ্রীভূত বিগ্রহ দাশরথি। তাঁহার প্রাণশক্তি সুবিপুল, রচনা-শক্তি অসামান্য। বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঁচালী-গ্রন্থে দাশরথির উৎকৃষ্ট রচনাগুলি প্রতি পৃষ্ঠায় দুই সারিতে (ডবল কলম) ছাপিতে ৭১৬ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল; ইহা হইতে কবির সৃষ্টি-শক্তির বিপুলতা অনুমান করা যাইতে পারে। কেবল প্রাচুর্যে নহে, ঐশ্বর্যেও দাশরথির কবি-প্রতিভা অসামান্য। একদিকে প্রাচীন পদাবলীর মতো ভাবোদ্দীপক গানে এবং মঙ্গলকাব্যের মতো নানা জ্ঞাতব্য বস্তু-তালিকায়, অপরদিকে অর্বাচীন তর্জার বাগ্‌বিতণ্ডায়, কবিগানের রস-কলহে, যাত্রার অভিনয়ে, খেউড়ের কৌতুকে তিনি পাঁচালীকে করিয়া তুলিয়াছেন সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যময়। দাশরথির পাঁচালীতে ভক্তের ভক্তি, সমাজসেবীর লোকশিক্ষা, সংস্কারকের সমালোচনা, বিদূষকের রঙ্গ-কৌতুক এবং সভাসদের বাগ্‌বৈদগ্ধ একত্র দেখা যায়। তাঁহার পাঁচালী জনসাহিত্য বটে, কিন্তু তাহাতে কবি-গানের ইতরতা, যাত্রার প্রগল্‌ভতা, অথবা খেউড়ের অশ্লীলতা নাই। তাঁহার পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি সর্বসাধারণের পরিচিত হইলেও উপস্থাপনার গুণে কোনোখানেই নীরস বা বিস্বাদ হইয়া যায় নাই। ইহা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে।

দাশরথির পাঁচালী আসলে পাঠ্য-কাব্য নহে, শ্রব্য-কাব্য; ইহাকে ঠিক জনগণের আসরের কাব্য বলা যায়। নাটকের মতো ইহার যথোচিত আস্বাদন নির্ভর করে—লেখক বা পাঠকের উপরে নহে, তৃতীয় ব্যক্তির রূপায়ণের উপরে। পাঁচালীর তিনটি অঙ্গ—কথা, ছড়া ও গান "খানিক তার রাগরাগিনী, খানিক তার মুখ-জবানি"।[১] কথাই মূল, ছড়া ও গান উহার অলংকার। কথা সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তির বস্তু, গান বাদ্যযন্ত্রসহকারে গেয় এবং ছড়া স্বাভাবিক কণ্ঠে দ্রুত উচ্চার্য। ছড়াগুলি সাধারণতঃ উপমার দীর্ঘ তালিকা। এইগুলি দাশরথির পুরাণেতিহাস-জ্ঞানের, ভূয়োদর্শনের ও অভিজ্ঞতার রত্ন-ভাণ্ডার। 'দ্রৌপদীর

১ অক্ষয় সরকার লিখিত 'জয়দেব' প্রবন্ধে পাঁচালি বৈশিষ্ট্য। (নবজীবন-১২৯৩)

বস্ত্রহরণ' পালায় দুর্যোধনের আনন্দ বুঝাইতে দাশরথি ছড়ার অবতারণা করিয়াছেন—

কুমুদীর আনন্দ যেমন নিরখিয়া সন্ধ্যা।
পুত্র প্রসবিয়া যেন আনন্দিত বন্ধ্যা॥
ভক্তের আনন্দ যেমন নিরখি গোবিন্দে।
অসুরের আনন্দ যেন শুনি দেব নিন্দে॥…ইত্যাদি

এই প্রকারে দ্রুত পরিবর্তিত উপমা-চিত্রের অজস্র ফুলঝুরি সৃষ্টি করিয়া শ্রোতার ক্ষীয়মান কৌতুহলকে চমৎকৃত ও উত্তেজিত করা হয়। আসরের পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ছড়াগুলিকে পাঠ্য কবিতার মতো পাঠ করিলে উপমাগুলি যে বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দীনেশচন্দ্র এইজন্যই লিখিয়াছেন—"কবিকে 'থাম থাম' বলিয়া পরিত্রাহি চিৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্থগিত হইবার নহে।"[১] কিন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে আসরের শ্রোতার পক্ষে বিরক্তিকর হইলে স্বয়ং কবিই ছড়াগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিতেন বা পাঁচালী হইতে বর্জন করিতে বাধ্য হইতেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর অপ্রিয় হইলে কোন জনতা-কাব্যই বাঁচিতে পারে না।

দাশরথির দৃষ্টিভঙ্গী বিচার-প্রবণ বুদ্ধিনিষ্ঠ এবং সকল দিক দিয়া 'মডার্ন'। সেইজন্য তাঁহার পাঁচালীমাত্রেই হইয়াছে সামাজিক নকশা। দাশরথির পাঁচালী হুতোম প্যাচার নকশারই পূর্ব-পিতামহী। ইহার প্রমাণ তাঁহার শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, বিধবা-বিবাহ, নবীনচাঁদ সোনামুখীর দ্বন্দ্ব, নলিনী ভ্রমরোক্তি প্রভৃতি লৌকিক পালা। দাশরথির যদি ভাবালু পৌরাণিক মনোবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে এইগুলি রচনা করিবার কল্পনাও করিতে পারিতেন না। মডার্ন মনোবৃত্তির জন্যই তিনি লোভী পুরোহিত, প্রবঞ্চক গণক, হাতুড়ে বৈদ্য, ভণ্ড নেড়ানেড়ি, কুলীন ব্রাহ্মণ, কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রভৃতিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন। সমাজের হাল-চাল, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতির শ্লেষাত্মক সমালোচনা তাঁহার পাঁচালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য পৌরাণিক পালাতেও তিনি জীবন-সমালোচনা না করিয়া পারেন নাই। দাশরথির পৌরাণিক পাঁচালীও বাঙ্গালী সমাজের 'কার্টুন' চিত্র। 'কলঙ্ক-ভঞ্জনে'র কুটিলা বাঙ্গালার 'কুঁদুলী'

১ পৃঃ ৫৩১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

কন্যা, রামের বিবাহের পুরোহিত চাল-কলা-লোভী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বাঙ্গালী শ্বশুর-জামাইয়ের দ্বন্দ্ব। মহীরাবণ-পালায় দেখা যায়—মহীরাবণ অভিপ্রেত নরবলির কথা পুরোহিতকে গোপনে বলিলেন, আবার ব্রাহ্মণ এইকথা গোপনে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, তৎফলে ব্রাহ্মণীর "গোপন কথায় পেট, ফুলে হইল ঢাক!" কাজেই ব্রাহ্মণী পুকুরঘাটে গিয়া অন্যান্য নারীদের নিকটে গোপন কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—

কেবল বলছি লুকিয়ে ঘাটে তোরা পাছে বলিস হাটে
তোদের পেটে কথা জীর্ণ হয় না।

ইহাকে দাশরথির প্রশংসনীয় সৃষ্টি না বলিয়া পৌরাণিকতার লঘুকরণ বলিয়া প্রচার করিলে অযৌক্তিক অপব্যাখ্যার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

দাশরথির প্রায় প্রতি পাঁচালীতেই ভক্তিমূলক গান দেখা যায়। এইগুলি আসরের বৃদ্ধ ও ভক্তদিগের জন্য রচিত। লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে—এইগুলিতে পৌরাণিক অন্ধ সংস্কার প্রকাশিত হয় নাই, ভক্তির গানের মধ্যেও আধুনিক যুক্তিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন—

হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলা-পতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপনারী।
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥ ..

—গানটির 'মডার্ন'-ভাব দ্রষ্টব্য। ইহা যেন আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিকের কৃষ্ণলীলার যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা।

দুঃখের বিষয়, একালের পণ্ডিতের দল দাশরথির এই প্রকার আধুনিক মনোবৃত্তিকে প্রকৃত আধুনিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইহাদের মতে, দাশরথি হইতেছেন অন্ধযুগের অবক্ষয়-কবি, তাঁহার মধ্যে যখন ইংরেজী প্রভাব নাই, তখন আধুনিকতা থাকিবে কিরূপে? কাজেই পাঁচালীর অন্তর্গত আধুনিক ধর্মকে দাশরথির অক্ষমতা বা পৌরাণিক মহিমার লঘুকরণ বলিয়াই চিন্তা করিতে হইবে। "তাহার (দাশরথির) মূল উদ্দেশ্য ছিল বিষয়ের মহিমাকে যতদূর সম্ভব লঘু রূপ দিয়া ভক্তিরসকে প্রাকৃত রুচির নিকট আস্বাদনীয় করিয়া তোলা।"[১]

১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা পৃষ্ঠা ১|৴০ (দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী)

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান 'রাধাকৃষ্ণের কলহ' অথবা সুকুমার রায়চৌধুরীর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে পুরাণ-কথায় আধুনিক পটভূমি সংযোগে পুরাণের মানহানি অথবা রসের অসঙ্গতি ঘটে না, কারণ ইংরেজি শিক্ষিত লেখকের পক্ষে উহাই স্বাভাবিক, কিন্তু দাশরথির পুরাণ-কাহিনীতে আধুনিক পরিবেশ প্রদান তাঁহার সঙ্গতি-বোধেরই অভাব মাত্র—"তিনি একযুগের গাছে আর একযুগের কলম লাগাইয়াছেন এবং ইহাতে যে উদ্ভিদ-সাঙ্কর্য ঘটিয়াছে তাহাতে তিনি কোন কলাগত অসঙ্গতি-বোধের দ্বারা পীড়িত হন নাই।"[১] বলা বাহুল্য, এই চিন্তা 'অন্ধযুগ'-তত্ত্বেরই অন্ধতার ফল।

দাশরথি জীবদ্দশায় তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য সমগ্র বঙ্গদেশে যে সম্মান প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। পাঁচালীর গবেষকপণ্ডিত শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন "দাশরথির পাঁচালীর আসর বসিয়াছিল গোটা বঙ্গদেশ জুড়িয়া।"[২] পাঁচালীতে মুগ্ধ কেবল যে ইতর শ্রোতৃবর্গ হইত, তাহা নহে, মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন নৈয়ায়িক রাখালদাস ন্যায়-রত্ন পর্যন্ত মুগ্ধভাবে লিখিয়াছিলেন—"ভাবরচনা সম্বন্ধে মহাকবি বলিয়া গণ্য হইলে পশ্চিমদেশীয় তুলসীদাস, বঙ্গদেশীয় রামপ্রসাদ সেন ও দাশরথি রায় এই তিনজন মাত্র হইতে পারেন।'[৩] তথাপি এ যুগে দাশরথি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। বর্তমান যুগের উন্নাসিকতা বা অরসিকতা এই উপেক্ষার কারণ নহে। কবির নিজের মধ্যেই অবহেলিত হইবার কারণ নিহিত। দাশরথি মহাসত্ত্ব ও প্রতিভাবান হইয়াও কেবল যুগ কবি ও জন-কবির বেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইজন্য নিজযুগের দাবি মিটাইলেও চিরযুগের দাবি মিটাইতে পারেন নাই। যে-কারণে তিনি তাঁহার যুগের প্রিয়, সেই কারণেই তিনি অন্যযুগে অপ্রিয়। সাময়িক জীবন সত্য ও সাময়িক সমস্যাকে কাব্যের বিষয় করাই তাৎকালিক প্রিয়তা ও আধুনিক অপ্রিয়তার কারণ। দাশরথি-প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি তাঁহার পাঁচালীকে স্থায়িভাবে জ্যোতির্ময়ী করিতে পারে নাই। তাছাড়া তাঁহার পাঁচালীতে আর্টের সংযম দেখা যায় না, মূল কারণ দাশরথি-প্রতিভা পরাধীনা

১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা পৃষ্ঠা ১।/০ (দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী)

২ পৃঃ ১০৭—দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী

৩ পৃঃ ১০৪-১০৫—ঐ

—কবির সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে সভারঞ্জনে। তিনি শক্তিশালী হইয়াও জনচিত্তকে সবলে উর্ধ্বে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, নিজেই জনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। দাশরথির প্রতিভা প্রকৃত রসসৃষ্টি করে না, তাহা শেষ পর্যন্ত বৈদগ্ধ্যের চমৎকৃতি জাগায় মাত্র। তিনি ভারতচন্দ্রেরই লোকায়ত সংস্করণ।[1] রঙ্গ-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সভারঞ্জন করিয়াই কেহ মহাকবির অমরতা পাইতে পারে না—ইহা দাশরথির জীবন হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

দাশরথি রায় অকৃত্রিম ও অবিমিশ্র বাংলা ভাষার ও বঙ্গীয় মনোভাবের সর্বশেষ কবি। তাঁহার পর হইতেই বাংলা ভাষা ইংরেজী ভাবে রঞ্জিত হইতে থাকে এবং বঙ্গসাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের অনুসরণ স্বরু করে। ঈশ্বর গুপ্তের উপরে দাশরথির প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সে প্রভাবের ক্রিয়া সামান্য। আসলে ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের মতোই সন্ধি-যুগের কবি, তাঁহার মধ্যে একদিকে খাঁটি বাঙ্গালী অন্যদিকে ইংরেজী উভয় মনোভাবই দেখা যায়। সেইজন্য দাশরথির পাঁচালীকেই বলিতে হইবে—শুদ্ধস্বরূপিণী বঙ্গসরস্বতীর বিজয়ার সঙ্গীত।

১ দাশরথির পয়ারের ভাষাতেও ভারতচন্দ্রীয় সাবলীলতা দ্রষ্টব্য—

এমন দরিদ্র নারী ছিল ক্ষুধা ভরে।
নিঙ্গাড়ি খেয়েছে সুধা শ্যাম সুধাকরে॥
চলে যেতে পায়ে লাগে পড়িতেছে ভূমে।
কেন উঠে ক লাচাঁদ এলে কাঁচা ঘুমে॥

তুলনীয় ভারতচন্দ্রের পয়ারের ভাষা—

বোলে চালে গেল নিশা বিভাবরী ঘুমে।
ভাবত পড়িল ভোরে মালা-গাঁথা ধুমে॥ —বিদ্যাসুন্দর

নেপথ্য-বার্তা

কবি-পরিচিতি

'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' পুস্তকে গ্রন্থকার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল কমপক্ষে সত্তরজন কবিয়ালের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে গোঁজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস, হরু ঠাকুর, রাম বসু, এণ্টনি ফিরিঙ্গি ও ভোলা ময়রা সুবিখ্যাত।

গোঁজলা গুঁই (১৮শ শতকের ১ম পাদে আবির্ভূত)—সম্ভবতঃ আদি কবিয়াল। ইহার রচিত "এসো এসো চাঁদবদনি"[১] লৌকিক প্রেমের একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত। রঘুনাথ দাস (১৮শ শতকের প্রথমার্ধ)—বিতণ্ডামূলক কবির 'লহর' বা লড়াইয়ের প্রবর্তক। প্রাচীন রাজসভায় কবি-পণ্ডিতগণের 'বাকোবাক্য' বা বাগ্‌যুদ্ধেরই গ্রাম্যরূপ হইতেছে এই লহর। হরু ঠাকুরের (১৭৩৮—১৮১২ খ্রীঃ) পুরা নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন ইঁহার পৃষ্ঠপোষক। শেষ-জীবনে ইনি রাজ-পারিষদ হইয়াছিলেন। কেবল কবি-গানে নহে, সমস্যা-পূরণেও ইনি ছিলেন সুদক্ষ। 'বড়শি বিঁধিল যেন চাঁদে'[২] ইঁহার সমস্যা-পূরণের বিখ্যাত দৃষ্টান্ত। রাম বসু (১৭৮৭—১৮২৯ খ্রীঃ)—মালসী ও সখীসংবাদ রচনায় সিদ্ধহস্ত ও জনপ্রিয় কবি। নায়িকার গভীর মর্মবেদনা, নায়কের প্রতি নিষ্ঠুরতার অভিযোগ তাঁহার গানে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। দীনেশ চন্দ্রের মতে "রামবসুর 'বিরহে' বঙ্গবধূর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হইয়াছে।"[৩] "রামবসুর গানে

---

১ এসো এসো চাঁদবদনী
এ রসে নীরস করো না ধনি ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ
অনুমানে বুঝি আমি ভুজঙ্গ, তুমি আমার তায় রতনমণি ॥
তোমাতে আমাতে একই কায়া আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া।
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥

২ একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি, ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
(রাণী) অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শি বিঁধিল যেন চাঁদে ॥

৩ পৃঃ ৫৩৫ ব-ভা-সা

শ্লেষ বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ আছে কিন্তু স্পষ্ট অশ্লীলতা নাই।"[১] অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি রামবসুর সমসাময়িক চন্দননগর-প্রবাসী পর্তুগীজ। পুরা নাম—হেন্সম্যান অ্যান্টনি। ইনি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার ন্যায় আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ধুতি-চাদর পরিয়া খালিগায়ে অন্যান্য কবিয়ালগণের সহিত কবিগানের লড়াই করিতে ভালোবাসিতেন। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ভোলা ময়রা, রাম বসু, ঠাকুর সিং প্রভৃতির নামকরা যায়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও উপস্থিত জবাবে ভোলা ময়রা অদ্বিতীয় কবিয়াল। ইনি কবির লড়াই বা লহরে অশ্লীল গালাগালির আমদানি করেন। "ভোলার যে সকল গান প্রসিদ্ধ সেগুলি অ্যান্টনি সাহেব অথবা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুরুচিপূর্ণ গালাগালি। ভোলার নির্ভীকতার বা প্রগল্‌ভতার সীমা ছিল না, দেশের বড় বড় ভূস্বামীদের সম্মুখে অম্লানবদনে নিঃসঙ্কোচে ভোলা অশ্লীল খেউড়ের সহিত এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকেও দুকথা শুনাইয়া দিত।"[২]

কবিওয়ালাগণ সাধারণতঃ 'দাঁড়া কবি' নামে বিখ্যাত। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন 'দাঁড়া' শব্দের অর্থ 'আদর্শ' অর্থাৎ "বাঁধা গান বা ছড়া।"

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-কবি এবং সাধারণ কবিয়ালগণই উমাসঙ্গীতের কবি।

উমাসঙ্গীতের আদি কবি রামপ্রসাদ সেন। কেবল শ্যামা-সঙ্গীতের নহে, আগমনী বিজয়ার গানের এমন কি উমার বাল্যলীলার গানেরও ইনি প্রবর্তক। "গিরিবর, আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে"—রামপ্রসাদের এই গানটি বাল্যলীলা-বিষয়ক উমা-সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদের অনুকরণেই পরে কালী মির্জা, রাধিকাপ্রসন্ন প্রভৃতি বাল্য-লীলার উমাসঙ্গীত রচনা করেন। শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা সাধক কমলাকান্ত উমাসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ কবি। ইহার রচিত আগমনী-বিজয়া গান সংখ্যায় অন্যান্য কবির তুলনায় অনেক বেশী, ভাবতন্ময়তাতেও কমলাকান্ত শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-লীলায় যাদবেন্দ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির ন্যায় ইনিও নিজেকে লীলা-সহচর রূপে ভাবিয়া উমাসঙ্গীত লিখিয়াছেন। উমাসঙ্গীতের বেশির ভাগ কবিই কিন্তু কবিওয়ালা। অধিকাংশ

১ ভূমিকা পৃঃ ৫।৶০ প্রাচীন কবিয়ালের গান

২ পৃঃ ৩৯৫ প্রা ব-সা তৃতীয়াংশ

কবি-গানের ভূমিকাস্বরূপ 'মালসী' গানের প্রয়োজনেই উমাসঙ্গীত রচিত। শ্রীকালিদাস রায় লিখিয়াছেন "রাম বসুর—'কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে।' 'ওহে গিরি গা তোল হে, মা এলেন হিমালয়।' ইত্যাদি গান উমাসঙ্গীতের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গদাধর মুখোপাধ্যায়ের 'পুরবাসী বলে উমার মা, তোর হারা তারা এলো ঐ' গানটি বড় মর্মস্পর্শী। দাশরথি রায়ের 'গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী', 'কই হে গিরি, কই সে আমার, প্রাণের উমা নন্দিনী।' ইত্যাদি গান একদিন বাঙ্গালীর চোখে জল ঝরাইত।"[১]

অধিকারী উপাধিক কবি গোষ্ঠীই অধিকাংশ যাত্রা গানের রচয়িতা। "কৃষ্ণযাত্রার প্রথম যুগে নাম করিয়াছিলেন লোচনদাস অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী এবং দুই ভাই শ্রীদাম দাস ও সুবল দাস।"[২] "কৃষ্ণনগরনিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর নিবাসী কালাচাঁদ পাল শ্রীকৃষ্ণযাত্রায় পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চাঁদ অধিকারী রামযাত্রায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।"[৩] বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গোপাল উড়ে। ইনি উড়িষ্যাবাসী হইলেও কলিকাতাপ্রবাসী ছিলেন এবং বাংলা গান রচনাতে অপর শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি নৃত্য-গীতেও বিশেষ পটু ছিলেন। 'হীরা' মালিনীর ভূমিকায় ইঁহার অভিনয় ছিল অতুলনীয়। 'স্বপ্ন-বিলাস' 'রাই উন্মাদিনী' প্রভৃতি পালা-গান-রচয়িতা কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণ-যাত্রায় দিগ্বিজয়ী কবির খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল পূর্ববঙ্গে। ইঁহার আবির্ভাবকাল দীনেশ সেনের মতে ১৮১০—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং সুকুমার সেনের মতে ১৮০৫—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদকর্তা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।"[৪] —কৃষ্ণকমলের কবিত্ব সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের এই

---

১ পৃঃ ৩৭৪—৩৭৫ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য দ্বিতীয়াংশ

২ পৃঃ ১০৫৫ বা-সা-ই, ১ম সং (সুকুমার সেন)

৩ পৃঃ ৫৩৮ ব-ভা-সা (৫ম সং)

৪ পৃঃ ৫৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

অতি-প্রশংসা বৈষ্ণবভক্তমহলে কবির জন-প্রিয়তার অন্যতম প্রমাণ। কৃষ্ণকমলের রচনার অধিকাংশই কিন্তু অতিমাত্রায় ভাবালু, সংযমহীন ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ নীরস গদ্য মাত্র। যথা—

কো-কো-কো- কোথা গো, বি-বি-বি বিশাখে
দে-দে-দে দে দেখা সে ব-ব- বঁধুকে ॥

—পৃঃ ৫৪৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

কিংবা—

হেথা থাকতে যদি মন না থাকে।
তবে যেযো সেথাকে ॥
যদি মনে মন রত, না হয় মনের মতো, কাঁদলে প্রেম আর
কত বেড়ে থাকে।
তাতে যদি মোদের জীবন থাকে না থাকে।
তাই হবে কপালে যা থাকে ॥
বঁধু যথা যে না থাকে, তার আর কোথাকে
ধরে বেঁধে করে রেখে থাকে ॥ —পৃঃ ৫৪২ ঐ

দীনেশচন্দ্রের উদ্ধৃত উল্লিখিত পংক্তিগুলি কৃষ্ণকমলের কবিত্ব নহে, কবিত্বহীনতাই প্রকাশ করে। কৃষ্ণকমলের ভাব-শিষ্য ও কৃষ্ণযাত্রার পরবর্তী ভক্তকবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় গীতরত্ন (১৮৪১—১৯১২ খ্রীঃ)। ইনিও ভক্তমহলে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

গানে গানে-গ্রথিত পৌরাণিক কাহিনী পাঁচালির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পাঁচালি দ্বিবিধ—অপরিণত ও সুপরিণত। অপরিণত পাঁচালির সংযোগ-ভাষণ গদ্যে রচিত হয়। ইহার নাম "ঢপ"। এই ঢপ পাঁচালির প্রবর্তক হইতেছেন—মধু কান বা মধুসূদন কিন্নর। ইনি স্বরচিত গানের ভণিতায় নিজনামের 'মধু' বাদ দিয়া 'সূদন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুপরিণত পাঁচালি গানের সংযোজক ভাষণ হয় পদ্যে বা ছড়ায়। দাশরথি রায় এই সুপরিণত পাঁচালির কবি। মধুসূদনের ঢপ-কীর্তন বিশেষত্ব-বর্জিত এবং বৈষ্ণব পদাবলীর তরলিত সংস্করণ। মধুসূদন ঊনবিংশ শতকের প্রথমাংশের কবি।

সুপরিণত পাঁচালির প্রবর্তক এবং শ্রেষ্ঠ পাঁচালি কবি দাশরথি রায়

(১৮০৬-১৮৫৭ খ্রীঃ)। ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন কবিয়াল। প্রথম যৌবনে অক্ষয়া নাম্নী কবিওয়ালীর প্রেমে পড়িয়া উহারই দলে সঙ্গীত-রচয়িতারূপে দাশরথি আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালের ভর্ৎসনায় লজ্জিত হইয়া অক্ষয়াকে ও তৎসহ কবিগানকে চিরদিনের জন্ম পরিত্যাগ করেন। ১৩২১ সালের আর্যাবর্ত পত্রিকায় 'দাশরথি রায়' প্রবন্ধে শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায় এই অক্ষয়ার প্রেম ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। ইতর কবিগানের জন্য ভদ্রসমাজে ব্রাহ্মণ-সন্তান দাশরথির মর্যাদাহানি হইতেছিল দেখিয়া এই অন্ত্যজা নারী নিজেই কবির দল ভাঙ্গিয়া দেয়, দাশরথিকে সংসার-জীবনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে এবং নিজের যথাসর্বস্ব দাশরথিকে দিয়া পথের ভিখারিণী হইয়া চলিয়া যায়। সেই জন্যই দাশরথি জীবিকার্জনে অনন্যোপায় হইয়া পাচালী লিখিতে বাধ্য হন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুচর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ধারণা, পাচালি গানেরও প্রবর্তক কবি জয়দেব—"জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলার আদি পাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছডা, গান, ধুয়া, অন্তরা ঠিক পাচালির মতনই আছে; তবে বাংলায় যাহাকে ছডা বলে সংস্কৃতে তাহাকে 'শ্লোক' বলিতে হয়, এইমাত্র প্রভেদ। জয়দেব-কৃত প্রসিদ্ধ দশাবতার বর্ণনে 'জয় জগদীশ হরে' এইটুকু মাত্র ধ্রুবপদ বা ধুয়া। আর—

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চবিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীন শরীর—"

ইত্যাদি দশটি পদ দশটি কলি। প্রতি কলির শেষে ধুয়া ধরিতে হয়—'জয় জগদীশ হরে!' আর শেষের এই শ্লোকটি ছড়া—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"[১]

১ অক্ষয় সরকার লিখিত 'জয়দেব' প্রবন্ধ (নবজীবন ১২৯১)

একবিংশ অধ্যায়

নিধুবাবুর টপ্পা ও মৈমনসিংহ গীতিকা

কবি রামনিধি গুপ্তের 'টপ্পা' সুরে রচিত গান 'টপ্পা'-নামে এবং মৈমনসিংহের কবিগণের পাঁচালি সুরে ও গ্রাম্য ভাষায় রচিত আখ্যায়িকা 'গীতিকা'-নামে পরিচিত। টপ্পা ভাবমূলক গীতি-কবিতা, গীতিকা নামে 'গীতিকা' হইলেও আসলে গাথা-কবিতা কিন্তু রসের দিক দিয়া টপ্পা ও গীতিকা একজাতীয়। মধুর রসই ইহাদের অঙ্গী রস, ইহারা প্রেমের কবিতা এবং এই প্রেম আধ্যাত্মিক নহে, মানবীয় প্রেম। এইরূপ লৌকিক প্রেমের কবিতা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অসাধারণ। তবে অসাধারণ হইলেও এই প্রকার কবিতা অভূতপূর্ব নহে। ভূতপূর্ব লৌকিক প্রেমকাব্যের দৃষ্টান্ত পদ্মাবতী ও বিদ্যাসুন্দর। প্রাচীন প্রেমসঙ্গীতেরও প্রমাণ আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নায়িকা বিদ্যা তাহার প্রণয়ী 'সুন্দর'কে প্রেম-সঙ্গীত 'খেঁড়ু' শুনাইয়া তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছে।[১] তবে, বর্তমানে এই 'খেঁড়ু' বাঁচিয়া নাই। শুধু খেঁড়ু কেন, প্রাচীন বঙ্গে লৌকিক প্রেম-কবিতা-মাত্রেরই অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। প্রেম এবং প্রেমের গান আদিমতম সত্যবস্তু—ইহারা যুগে যুগেই ছিল। তবে ইহাদের মধ্যে যেগুলি রাধাকৃষ্ণলীলার ছদ্মবেশ পরিয়াছিল, তাহাদেরই কিছু কিছু পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে। বাকী সমস্তই দৈনন্দিন পুষ্পের মতো স্থানীয় রসিককে মুগ্ধ করিয়া দিনান্তিক মৃত্যু বরণ করিয়াছে। কবিত্বহীনতা নহে, পদসংগ্রহকারীর ধর্মান্ধতাই এই সকল কবিতার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী। পরলোক-রহস্য, দেবভক্তি ও অপদেবতা-ভীতি প্রাচীন বাঙ্গালীর মনকে দীর্ঘ ছয়শত বৎসর ধরিয়া মোহগ্রস্ত ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। সেইজন্য তাৎকালিক বাঙ্গালী ধর্মবিষয়ক সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ রচনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে নাই। বঙ্গের বাহিরে আরাকানে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই পদ্মাবতী কাব্য বাঁচিয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে

---

১ নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

—সম্ভবত: এই খেঁড়ু হইতেই পরবর্তীকালে অশ্লীল প্রেমসঙ্গীত খেউড়ের উৎপত্তি।

থাকিলে উহারও কী দশা ঘটিত কে জানে ! তবে বিদ্যাসুন্দর, টপ্পা ও গীতিকা যে বাঁচিয়া আছে, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। লক্ষ্য করিতে হইবে—বাঙ্গালীর ধর্মান্ধতা চিরস্থায়ী হয় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ধর্মের ভণ্ডামি, ব্যভিচার ও অর্থনৈতিক উৎপীড়ন উৎকট হইয়া বাঙ্গালীজাতির চক্ষু ফুটাইয়া দেয় এবং বাঙ্গালীর মন সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ইহার পর হইতে বাঙ্গালী ধর্মসঙ্গীতের সঙ্গে প্রেমের গানকেও রক্ষা করিতে থাকে। শ্রোতা যুগেরই অধীন, কিন্তু কবি যুগের উর্ধ্বে। তাই কবির প্রেমসঙ্গীত রচনা নহে, শ্রোতৃবর্গের প্রেমসঙ্গীত রক্ষাই বঙ্গসাহিত্যের যুগপরিবর্তনের চিহ্ন। প্রাচীন কবিয়াল গোঁজলা গুঁইয়ের "এসো এসো চাঁদবদনি"[১] এই প্রেমের গানটি শতবর্ষ পরেও ঈশ্বর গুপ্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন—ইহার একমাত্র কারণ গানটি যুগ-পরিবর্তনকালে রচিত। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ধর্মান্ধতার যুগে নহে, নবযুগের প্রাক্কালে শুভযোগে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সঙ্গেই নিধুবাবুর টপ্পা এবং মৈমনসিংহ-গীতিকার জন্ম।

নিধুবাবুর টপ্পার আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে সাধারণ ঘটনা নহে। এই টপ্পা সুদীর্ঘ কালের রাধাকৃষ্ণ-গীতিকে সবলে উৎখাত করিয়া বাঙ্গালীমনের সিংহাসন অধিকার করে। অতি অল্পকালের মধ্যে, গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইবার বহুপূর্বেই কেবল কণ্ঠে কণ্ঠে ইহা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বাবুমহলে, ইয়ারমহলে এবং নারীমহলে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় অসাধারণ। পুকুরঘাটে, বাসরঘরে ও অন্যান্য মহিলা-মজলিসে, ইহার হয় একচ্ছত্র রাজত্ব। বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ভক্ত-মহলে কোণঠাসা হইয়া যায়। নিধুবাবুর টপ্পার আবির্ভাবে কীর্তন সঙ্গীত, প্রসাদী সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, পাঁচালি সঙ্গীত প্রভৃতি তাৎকালিক সমস্ত সঙ্গীতই বার্ধক্য-গীতিরূপে গণ্য হইতে থাকে, টপ্পাই হইয়া উঠে একমাত্র যৌবন-সঙ্গীত।

টপ্পা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার কারণ কেবল বাহ্য অনুকূল অবস্থা নহে, প্রকৃত কারণ ইহার অন্তর্নিহিত। টপ্পাসঙ্গীত প্রেমকে পৌরাণিক রোমান্সের কুহেলিকা হইতে মুক্ত করিয়াছে ; দেখাইয়া দিয়াছে যে ইহা কেবল রাধাকৃষ্ণের নহে, সকল মানব-মানবীরই নিজস্ব বস্তু। টপ্পা বুঝাইয়া দিয়াছে—যমুনায় জল আনিতে না গিয়াও যুবতী প্রেমে পড়িতে পারে, বংশীবাদন না করিয়াও প্রেমিক

১ পৃঃ ৩৪৯ দ্রষ্টব্য

তাহার প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন করিতে পারে, বিরহের জন্য নায়কের মথুরা প্রবাস অপরিহার্য নহে। দ্বিতীয়তঃ টপ্পা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—প্রেম সহজ ও সাধারণ বস্তু—ইহা একটা কঠিন সাধনা নহে। বৈষ্ণবমতে প্রেম জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নহে, উহা সাধারণ জীবনের উর্ধ্বে। জীবনের সকল বৃত্তিকে অভ্যাসের দ্বারা প্রিয়কেন্দ্রিক করিয়া তোলাই প্রেম-সাধনা। "সুনয়নী কহত কানু ঘন শ্যামর, মোহে বিজুরী সম লাগি"—গোবিন্দ দাসের রাধার এই প্রেমোন্মত্ততাই বৈষ্ণবীয় প্রেম। কিন্তু এই প্রেম সাংসারিক মানুষের জীবনে অনুপযোগী, অসঙ্গত ও ভয়ঙ্কর। এই প্রেম তরবারির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। সাধারণ গৃহস্থ-জীবনে ছুরি বা বঁটিই যথেষ্ট। তরবারি শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, বিপজ্জনকও বটে। সাধারণ ব্যক্তি রাধার এই অসাধারণ প্রেম নিজেদের জীবনে চায় না, সাধারণ প্রেমেরই প্রত্যাশা করে। টপ্পা-সঙ্গীত সেই প্রত্যাশাই পূরণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ টপ্পার প্রেম বৈষ্ণবীয় প্রেমের ন্যায় অতখানি গভীর না হইলেও উদারতর ও পক্ষপাতশূন্য। বৈষ্ণব পদাবলীতে পুরুষের প্রেম উপেক্ষিত। বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন প্রধানতঃ রাধা-ভাব বা সখীভাবের ভাবুক, সেইজন্য বৈষ্ণব পদাবলী হইয়াছে নারী প্রেমের সঙ্গীত। কৃষ্ণকে নায়ক করিয়া যে অল্প কয়েকটি পদ আছে সেখানে কৃষ্ণের ছলনা আছে, কামুকতা আছে, কিন্তু প্রেম নাই। রাধার উক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রেমিকতার কোন প্রমাণ নাই। "সপদি মদনানলো দহতি মম মানস', দেহি মুখকমল মধু পানম্"—এই জয়দেবীয় শারীর-প্রেমই পদাবলীর কৃষ্ণ-প্রেমের আদর্শ। কিন্তু নিধুবাবুর টপ্পায় প্রেমের এইরূপ ইতরতা ও সংকীর্ণতা নাই। টপ্পা নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রেমেরই অপক্ষপাত রূপায়ণ। ইহার একদিকে রহিয়াছে নারীর হৃদয়ার্তি—

মনে বুঝি 'প্রাণ' আজি, পড়িয়াছে মোরে।
তেঁই সে এসেছো নাথো, এতদিন পরে।...

[সম্বোধনে 'প্রাণ' টপ্পায় 'প্রিয়'-অর্থে ব্যবহৃত]

অথবা—

আগে কি জানিলো প্রাণ বিরহে যাবে,
জানিলে এমন প্রীতি করি কি তবে!...

অপর দিকে রহিয়াছে পুরুষের আকুতি—

ও বিধু-বদনে ধনি, হেরো না নয়নে।
বধিতে কি আছে তব অনুগত জনে ?

[তুলনীয়—'ভ্রুকুটি না হয় সহিতে পারিব কটাক্ষ নহে প্রিয়া !']

কিংবা—

এমন চুবি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায় ?
হানিয়া নয়ন-বাণ, হরিয়া লইলে প্রাণ,
কথায় কথায়।…

তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই নরত্ব বা নারীত্বকে অতিক্রম করিয়া প্রেম দেখা দিয়াছে শুদ্ধ স্বরূপে—

আমি কি কখনো তোমা
না দেখে রহিতে পারি !
বিনা দরশনে প্রাণো শূন্য দেহ হয় 'প্রাণো'
সচেতন হয় পুনঃ তোমার ও-মুখ হেরি ॥

কিংবা—

ধীরে ধীরে যায় দেখ
চায় ফিরে ফি-রে-।
কেমনে আমারে বলো যাইতে ঘরে ॥
সে ছিল অন্তরে মোর বাহে দেখি তারে।
নয়ন-অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে ॥

প্রেমের এই প্রকার উক্তি নারী বা পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সম্ভব।

নিধুবাবুর টপ্পার প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার মননশীলতা। এই মননশীলতা তাৎকালিক নাগরিক জীবনের ফল। এইখানেই টপ্পা আধুনিক। ইহা প্রেমের কবিতা বটে, কিন্তু ভাব-সর্বস্ব সরল ও কোমল কবিতা নহে। ইহা জটিল, চিন্তায় সবল এবং বুদ্ধির দ্বারা সুসংযত। ইহার প্রেম জীবনের গতির সঙ্গে সমান-তালে চলিয়াছে ; প্রাচীন প্রেম-কবিতার মতো টপ্পা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া প্রেমের আবর্ত সৃষ্টি করে নাই। আধুনিক মনের কবি বলিয়া

নিধুবাবুর দৃষ্টিও রিয়ালিস্টিক—তাঁহার কবিতা প্রাচীন রোমান্টিক মনোবিলাসের প্রবল প্রতিবাদ—

মিলনে যতেক সুখ, মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না॥

লক্ষ্য করিতে হইবে যে কবি কেবল ভাবপ্রকাশ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিও প্রদর্শন করেন। তাছাড়া আরও লক্ষণীয় যে কবির বাস্তববাদ ও দেহবাদ প্রচার সত্ত্বেও তাহার কবিতা কোনোখানে ইতর হইয়া যায় নাই, বুদ্ধি-প্রাধান্যই ইহার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। কবিতায় ভাবের সহিত যুক্তির অবতারণা আছে বলিয়াই, পাঠকেরও হৃদয়ের সহিত মননশক্তিও উদ্রিক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়বিলাসের রসে মন মজিয়া যাইতে পারে না। কবির মননশীলতার জন্য টপ্পার নায়ক মনস্বী এবং নায়িকা মনস্বিনী। তাহাদের কথায় কেবল হৃদয়ের উত্তাপ নহে, বুদ্ধির আলোকও বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে—

নয়ন নীরে কি নিভে মনের অনল,
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল?
যবে তারে হেরি সখি   হরিষে বরিষে আঁখি
সেই নীরে নিভে জানি বিরহ প্রবল।

কিংবা—

যার মন তার কাছে
লোকে বলে 'নিলে নিলে'
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব—
সে নিল কি আমায় দিলে!

কিংবা—

নয়নেরে দোষো কেন?
আঁখি কি মজাতে পারে
না হলে মনোমিলনো?

নিধুবাবুর টপ্পায় প্রেমিক-চিত্র নহে, প্রেমিক-চিত্তই অঙ্কিত হইয়াছে। মিলনেচ্ছা, রূপমোহ, অভিমান, মিলনানন্দ, নৈরাশ্য, বিরহ, ব্যর্থতা-বেদনা প্রভৃতি প্রেম-জীবনের বিচিত্র ভাব টপ্পাগ্রন্থকে একটি সুপরিণত প্রণয়-কাব্যের

মর্যাদা দিয়াছে, তৎসত্ত্বেও নিধুবাবুর কাব্যকে যথার্থ পূর্ণাঙ্গ কাব্য বলিতে পারা যায় না। নিধুবাবু প্রেমের একদেশদর্শী। টপ্পায় অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্রই প্রগল্‌ভ প্রেমের চিত্র মাত্র। গানের ভাব হইতেই বুঝা যায়, টপ্পার নায়িকা সকলেই যুবতী এবং নাগরিকা, কেহই কিশোরী বা পল্লীবধূ নহে। সরল ও সলজ্জ মুগ্ধ প্রেমের চিত্র টপ্পায় অঙ্কিত হয় নাই। টপ্পার গানগুলি অধিকাংশই সুরসিক নাগর ও সুরসিকা নাগরীর উক্তি। সেইজন্য টপ্পায় একটা নূতন মজলিসী রস-বিলাসের মৌতাত আছে। বলা বাহুল্য, কবি-জীবনের নাগরিকতা ও মননশীলতাই ইহার কারণ। নিম্নে উদ্ধৃত গানগুলি দ্রষ্টব্য—

নায়কের উক্তি—

(১) মুকরে আপন রূপ
সতত দেখো না ধনি,
আপনার রূপ হেরি
অধীনে ভুল কি জানি!

(২) কাজল নয়নে আর, দিয়োনা যেন।
(আঁখি) শরে যেবা নাহি মরে,
বিষযোগ তাহে কেন ?

নায়িকার উক্তি—

পীরিতি করিয়া 'প্রাণো'
কে কোথা আসে হে পুনঃ
ভুলিয়া এসেছো বুঝি
মন-রাখিবারে।
তেই কি এসেছো নাথ
এতদিন পরে॥

রূপকের মধ্য দিয়া কৌশলে খণ্ডিতা নায়িকার নায়ককে ভর্ৎসনা—

অরুণ সহিত শশী আইলে প্রভাতে।
অমিয় কোথায় তব চকোরী তুষিতে ?
কি ভাব মনে ভাবিয়ে দেখা দিলে প্রাণ আসিয়ে
আশায় নিরাশ হলো, তোমার আসাতে॥

ইহাদের মধ্যে নায়ক-নায়িকার নিভৃত-নির্জনের গোপন কথা নহে, খানদানি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ প্রকাশ্য মজলিসী রসিকতাই প্রকাশ পায়। তবে এই প্রগল্‌ভতা আছে বলিয়া টপ্পার প্রেম যে লঘু, চটুল বা প্রগাঢ়তা-শূন্য তাহাও নহে, এই প্রগল্‌ভতা অল্পবয়সের প্রাণ-চাপল্য নহে, ইহা পরিণত বয়সের বুদ্ধি-দীপ্ত সাহসিকতা, প্রকাশ্যে ঘোষিত হইলেও টপ্পার প্রেম স্বল্পবাক্, প্রগাঢ় ও গম্ভীর। যথা—

(১) নয়ন ডুবিল প্রাণ
নয়নে তোমার।

(২) এসহে নয়নে রাখি
পলক মুদিয়া আঁখি
না দেখ, না দেখি কারে—এই বাসনা।

(৩) বিধি দিলে যদি, বিবহ যাতনা।
প্রেম গেল, কেন পরাণ গেল না ?

(৪) না হতে পতন তনু,
দাহন হইল আগে।
আমার এ অনুতাপ
তারে যেন নাহি লাগে॥
চিতে চিতা সাজাইয়ে
তাহে দুখ তৃণ দিয়ে
আপনি হইব দগ্ধ
আপনারই অনুরাগে॥

নিধুবাবুর টপ্পাগুলি ‘গীত-রত্ন’ নামে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, টপ্পার এই নাম সম্পূর্ণ সার্থক। টপ্পা দিনজীবী পুষ্প নহে, চিরস্থায়ী রত্ন, প্রেমিক-প্রেমিকার কণ্ঠে অতীতে শোভা পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও পাইবে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর টপ্পার তুলনা নাই। ইহার প্রধান ত্রুটি গদ্যধর্মী ভাষা। কবি যে-পরিমাণে প্রেমিক, সে পরিমাণে সৌন্দর্য-রসিক নহেন, ইহাও টপ্পার অন্যতম ত্রুটি। তবে টপ্পাকে অনিন্দ্যসুন্দরী বলা না গেলেও অনায়াসে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলে। একা রবীন্দ্র-কবিতা ব্যতীত ইহার অপর কেহ প্রতিযোগিনী নাই।

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে নিধুবাবুর প্রভাব অল্প নহে; রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত প্রেম-সঙ্গীতের একমাত্র আদর্শ ছিল নিধুবাবুর টপ্পা। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রেম-সঙ্গীতেও নিধুবাবুর প্রভাব খুঁজিয়া বাহির করা যায়। শ্রীধর কথকের "ভালবাসিবে বলে, ভাল বাসিনে"[১] গানটি নিধুবাবুর গানেরই হুবহু অনুকরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনী গাহিয়াছে—

কী করিলে প্রাণসখি, মন-চোরে ধরিয়ে।
ভাসিল পীরিতি-নদী, দুইকূল ভরিয়ে॥

এই গানের মধ্যেও নিধুবাবুর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইতে শোনা যায়। উনবিংশ শতকের ইংরেজি-কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ "বাঙ্গালা ভাষায় নিধুবাবুর ধরনে প্রায় তিনশত সঙ্গীত রচনা করেন।"[২] ইংরেজি-মনও নিধুকে স্বীকার করিয়াছিল।

টপ্পার ন্যায় মৈমনসিংহ-গীতিকাও বিষয়ে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক মনের সাহিত্য। ইহাও বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের কবিতা। নামে 'গীতিকা' হইলেও ইহা আসলে গীতি-কবিতা বা গান নহে, তাছাড়া টপ্পার ন্যায় ভাবসর্বস্ব নহে, নাগরিক সাহিত্যও নহে। এই গীতিকা আসলে গ্রাম্য আখ্যায়িকা-মূলক 'ব্যালাড' বা গাথা-কবিতা। টপ্পার মননশীলতা ইহার মধ্যে আশা করা অনুচিত। গীতিকার দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক, তবে এই আধুনিকতা অন্যপ্রকার। গীতিকার গঠনভঙ্গিতে আধুনিক মনোবৃত্তির পরিচয় আছে। আধুনিক

১ ভালোবাসিবে বলে ভালো বাসিনে।
আমারও স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

২ পৃঃ ২৬৪ "বঙ্গভাষার লেখক।"
কাশী প্রসাদের গান—
ধনি, পীরিতের কি হয় রীতি এমন।
আপনি জ্বলেনা, করে পরে জ্বালাতন॥
যেমন দীপের উপরে, পতঙ্গ পুড়িয়া মরে।
সে দীপ তাহার তরে ত্যজেনা জীবন॥

বাঙ্গালীমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহজীবনের তথা সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রাচীন বাঙ্গালীর জীবনে সময়ের মূল্যবোধ দেখা যায় না। অধ্যাত্ম-জীবনে যাহাই হউক, সাংসারিক জীবনে সাধারণ বাঙ্গালী ছিল একান্ত ভাবে আলস্য-পরায়ণ ও জড়তাগ্রস্ত। তাৎকালিক রাজা জমিদার ও বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের তো কথাই নাই, দরিদ্র কৃষক-জীবনেও দেখা গিয়াছিল স্থাবরতা ও স্থবিরতা। শস্যবপন ও শস্যচ্ছেদনের অল্প কয়েকদিন ব্যতীত তাহার সারা বৎসর কাটিত দিবা-নিদ্রার তন্দ্রাচ্ছন্ন সুপরিতৃপ্ত নিশ্চেষ্ট আরামে। কাজেই বাঙ্গালীর কথাসাহিত্য কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গত স্বাভাবিক সাহিত্য হইয়া উঠে নাই, হইয়াছে অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রী জীবনের সহচর একটা ক্লান্তিকর অস্বাভাবিক সাহিত্য। প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি শ্রোতৃ-চিত্তের উপযোগী শ্লথ-বিন্যস্ত, লঘুসত্ত্ব ও স্ফীতকায়; কবিগণ মূল-আখ্যানের মধ্যে বহু অবান্তর কথা, উপাখ্যান এবং উপ-উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়া কাব্যকে যথেচ্ছ প্রলম্বিত করিয়াছেন, তথাপি শ্রোতৃবর্গের ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই। সময়ের মূল্যবোধ থাকিলে গায়কের পক্ষে একাদিক্রমে আটদিন, বারোদিন, এমনকি একমাস ধরিয়া একই মঙ্গলকাব্যকে ইনাইয়া-বিনাইয়া গান করা সম্ভবপর হইত না। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য হইতেই বাঙ্গালীর মনে এই জড়তার অবসান ও সময়-চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। নবযুগে জাত বলিয়াই মৈমনসিংহ-গীতিকার পালা-গানগুলি অনতিদীর্ঘ, সুসংহত, সারগর্ভ ও যথাকালে সম্পূর্ণ। এক্-একটি গাথা দিনের হিসাবে নহে, ঘণ্টার হিসাবেই পাঠ্য। প্রাচীন আখ্যায়িকা-কাব্যের ন্যায় ইহা পাঠকের অযথা সময় নষ্ট করে না। এইখানে রহিয়াছে মৈমনসিংহ-গীতিকার আধুনিকতা।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ-গীতিকার গাথাগুলির রচনা-কাল সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত থিয়োরি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। মৈমনসিংহ-গীতিকায় মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক-লীলা এবং দেওয়ানা মদিনা এই নয়টি গাথা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেওয়ান ভাবনা ও দেওয়ানা মদিনা মুসলমানী পালা এবং মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও কঙ্ক-লীলায় মুসলমান-সম্পর্কের ব্যাপার আছে। এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হইয়া দীনেশচন্দ্র মৈমনসিংহ

গীতিকা-গ্রন্থের ভূমিকায় গাথাগুলিকে একেবারে মুসলমান-পূর্ব যুগের (১০ম-১২শ শতকের) রচনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।[১] পরে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পঞ্চম সংস্করণে তিনি এই প্রত্যক্ষ ভুল সংশোধন করিয়া ইহাদিগকে মুসলমানযুগের সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু "চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত"[২] বলিয়া পুনর্বার সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। গাথাগুলির ঘটনায়, ভাষায় ও অলংকারে সবত্র বৈষ্ণব প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র সত্যকে দাবাইয়া রাখিয়া গাথাগুলিব প্রাক-চৈতন্যত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন—"পল্লী গীতি-কবিতায় বৈষ্ণব প্রভাব আদৌ নাই।"[৩] চৈতন্য-পূর্ব যুগে 'মহুয়া'র নায়কের 'নদের চাঁদ' নাম কি করিয়া সম্ভব হইল, মহুয়ার পালঙ্ক-সখী 'চান্দের সমান' গৌরবর্ণ নায়ককে কেন 'কালা' ('দুই জনে সাজাইব ঐ না নাগর কালা') বলিয়া অভিহিত করিল, 'দেওয়ান ভাবনা'য় নায়িকা 'সোনাই' তাহার প্রণয়ী মাধবকে কেন 'বনমালী ('কোন কুঞ্জে বিরাজ করে আমার বনমালী') বলিল, 'কঙ্ক-লীলা'য় কঙ্কের কি করিয়া গৌরাঙ্গ-পূর্ব যুগে গৌরাঙ্গ-ভক্তি জন্মিল ('গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন') —এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্বাক। মৈমনসিংহ-গীতিকা মনোযোগ সহকারে পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায়—একমাত্র কেনারামের পালাই অল্প একটু প্রাচীন হইতে পারে, অন্য সমস্ত পালাই অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ব ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের রচনা। 'কমলা'-পালাটিতে কেবল যে ভারতচন্দ্রীয় রূপ বর্ণনা[৪] আছে তাহা নহে, 'চিকন গোয়ালিনী' চরিত্রে ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর সুস্পষ্ট অনুকরণ দেখা যায়।[৫] এইখানে

১ ভূমিকা পৃঃ ১৩ মৈমনসিংহ-গীতিকা (১ম সং)

২ ও ৩ পৃঃ ৫৭১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—(৫ম সং)

৪ নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে ॥ —কমলা

৫ সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী।
দই দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥
যখন আছিল তার নবীন বয়স।
নাগর ধরিয়া কত করত রঙ্গরস ॥
যদিও যৌবন গেছে তবু আ ছ বেশ।...

তুলনীয়— কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম···
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥

প্রমাণ—এই গাথা ভারতচন্দ্র-পরবর্তী। ইতিহাসের দিক দিয়া মৈমনসিংহ-গীতিকা আধুনিক বলিয়াই ইহার অন্তর্গত আধুনিক মনোবৃত্তিকে অকালজ ও অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা চলে না।

পণ্ডিতমহলে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে মৈমনসিংহ-গীতিকা অশিক্ষিত এমনকি "নিরক্ষর"[১] কবিগণের মৌখিক রচনা। গাথাগুলি নাকি ঘুণাক্ষরের ন্যায় স্বভাবজ। "যাহারা রচনা করিয়াছে তাহারা সাহিত্য বলিয়া অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহাও কোনোদিন ভাবে নাই।... ঘুণ আপন প্রয়োজনে কাঠ ফুটা করিয়া যায়, তাহাতে অনেক সময়ে অক্ষরের সৃষ্টি হয়।... আমরা সেই ঘুণাক্ষরের ন্যায় আজ ঐগুলিকে সাহিত্য বলিয়া চিনিতে পারিতেছি।"[২] ঘুণ হয়ত অক্ষর সৃষ্টি করিতে পাবে, কিন্তু কথা সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কাব্য মানস-সৃষ্টি, প্রকৃতির মধ্যে মন নাই, সেইজন্য কাব্য স্বভাবজ হইতে পারে না। 'মিরাকৃল' বা দৈবলীলা বর্তমান যুগে অবিশ্বাস্য। গীতিকার কবিগণ শুধু যে সুশিক্ষিত ছিলেন তাহাই নহে; মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রামায়ণ, বৈষ্ণব পদাবলী এমন কি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যও ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন, গাথাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তবে পূর্বজ সাহিত্যের প্রভাব গাথাগুলির অন্তর্লীন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। গাথাগুলির দিগ্‌বন্দনা ও বারমাস্যা বর্ণনা মঙ্গলকাব্যেরই প্রভাব জাত। কেনারামের পালা রামায়ণের রত্নাকর-দস্যুরই নূতন কাহিনী। 'ভাবনা'র সোনাই হরণ মুসলমান রাবণের সীতাহরণ মাত্র। 'কমলা'-পালার চিকন গোয়ালিনী যে বিদ্যাসুন্দরের হীরা মালিনী তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীও গাথাগুলির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনের যমুনাকূলের পরিবর্তে গ্রামের পুকুরঘাটে জল আনিতে গিয়াই গীতিকার নায়িকারা প্রেমে পড়িয়াছে। মহুয়ার নায়ক নদেরচাঁদ তাহার প্রণয়িনীকে বাঁশীর সুরেই অভিসারে ডাকিয়াছে। কঙ্ক-লীলায় নায়ক কঙ্ক শুধু যে কৃষ্ণের মতোই গোচারণ

১ ভূমিকা পৃঃ ১৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা

২ পৃঃ ৩২০ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য—দ্বিতীয়াংশ।

করিয়াছে তাহা নহে, তাহার বাঁশীর সুরে ধেনুও ছুটিয়াছে[১] নদীও উজান বহিয়াছে।[২] বৈষ্ণবীয় অলংকার প্রয়োগের তো কথাই নাই। "অঙ্গের লাবণি সুনাইএর বাইয়া পড়ে ভূমে"—প্রভৃতি অলংকারগত বৈষ্ণব প্রভাবের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত স্বয়ং দীনেশচন্দ্রই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র (৫ম সং) ৫৭২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। শুধু পূর্বজ কাব্য-স্বীকরণ শক্তি নহে, গীতিকা-কবিগণ যে আধুনিকোচিত মনস্তত্ত্ব-পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। বিপৎকালে মহুয়াব স্বভাব-গোপন ও দ্বৈত সত্তার প্রকাশ, বিরহিণী লীলার আশা-নৈরাশ্যের দোলাচল-চিত্ততা, তালাক-নামাকে অস্বীকাব করিয়া মদিনার স্বামি-প্রেমের দিবা-স্বপ্ন, গর্গের চিত্তে কঙ্কেব প্রতি স্নেহ ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব-জাত উন্মত্ততা, সোনাইএর বিষপানের পূর্বমুহূর্তে তাহার শৈশব-কালে মৃত ও বিস্মৃত পিতাব জন্য দুঃখ[৩], মলুয়ার নৈরাশ্যময় ভয়ঙ্কব জীবন-বৈরাগ্য কবিগণেব মানসিক প্রাচীনতা, অপরিণতি বা অশিক্ষিত-পটুত্বের পরিচয় দেয় না। জীবনের জটিল অসাধাবণ অবস্থায় উৎপন্ন বিচিত্র মানসিক অবস্থার রূপায়ণ কখনই কোন নিরক্ষর কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা হইতেছে—গীতিকার কবিগণ সকলেই ছিলেন পল্লীবাসী এবং দরিদ্র, রাজা-বাদশা বা জমিদারকে শ্রোতারূপে পাইবাব কোন আশা করেন নাই, অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীর জন্যই গাথা রচনা করিয়াছিলেন, নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গেব সহিত একাত্ম হইয়া সহজ সবল গ্রাম্য ভাষায় ও ভঙ্গিতে রচনা করিয়াছিলেন গীতিকা। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাবা নিজেবা অশিক্ষিত ছিলেন না। গ্রাম্য ভাষায় সেইজন্য তাঁহাদেব কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য ঢাকা পড়িয়া যায় নাই, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিব ন্যায় উহা মধ্যে মধ্যে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। অশিক্ষিত কবিত্ব ছেলে-ভুলানো ছড়াই সৃষ্টি করিতে পারে, পণ্ডিত-ভুলানো মনস্তাত্বিক ব্যালাড রচনা করিতে পারে না।

---

১ বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন বেণু।
উচ্চ পুচ্ছ ছুটে আসে গোষ্ঠের যত ধেনু॥

২ কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে।

৩ শিশুকালে বাপ মইল—এতেক নাই মনে।
সেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল মনে॥

মৈমনসিংহ-গীতিকার কবিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন ঔপন্যাসিকের মতো জীবন-রসের রসিক। কেহই জীবনকে সহজ সরল রূপে দেখেন নাই, বিচিত্র পরিস্থিতিতে প্রেমের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির পরিকল্পনায় জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়া তবেই উপভোগ করিয়াছেন। অবশ্য গীতিকার নায়িকারা সকলেই মূলে প্রায় একপ্রকার—সকলেই কিশোরী, কুমারী অবস্থায় অনুরাগিণী, প্রেমে নিষ্ঠাবতী এবং প্রায় সকলেরই জীবন দুঃখময়। কিন্তু নায়ক-চরিত্রের ভিন্নতা এবং পরিস্থিতির বৈচিত্র্য গাথাগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে—একটি অপরটির অনুকৃতি হয় নাই। কবিগণের কবিত্ব-শক্তিরও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সেইজন্য মহুয়া হইযাছে চলচ্চিত্রেব সিনেরিও বা চিত্র-নাট্য, মলুযা হইয়াছে কাব্য, চন্দ্রাবতী ও দেওয়ান ভাবনা ছোট গল্প, কাজলরেখা শিশুমনের এবং রূপবতী ও কমলা বয়স্কদিগের রূপকথা, কঙ্ক ও লীলা ছোট উপন্যাস, দেওয়ানা মদিনা জীবন-চিত্র এবং কেনারাম পৌরাণিক উপাখ্যান। ইহাদেব কোনোটিই পঙ্গু ও দুর্বল নহে, তথাপি যেহেতু বর্তমান যুগ বায়োস্কোপের যুগ, সেইহেতু মহুয়ারই হইয়াছে সর্বাধিক খ্যাতি।[১] কিন্তু নিরপেক্ষ রস-বিচারে সবশ্রেষ্ঠ গীতিকা চন্দ্রাবতী। ইহা কেবল বাংলাব নহে, বিশ্বসাহিত্যেবও একটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প—গাঢ়-সংবদ্ধ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতপূর্ণ, আদ্যন্ত রিয়ালিস্টিক এবং যথাথভাবে ট্রাজিক। ইহাতে ভাবোচ্ছ্বাসের সর্ববিধ চপলতা নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কবি আর্টের কঠোর শাসনে মর্মভেদী হাহাকারকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন, ফলে নায়িকা দেখা দিয়াছে অন্তর্গূঢ় মর্মান্তিক বেদনার মূর্তিমতী প্রতিমা রূপে। মৈমনসিংহ-গীতিকায় নায়িকার আত্মত্যাগ-চিত্রেব অভাব নাই, মহুয়া, মলুয়া, সোনাই, লীলা ও মদিনা, সকলেই প্রেমেব জন্য আত্মবলি দিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কেহই সত্যকার ট্রাজিক হয নাই। ইহাদের মৃত্যু করুণ ও মর্মান্তিক সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রেমের গৌরবে, পরার্থপরতার মহিমায়, মৃত্যু-বরণেব বীর্যে এই মৃত্যু মহনীয়—অস্থিদানকারী পৌরাণিক দধীচির দেহত্যাগের তুল্য ইহা জ্যোতির্ময়। কিন্তু এই সকল নায়িকার ন্যায় মরিয়া জ্বালা জুড়াইবার সৌভাগ্য চন্দ্রাবতীর হয় নাই; সারাজীবনব্যাপী সুদীর্ঘ দিন ও দীর্ঘতর রাত্রির

১ ভারতের ভূতপূর্ব লাট লর্ড রোনাল্ডসে, স্টেলা ক্র্যামরিস, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'মহুয়া' পালারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

চির-জাগ্রতা অন্তর্জ্বালাময়ী এই চন্দ্রাবতী। গীতিকার অন্যান্য নায়িকাদেরও দুঃখ আছে, কিন্তু তাহাদের দুঃখ বহিরাগত, চন্দ্রাবতীর মতো অন্তর্জাত ও অন্তর্গূঢ় নহে; ইহাদের সংসার-জীবন ব্যর্থ হইলেও প্রেম ব্যর্থ নহে। কিন্তু চন্দ্রাবতী সর্বতোভাবে রিক্ত—সংসারে তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। তাহার প্রেম অঙ্কুরে পদদলিত। বাহিরের কোন পরব্যক্তির নিকট হইতে নহে, আবাল্য-সঙ্গী নিজের প্রণয়ী জয়ানন্দেরই নিকট হইতে তাহার আসিয়াছে প্রেম-জীবনের ব্যর্থতা। বিবাহের রাত্রে বধূবেশিনী চন্দ্রার মাথায় পড়িয়াছে বিনামেঘে বজ্রাঘাত—খবর আসিয়াছে, কাহাকেও না জানাইয়া জয়ানন্দ হঠাৎ এক মুসলমান সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছে। ফলে চন্দ্রাবতী—

সুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাসি।
একরাত্রে ফুটা ফুল ঝুইরা হইল বাসি॥

তাহার পর চন্দ্রাবতীকে দেখা যায় চির-কুমারী-ব্রতা যৌবনে যোগিনীরূপে—কঠোর সাধনায় নিজেকে দেব-চরণে করিয়াছে নিবেদিত। কিন্তু অদৃষ্টে শান্তি নাই। মোহভঙ্গের পর অনুতাপদগ্ধ প্রণয়ী আবার ছুটিয়া আসিয়াছে চন্দ্রার কাছে—পত্রে ক্ষমা চাহিয়া ব্যাকুলভাবে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখিতে চাহিয়াছে; চন্দ্রাবতী কাঁদিয়াছে, কিন্তু উত্তর দেয় নাই। মন্দির রুদ্ধ, চন্দ্রা দেবতার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। উন্মত্ত জয়ানন্দ বৃথাই মন্দির-দ্বারে করিয়াছে করাঘাত; শেষে হতাশ হইয়া রক্ত-মালতীর রসে মন্দির-দ্বারে লিখিয়াছে শেষ বিদায় বাণী—

শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৌবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী॥

চন্দ্রার সন্ন্যাসও ব্যর্থ। নারী-হৃদয় পাষাণ হইবার নহে। এইখানেই রহিয়াছে ট্রাজেডির বীজ। "জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি"—এই "পানি" তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা দেখাইয়া দেয়—সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ে প্রেম মরিয়াও মরে নাই, হৃদয়ের ভস্মস্তূপ ভেদ করিয়া আবার তাহার রক্তিম দল বিস্তার করিয়াছে। এখানেই কবি নয়ানচাঁদ নাটকীয় ভঙ্গীতে দেখাইয়াছেন পালার শেষ দৃশ্য। নির্জন নদীতীর, চারিদিক নিস্তব্ধ, জোয়ারের জল বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং—"জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ"। চন্দ্রাবতীর উপেক্ষায়

নিদারুণ নৈরাশ্যে হতভাগ্য প্রেমিক আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত অবস্থাতেও কিন্তু—

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউএর উপরে ভাসে পূন্নমাসীর চান॥

আর সেই মৃত জয়ানন্দের সম্মুখে—নায়ককে উপেক্ষা করার সুতীব্র অনুশোচনায় মর্মভেদী দুঃখে, অসহ্য শোকে পাষাণ মূর্তিতে দণ্ডায়মানা চন্দ্রাবতী। দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—সেই মহাপ্রলয়ান্তিক ভয়ঙ্কর শূন্যতার মধ্যে চন্দ্রা একাকিনী—

আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে 'উমেদা' কামিনী॥

[উমদা—উন্মাদিনী

কাব্য জগতে এ-দৃশ্যের তুলনা নাই।

মৈমনসিংহ-গীতিকার কাহিনীগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাদের উপন্যাসোচিত সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তব ধর্ম। বাস্তব জীবনেরই এখানে আধিপত্য। কাব্যোচিত প্রেম ও প্রকৃতির মহিমা ইহাতে আছে বটে, কিন্তু প্রেমের অপেক্ষা প্রেমিকের মাহাত্ম্যই অধিক, মানবজীবনের পরিবেশ রচনা ছাড়া প্রকৃতিরও এখানে কোন নিজস্ব ক্রিয়া বা মূল্য নাই। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—সাধারণতঃ কাব্যে, বিশেষ করিয়া গীতিকাব্যে—খনিজ স্বর্ণকে মিশ্রিত ধাতু-বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করার মতো জীবনের মিশ্র অবস্থা হইতে প্রেম ও প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া দেখানো হইয়া থাকে। ইহাতে পাঠকের দৃষ্টিতে প্রেম ও প্রকৃতি যতই সুন্দর হইয়া উঠুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্বভাবের কৃত্রিমতাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বিচ্ছিন্ন প্রেম বা প্রকৃতি—বিশ্বামিত্রের ঈশ্বরবিরোধী তপঃসৃষ্টির মতোই সুন্দর অথচ অসঙ্গত দুই-ই। সেইজন্য উহা পাঠকের মনোবিলাসের সামগ্রীই হইয়া উঠে, সমগ্র হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারে না। কিন্তু মৈমনসিংহ-গীতিকার কবিগণের বিশিষ্টতা এইখানে। বাস্তব সত্যের তুচ্ছতার মধ্য দিয়াও তাঁহারা কাব্যকে দেখাইতে সঙ্কুচিত হন নাই—জীবনের মধ্যেই প্রেম ও প্রকৃতিকে দেখাইয়াছেন; সেইজন্যই উহারা

কেবল মনকে নহে, হৃদয়কেও স্পর্শ করে।[১] গীতিকার নায়ক-নায়িকারা পরস্পরের প্রতি যে প্রেমনিবেদন করিয়াছে, তাহা পুষ্পবনের অ-সাংসারিক নিভৃত প্রেম নহে, সংসারের জনাকীর্ণ পথের প্রকাশ্য প্রেম। উহা যথার্থভাবে সাংসারিক—সংযত ও সঙ্গত। অথচ গীতিকায় প্রেমের সব কথাই বলা হইয়াছে—

তুমি আমার মুখের মধু, গলার পুষ্পমালা।
ফুল তুইল্যা দিবাম কন্যা তুমি গাঁইথ্যো মালা॥
বাড়ীর পাছে বান্ধা ঘাট আছে পুষ্করিণী।
তুমি কন্যা জলে যাইতে সঙ্গে যাইবাম আমি॥
ভরিতে না পার কন্যা ভইরা দিবাম কোলে।
তোমারে লইয়া কন্যা সাঁতার দিবাম জলে॥
গলায় গাঁথিয়া দিবাম 'জোনাকীর মালা'।
বাসরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রতি-কলা॥

বলিতে আর বাকি রহিল কী? অথচ এই প্রেম বিদ্যাসুন্দরের প্রেমের ন্যায় কর্মজীবনবিচ্ছিন্ন প্রাত্যহিকতাচ্যুত রুগ্‌ণ বিলাসের বৃন্তহীন পুষ্প হইয়া উঠে নাই, ইহাতে বাড়ী, ঘর, পুষ্করিণী, পিতা, মাতা—সংসারের বৈচিত্র্য, কিছুই বিলুপ্ত হয় নাই। অদৃষ্টের সহিত জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও পরাজিত মলুয়া নিদারুণ নৈরাশ্যে নদীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, কিন্তু কবি মলুয়ার বেদনাকে সংসারচিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখান নাই। মহাপ্রস্থানকালেও মলুয়া শাশুড়ী, ননদ, ভ্রাতা, স্বামী, এমন কি সপত্নীর নিকট হইতেও বিদায় লইতে ভুলে নাই; একে একে সকলকে কাঁদাইয়া তবেই মরণের সায়রে ঝাঁপ দিয়াছে। কবি দেখাইয়াছেন—যেখানে মলুয়ার সহিত চাঁদবিনোদের প্রেম ঘনাইয়া একান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই—

---

১ কেবল প্রেম বা প্রকৃতি নহে, জীবনের সর্ববিধ অবস্থাই গীতিকাতে তুচ্ছ বাস্তবের সহিত ওতঃপ্রোত। বর্ণনীয় কাহিনীর ধারাবাহিকতার আকস্মিক ফাঁকগুলি ভরাট করিতে আবর্জনার ন্যায় তুচ্ছবস্তুই ব্যবহৃত হইয়াছে—

'ভাত রাইন্দো মা জননী না ফালাইও ফেনা'।—
তোমার পুত্র বৈদেশ যাইতে না করিও মানা॥

এই 'ভাতের ফেনা'র মতো তুচ্ছ আবর্জনাও কিন্তু কাহিনীকে জীবন্ত ও বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে।

আশ্বিনে পূবের মেঘ পশ্চিমে ভাঙ্গা যায়।

মেঘের এই ভাসিয়া যাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের শোভাবৃদ্ধির জন্য নহে, সংসার-বিস্মৃত প্রেমোন্মাদ নায়ককে পশ্চিমে প্রতীক্ষমানা জননীকে দেখাইবার জন্যই মেঘের এই 'মেঘদূত'ত্ব। তাই দ্বিতীয় চরণেই বলা হইয়াছে—

ঘরে থাক্যা কান্দ্যা মরে অভাগিনী মায়॥

গীতিকায় জীবনের এই ভারসাম্য অতুলনীয়। বাস্তব সংসারেও ভারসম প্রেমই প্রেমের সত্যকার স্বাভাবিক রূপ।

প্রকৃতির চিত্রেও গীতিকায় ভার-সম সংসারধর্মের ব্যত্যয় হয় নাই। গীতিকায় প্রকৃতি স্বচ্ছন্দচারিণী বা স্বৈরিণী নহে, সংসারের একটি অঙ্গ মাত্র, এবং মানবজীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইহাতে মানুষের সুখে দুঃখে তাহার বিভিন্ন ক্রিয়া আছে, কিন্তু সে কদাচ প্রাণময়ী সহধর্মিনীর মর্যাদা পায় নাই। গীতিকায় প্রকৃতি চেতনাময়ী নহে, তাহার সহানুভূতি নাই, কিন্তু রস-পরিপোষণ আছে, এই রস-পোষণ প্রকৃতির ঠিক ক্রিয়া নহে, প্রতিক্রিয়া মাত্র। মানবজীবনের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মানবজীবনেব ক্রিয়ায় প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। মহুয়া ও নদেরচাঁদের মিলনরজনী ছিল জ্যোৎস্নালোকিত, কিন্তু যেমনি আততায়ী হুমরা বেদে ছুরিকাহস্তে যমদূতের মতো আবির্ভূত হইয়াছে, অমনি—

ডুবিল্ল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সোনালী চান্নির রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥

[আসমান=আকাশ, আব=মেঘ]

ইহা প্রকৃতির সহানুভূতি নহে, নিষ্ঠুর হত্যাদর্শন গগনচারীর পক্ষে অসহনীয় নহে, হুমরার ক্রিয়ার ফলেই এখানে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া। ইহাতে ভয়ানক রসের পুষ্টিসাধন হইয়াছে। ভয়ঙ্করতা ফুটাইবার জন্য সোনাই-এর বিষপানের সময়ে "নিশি রাইত মেঘে আন্ধা আসমানে নাই তারা" কিংবা "আসমান কালা, জমীন কালা, কাল্ নিশা যামিনী"। গীতিকায় প্রকৃতির যে সহানুভূতি নাই, তাহার প্রমাণ আছে। যাহার সহানুভূতি আছে, তাহার পক্ষে বিপদে শত্রুতা করা সম্ভব নহে। যে নদী মহুয়া-নদেরচাঁদের সুখের দিনে জল-খেলা করিয়াছে—"সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।" সেই নদীই আবার

তাহাদের বিপন্ন অবস্থায় পলায়নকালে করিয়াছে চরম শত্রুতা—"বিস্তার পাহাড়িয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি।" প্রকৃত কথা, গীতিকা-কবি প্রকৃতিকে অকারণ প্রাধান্য দিয়া তাহার চেতনা বা সহানুভূতি প্রমাণ করেন নাই—রস-সৃষ্টির প্রয়োজনে জড়বস্তু রূপেই তাহাকে ব্যবহার করিয়াছেন। জীবনের সহিত ভারসাম্যহীনা ও অতিবর্ধিতা রোমাণ্টিক প্রকৃতিকে মৈমনসিংহ-গীতিকায় দেখা যায় না।

গীতিকার রচয়িতারা জীবন-নিষ্ঠ ও বাস্তবতা-প্রিয় হইলেও অরসিক বস্তুবাদী নহেন, রসিক জীবন-শিল্পী বা কবি। জীবনকে তাঁহারা করিয়াছেন পূর্ণমাত্রায় উপভোগ। তাঁহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম, মন জাগ্রত। মানবচরিত্রের নিগূঢ় ইঙ্গিত, প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন হাবভাব ও কটাক্ষ, প্রকৃতির মৃদুতম লীলা-বিলাস তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। সেইজন্য মৈমনসিংহ-গীতিকা হইয়াছে বিচিত্র সৌন্দর্যের চিত্রশালা। নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য—

(১) আষ্ট দাঁড়ে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
'পঙ্খী-উড়া' করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্মবনে॥

['উড়া' শব্দে পানসীর দ্রুততা এবং 'পঙ্খী' শব্দে লঘুতা ও তৎসহ কবির আনন্দ ব্যঞ্জিত]

(২) শুনরে পিতলের কলসী কইযা বুঝাই তোরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন পুরুষেরে॥

[ইহা মলুয়ার নিজের উক্তি নহে, কবিই এইভাবে তাহার মনের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করিতেছেন। নায়িকার লজ্জা ও প্রেম দ্রষ্টব্য]

(৩) ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকবাম এক দিবা রাতি॥

[উপমার স্বাভাবিকত্ব ও চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়]

(৪) ভিনদেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥

[পূর্বরাগ বিভাব সৃষ্টির দক্ষতা প্রকাশিত]

(৫) যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাঁশে মাইল লাড়া।
বইস্যা ছিল নগার ঠাকুর উঠ্যা হইল খাড়া॥ [ছেরি—কন্যা]

[কৌতূহল-চিত্রের নৈপুণ্য দ্রষ্টব্য]

(৬) আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাল দেখ্যাছি কলি॥
[ননদীর পূর্বরাগ লক্ষণে ভ্রাতৃ-জায়ার রসিকতা দ্রষ্টব্য]

(৭) উঠ উঠ নাগর—কন্যা ডাকে মনে মনে।
কি জানি মনের ডাক—সেও নাগর শুনে॥
[সরলা প্রেমিকার নির্বোধ আশার প্রতি কবির স্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য দ্রষ্টব্য]

(৮) বৈদেশেতে যায় যাদু যদ্দূর দেখা যায়।
পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায়॥
বাঁশের ঝাড বন জঙ্গল পুতের পৃষ্ঠে পডে।
আঁখির পানি মুছ্যা মায় ফির‍্যা আইল ঘরে॥
[মাতৃ-হৃদয়ের চিত্রাঙ্কনে কবির মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ-দক্ষতা প্রকাশিত]

(৯) কুডায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ মাস আসে।
জমীনে পডিল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে॥
[কবির সংক্ষেপে প্রকৃতি-বর্ণনা দ্রষ্টব্য]

মৈমনসিংহ-গীতিকা পল্লীভাষার পঙ্কজাত পদ্মফুল। বঙ্গদেশের পূর্বতম প্রান্তে লোকলোচনের অন্তরালে ইহার জন্ম বটে, কিন্তু সৌরভ বিস্তারে সমস্ত পৃথিবীকে আমোদিত করিয়াছে। ইহাতে বঙ্গের সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যের ইহা চিরন্তন সম্পদ। একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার সমকক্ষ আখ্যানধর্মী প্রেমের কাব্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিধুবাবুর টপ্পা ভাবের গান মাত্র, কথা-সাহিত্য নহে। বঙ্গদেশে ইংরেজ আগমন না ঘটিলেও স্বাভাবিকভাবেই যে বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্পের জন্ম হইতে পারিত, মৈমনসিংহ-গীতিকাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

নেপথ্য-বার্তা

টপ্পার কবি ও গীতিকা-সমস্যা

বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক কবি রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন সেকালের কলিকাতাবাসী একজন শৌখীন বাবু। সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়ক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তৎকালে কলিকাতায় আখড়া বা সঙ্গীতশালার উপযোগী 'আখড়াই' নামে একপ্রকার ব্যবসাদারী কালোয়াতী গান প্রচলিত ছিল। রামনিধি এই ব্যবসাদারী আখড়াইকে শখের আখড়াইয়ে পরিণত করিয়া ইহার মর্যাদাবৃদ্ধি করেন। বাংলা টপ্পাগানের প্রচলন নিধুবাবুর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি ছাপরা হইতে টপ্পার সুর শিখিয়া আসিয়া উহাকে বাংলায় প্রচলিত করেন, সেইজন্য হিন্দুস্থানী গীতিকার শোরী মিঞার অনুকরণে টপ্পা সুরের উপযোগী করিয়া অনেকগুলি প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করেন। এইগুলিই 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে পরিচিত। নিধুবাবুর টপ্পাই পরবর্তী কবিয়ালগণের কবিগানের অশ্লীল খেউড়ের পূর্বরূপ এবং ভদ্ররূপ। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন "শান্তিপুর হইতে খেউড় গানের কেন্দ্র গঙ্গাস্রোতে বাহিয়া উঠিয়া আসে চুঁচুড়ায়, তাহার পর কলিকাতায়। এই স্থানে প্রধানতঃ নিধুবাবুর প্রযত্নে খেউড় গানের সংস্কারকার্য সাধিত হয়।"[১] রামনিধি ছিলেন দীর্ঘজীবী, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯৭ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার পালা-গানগুলি বহুকাল পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। প্রথম ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারাই এইগুলি পুস্তকাকারে সাধারণের কাছে প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ পালা-সংগ্রহের কৃতিত্ব নেত্রকোনাবাসী কবি চন্দ্রকুমার দে-র। শ্রীযুক্ত জসীমউদ্দিনও দু-একটি পালা সংগ্রহ করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের দ্বারাই পালা-গানগুলি সম্পাদিত হয়। 'গীতিকা'-নাম দীনেশচন্দ্রেরই প্রদত্ত।

মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা প্রকাশিত হইলে পণ্ডিতগণের

১ পৃঃ ৯৮০ বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১ম সং)

মধ্যে অনেকে এইগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"গীতিকাগুলির মধ্যে যেগুলি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের মনোহরণ করিয়াছে সেগুলির কোনোটিকেই সর্বাংশে অকৃত্রিম গণ্য করা যায় না।···অনেকগুলি পালাতে অন্য গল্পের অংশ যোগ করিয়া অথবা অন্যরূপে কাহিনীকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া রোমান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। মহুয়া-পালাটিতে এইরূপ প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। মহুয়ার আত্মহত্যা কখনোই মূল-কাহিনীতে ছিল না।"[১] তাছাড়া পালাগুলির ভাষায় 'নয়া'র স্থলে 'নূতন', 'কব্যা' স্থানে 'কইর‍্যা' কয়্যা স্থানে 'বল্যা' এবং 'আঁখি' প্রভৃতি শব্দে পশ্চিমবঙ্গীয় অনুনাসিকতা দেখিয়া সুকুমারবাবু সন্দেহ করেন গীতিকাগুলির ভাষায় সম্পাদনকালে পশ্চিমবঙ্গীয় শব্দের পূর্ববঙ্গীকরণ হইয়াছে, "পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।"[২]

আশ্চর্যের বিষয়, পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্যতম সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত জসীমউদ্দিনও মৈমনসিংহ গীতিকাকে সন্দেহজনক ও অপ্রামাণিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। 'যাদের দেখেছি' গ্রন্থে তিনি তাঁহার সন্দেহের কারণ লিখিয়াছেন—"মৈমনসিংহ গীতিকার গানগুলি শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়েই পাওয়া যায়। মৈমনসিংহে সাত-আট বৎসর গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি, কোথাও এই ধরণের মাজাঘষা সংস্করণের গীতিকা পাওয়া যায় না।" আরও বিস্ময়ের কথা, শ্রীজসীমউদ্দিনের এই প্রচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন একজন বিদেশী পণ্ডিত—চেক-ভাষায় গীতিকা-অনুবাদকারী শ্রীযুক্ত দুসান জবাভিতেল। বাংলা-ভাষায় একটি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জবাভিতেল লিখিয়াছেন—"মৈমনসিংহ জেলার নানা গ্রামে ঘুরে এসেছি; গীতিকা শুনতে পাইনি। কিন্তু তাতেই কি এই গীতিকাগুলির অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয়?···মৈমনসিংহ জেলার কাঁথা একদিন সারা বাংলা দেশে বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আমি একটিও খুঁজে পাইনি।···

১ পৃঃ ১০৪৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (১ম সং)

২ পৃঃ ১০৪৩ ঐ

কিন্তু এই কারণে কি আমরা নক্সী কাঁথার প্রামাণিকতায় সন্দেহ করব? নিশ্চয় করব না—আগেকার অনেক কাঁথাই যাদুঘরে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। শুধু নক্সী কাঁথা তৈরী করবার মত নিপুণ মানুষ আর যে মৈমনসিংহে নেই, তাই মেনে নিতে হয়।" শ্রীযুক্ত জবাভিতেল শ্রীসুকুমার সেনের ভাষাতাত্ত্বিক সন্দেহেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন; গীতিকায় ব্যবহৃত অ-পূর্ববঙ্গীয় শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"মৈমনসিংহের কথিত উপভাষায় 'নতুন' শব্দের বদলে যে 'নয়া' বলে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রাম্য গানে 'নয়া'র বদলে যে 'নতুন' প্রায়ই বলা হয়, তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় রওশন ইজদানীর 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্যে', মনসুর উদ্দিনের 'হারামণি'তে ও অন্যান্য বই বা পত্রিকায় প্রকাশিত গানে। গ্রাম্য গানের গায়ক প্রায় ইচ্ছে করে সাধুভাষার শব্দ ব্যবহার করে তার 'পাণ্ডিত্য' দেখাবার জন্য। এসব কারণে গ্রাম্য সাহিত্যকে আঞ্চলিক উপভাষার উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে অন্ততপক্ষে উপভাষার চর্চা করা চলে না। কিন্তু এজন্য গীতিকাগুলোর প্রামাণিকতায় সন্দেহ করা উচিত কি?"*

কেহ কেহ আবার কবি চন্দ্রকুমারকেই পালাগুলির প্রকৃত রচয়িতা বলিয়া সন্দেহ কবেন। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন "চন্দ্রকুমারকে ঘনিষ্ঠভাবেই আমি জানিতাম—ছন্দোবন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল। তাঁহার সুরজ্ঞানও ছিল, কিন্তু তিনি এতবড় কবি ছিলেন না যে ঐ অপূর্ব গীতিগুলি রচনা করিতে পারিতেন।... চন্দ্রকুমারকে মহাকবিত্বের গৌরব ও অসামান্য আত্মোৎসর্গের গৌরব দুইয়ের একটিও দিতে আমরা রাজী নই। যাহা খণ্ডিত, ছন্ন, ছিন্ন, ব্যুৎক্রান্ত ও অঙ্গহীন, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন চন্দ্রকুমার—এবিষয়ে সংশয় নাই।"[১] বলা বাহুল্য, চন্দ্রকুমারের ন্যায় দীনেশচন্দ্র বা জসীমউদ্দিনকেও গীতিকা-রচয়িতার গৌরব দেওয়া যায় না।

অল্পদিন হইল, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য পূর্ববঙ্গ হইতে 'বাস্তানীর গান' নামক একটি পালা গান স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই

* 'প্রবন্ধ পত্রিকা'—আষাঢ় ১৩৬৯

১ পৃঃ ৩১৬ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (দ্বিতীয়াংশ)

গানটি মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালারই একটি অমার্জিত সংস্করণ। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়—মহুয়া পালাকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। আশা করা যায়—সংগ্রাহকেরা যথোপযুক্ত চেষ্টা করিলে মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যান্য অমার্জিত পালাও এইভা'ব একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজেদের অকৃত্রিমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবে।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনার একটি ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'বাগানীর গান'কে প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়া আশুবাবু প্রচার করিয়াছেন—"মহুয়া বৃক্ষ কিংবা ইহার পুষ্প পূর্ব মৈমনসিংহে সম্পূর্ণ অপরিচিত।...মহুয়া-কাহিনীর নায়িকার নাম 'মেওয়া' সুন্দরী, মহুয়া সুন্দরী নহে।...কারণ মেওয়া কথাটি পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে সুপরিচিত, ইহার অর্থ ঘনীভূত দুগ্ধ।"[১] তাছাড়া 'বাগানীর গানে' মহুয়া কাহিনীর হুমরা বেদের নাম 'উন্দ্রা বাগা'। "পূর্ব মৈমনসিংহের ভাষায় ইদুরকে উন্দুর বলে। তাহা হইতে সাধারণ লোকের মধ্যে উন্দ্‌রা বা উন্দ্রা নাম শুনিতে পাওয়া যায়, হুমরা নাম শুনিতে পাওয়া যাইবার কথা নহে, প্রকৃত-পক্ষে যায়ও না। অতএব উন্দ্রা শব্দটিও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের সংকলয়িতার সংস্কারের ফলে হুমরায় পরিণত হইয়াছে।"[২]

---

১ পৃঃ ২৮১-২৮২ বাংলার লোকসাহিত্য

২ পৃঃ ২৮২-২৮৩ ঐ

শব্দসূচী

আলোচিত নামের * তালিকা ও পৃষ্ঠা-নির্দেশ

* প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য জ্ঞাতব্য নামের জন্য এই গ্রন্থের ১২-৩২ পৃষ্ঠায় রচনাপঞ্জী দ্রষ্টব্য।